ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ
আল-গাযালি (র)-এর অমর রচনা

# ইহয়াউ উলূমিদ্দীন

১৪

## আশা-ভয় ও নিয়ত-আন্তরিকতা

ভাষান্তর

মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

# আশা-ভয় ও নিয়ত-আন্তরিকতা

## ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১৪

ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ
ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮ - ১১১১ খ্রি.)

ভাষান্তর
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
শিক্ষাসচিব, মারকাযুল কুরআন বাংলাদেশ

দারুত তাকবীর

# আশা-ভয় ও নিয়ত-আন্তরিকতা

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজ : ১৪

**ISBN No : 978-984-558-029-8**

প্রকাশক
প্রকৌ. মেহেদী হাসান
দারুত তাকবীর
৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা)
ভি আই পি রোড, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

রচনা
ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আল-গাযালি (র)
(১০৫৮-১১১১ খ্রি.)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
ডক্টর এম. শরীফ উল আলম

ভাষান্তর
মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ
শিক্ষাসচিব, মারকাযুল কুরআন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
জিলহজ ১৪৪১ হিজরি
শ্রাবণ ১৪২৭ বাংলা

ভাষাসম্পাদনা
দারুত তাকবীর অনুবাদ, সংকলন ও গবেষণা বিভাগ

প্রচ্ছদ ডিজাইন
দারুত তাকবীর ডিজাইন সেকশন

স্বত্ব : সংরক্ষিত

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ২৩৬.০০ (দুইশত ছত্রিশ টাকা মাত্র)

## সতর্কীকরণ

প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের যেকোনো অংশ
পরিবর্তন, পরিমার্জন বা পরিবর্ধন করে ছাপানো সম্পূর্ণ বেআইনি

**ASHA-BHOY O NIOT-ANTORIKOTA** (Ihyau Ulumiddeen Series-14), Written by Emam Gazali (R), Translated by Mufti Abu Naeim Md. Sajid, Published by Eng. Mehedi Hasan. Darut Takbeer, Corporate Office : 30/A Sattara center (14th Floor), V.I.P Road, Naya Paltan, Dhaka-1000, Phone : +8809610666006, 01938-855992,01938-855979, 01991-181204, E-mail : info@daruttakbeer.com, Website : www.daruttakbeer.com, Publishing Date : August 2020, **Price : 236.00** Taka Only

# প্রকাশকের কথা

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মানুষকে সর্বোত্তমরূপে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। দরূদ ও সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। মানবজাতির মাঝে যিনি আগমন করেছিলেন চিরমুক্তি ও সফলতার বার্তা নিয়ে, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর তাঁর আনীত সুমহান দীনকে সমুন্নত রাখতে প্রতি হিজরি শতকেই আল্লাহ তাআলা কিছু ক্ষণজন্মা মনীষী ও সংস্কারককে প্রেরণ করেন।

পঞ্চমশতকে আবির্ভূত এমনই একজন যুগশ্রেষ্ঠ ও ক্ষণজন্মা মনীষী হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালি (র)। ৪৫০ হিজরিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। দার্শনিক হিসেবে তিনি শুধু যুগশ্রেষ্ঠ নয়; বরং জগৎশ্রেষ্ঠ। মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাঁর অবদান অসামান্য। তাঁর কলমের ছোঁয়ায় মুহাম্মদি দীন ও শরিয়ত শুধু নবজীবনই লাভ করেনি, পৃথিবীর তাবৎ মনীষী, জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণকে এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেছে। অজস্র মানুষকে বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত করেছে। আর বিশ্বাসীদের মাঝে আস্থার দ্যুতি ছড়িয়েছে।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' নামে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর একটি অমর কীর্তি। বহু শতাব্দী ধরে এটি মুসলিম উম্মাহর মাঝে প্রাণস্পন্দন এবং প্রেরণার স্ফুরণ ঘটিয়ে আসছে।

মূল আরবি গ্রন্থটি চার খণ্ডে রচিত। কিন্তু পাঠকের ক্রয়ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় অংশটি সংগ্রহ ও বহনের সুবিধার্থে আমরা বইটি সিরিজ আকারে প্রকাশ করছি।

ইহয়াউ উলূমিদ্দীন সিরিজের চৌদ্দতম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ। এ পর্যায়ে সিরিজের চৌদ্দতম গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে তুলে দিতে পেরে দারুত তাকবীর আনন্দিত ও গর্বিত। যদিও বাজারে এর অনেকগুলো অনুবাদ রয়েছে। নতুন করে আমরা আবার কেন অনুবাদ করলাম, তা মনোযোগী পাঠক পড়েই বুঝবেন।

এর যা কিছু ভালো তার সবই মহান আল্লাহর। আর যা কিছু ভুল তা আমাদের অক্ষমতা। আমরা আমাদের ভুলগুলো উত্তরোত্তর সংশোধন ও পরিমার্জনে বদ্ধপরিকর। এক্ষেত্রে সুহৃদ পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের দুআ-পরামর্শ ও সার্বিক সহযোগিতা কাম্য।

গ্রন্থটি পড়ে কোনো পাঠক যদি নিজের প্রয়োজনীয় আত্মসংশোধনে ব্রতী হয় এবং দ্বিধাহীনচিত্তে মহান আল্লাহর ইবাদত ও সাধনায় আত্মমগ্ন হয়, তাহলেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

মহান রাব্বুল আলামিন আমাদের এই শ্রমটুকু কবুল করে নিন এবং গ্রন্থটির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমিন।

প্রকাশক

১০.০৮.২০২০

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

# অনুবাদকের কথা

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' রচিত হয় হিজরি পঞ্চম শতাব্দিতে। এই অমর গ্রন্থটি রচনা করেন জগৎশ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালি (র)। তারপর থেকেই এটি সকল শ্রেণির মুসলমানদের নিকট বরিত হয়ে আসছে নিরঙ্কুশভাবে।

এ গ্রন্থ রচনা করার মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামি আদর্শ ও ভাবধারায় মুসলমানদের উজ্জীবিত করা। এর স্বরূপ-প্রকৃতি ও মর্ম তাদের সামনে তুলে ধরা। একজন মুসলিমের অন্তর্জগৎকে মুহাম্মদি শরিয়তের আলোয় আলোকিত করতে, সর্বোপরি আত্মার যাবতীয় ব্যাধি থেকে মুক্ত করে তাতে প্রভুপ্রেমের আগুন জ্বালাতে গ্রন্থটি বিশ্বস্ত পথপ্রদর্শক ও দক্ষ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করে।

রচনার সূচনাকাল থেকেই অজস্র মানুষ এর জ্ঞান সুধা পান করে পুনর্জীবন লাভ করেছে এবং এর ছত্রে ছত্রে ছড়ানো প্রজ্ঞার মণিমুক্তা কুড়িয়ে মানুষ জ্ঞানপ্রাচুর্য লাভ করেছে।

কয়েক শতাব্দী পেরিয়েও সেই রত্ন ভাণ্ডারে এতটুকু টান পড়েনি। উত্তরোত্তর তা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। রত্ন তো নয় যেন রত্নের খনি! বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, কালোত্তীর্ণ এই গ্রন্থটি বিশ্বের বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি, ইসলামি স্কলার এবং ওলামায়ে কেরাম গ্রন্থটি নিয়ে বিভিন্নভাবে কাজ করেছেন। প্রতিটি কথার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা যাচাই করেছেন। তারপর তাদের সেই গবেষণার ফসল পাঠকদের হাতে তুলে ধরেছেন।

বাংলাভাষাতেও গ্রন্থটি অনুবাদ করার প্রয়াস পেয়েছেন এ মাটির আলো-বাতাসে বেড়ে উঠা প্রখর মেধা ও ক্ষুরধার লেখনীর অধিকারী অনেক বিদগ্ধ আলেম-মনীষা। কেউ এক খণ্ডে। কেউ বা বহু খণ্ডে। তাদের

সেসব মহৎ প্রচেষ্টার প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখে আমরা বইটির আধুনিক সংস্করণের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তুলে দেওয়ার প্রয়াস চালিয়েছি। সিরিজের চৌদ্দতম খণ্ডে আশা-ভয় ও নিয়ত আন্তরিকতা বিষয়ক আলোচনা স্থান পেয়েছে অনুবাদে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ রাখা হয়েছে।

- প্রামাণ্য ও বিখ্যাত গ্রন্থাদি থেকে এর প্রতিটি কথার উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।
- উদ্ধৃত গ্রন্থের শুধু নামই নয়; খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।
- হাদিসের ক্ষেত্রে হাদিস গ্রন্থের নাম এবং হাদিস নং উল্লেখ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।
- পাঠককে দ্বিধান্বিত করে তুলতে পারে এমন বক্তব্যগুলোর (পাদটীকায়) সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে ।
- উর্দু থেকে অনুবাদ না করে সরাসরি আরবি মূল গ্রন্থ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

বইটি সর্বাঙ্গীণ সুন্দর ও নির্ভুল করতে দারুত তাকবীর সম্পাদনা পরিষদ নিরলস পরিশ্রম করেছে। একইসঙ্গে কম্পিউটার বিভাগে কর্মরত সহকর্মীবৃন্দ অশেষ শ্রম ব্যয় করেছে। তাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাআলা তাদের কাজের সর্বোত্তম জাযা দান করুন।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও অনেক জায়গায় অপূর্ণতা থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তাই কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সেগুলো শোধরানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ!

আল্লাহ আমাদের সবাইকে জগৎশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ইমাম গাযালি (র)-এর অমর রচনা 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ

১০.০৮.২০২০

# সম্পাদকীয়



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা ও স্তুতি একমাত্র আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাদের ঈমানের মতো মহান দৌলত দান করেছেন এবং সত্য সহজ সুন্দর দীনের অনুসারী করেছেন। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় রাসূল এবং রাসূলের পরিবারবর্গ ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' শীর্ষক গ্রন্থটি কুরআন সুন্নাহ এবং পূর্ববর্তী মহান ব্যক্তিদের বক্তব্যের আলোকে দীন ইসলামের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে লেখা। চার খণ্ডে রচিত মূল গ্রন্থে শুধু ইবাদত, মুআমালাত, আখলাক, আদব বিষয়ক আলোচনাই স্থান পায়নি। আধ্যাত্মিক এবং আত্মিক বিষয়াদিও আলোচিত হয়েছে যুক্তিগ্রাহ্যভাবে। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলো বিশ্লেষণের পাশাপাশি তাদের কল্যাণ ও মুক্তির বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ও হৃদয়গ্রাহী করে।

এতে শরিয়তের মৌলিক ইবাদতগুলোর সারনির্যাস যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি মনোজগতের বিভিন্ন অবস্থার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যাও প্রবল প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। তাই গ্রন্থটি রচনার পর থেকে বিগত নয়শ বছর যাবৎ বিশ্বের বিভিন্ন শ্রেণির মুসলিমদের নিকট ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। আল্লাহর পবিত্র কালাম ও রাসূলের পবিত্র হাদিসের পর আর কোনো গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের নিকট ইমাম গাযালি (র)-এর এই গ্রন্থটির মতো সমাদৃত হয়নি। এ গ্রন্থের বিস্ময়কর গ্রহণযোগ্যতাই এর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় বহন করে।

দারুত তাকবীর কর্তৃপক্ষ এ মূল্যবান গ্রন্থটি সিরিজ আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সিরিজের চৌদ্দতম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন মুফতী আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ।

আলহামদুলিল্লাহ! গ্রন্থটি আমাদের আগাগোড়া সম্পাদনা এবং নিরীক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে। এতে 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ চলে এসেছে। সেই সাথে প্রতিটি কথার উদ্ধৃতিও তুলে ধরা হয়েছে। এদিক থেকে বইটি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হয়েছে। তবে মানবসুলভ ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সে ক্ষেত্রে আমরা পাঠক সাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

সৃজনশীল ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশন 'দারুত তাকবীরকে স্বাগত জানাই প্রকাশনা জগতে যাত্রার সূচনাতে এমন বৃহৎ একটি কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং উম্মতের সামনে বিশুদ্ধ ও নান্দনিকরূপে গ্রন্থটি পেশ করার জন্য।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি থেকে আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং এর উসিলায় দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে কামিয়াব করুন। আমিন।

সম্পাদনা পরিষদ
১০.০৮.২০২০

# সম্পাদনা পরিষদ


- **মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ**
  শিক্ষাসচিব, মারকাযুল কুরআন বাংলাদেশ, ঢাকা

- **মাওলানা শফীকুল ইসলাম**
  শিক্ষাসচিব, কদম রসূলপুর মাহমুদুল উলূম মাদরাসা, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
  সাবেক সহসম্পাদক, মাসিক মদীনা ও সাপ্তাহিক মুসলিমজাহান

- **মুফতি মাহদী হাসান**
  উস্তায, মাদরাসা কাসেমিয়া, জামতলা, ময়মনসিংহ

- **মুফতি নূরে আলম**
  মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়া আশরাফিয়া, মিরপুর-১২, ঢাকা

- **মাওলানা ইয়াসিন বিন ইউসুফ**
  উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম, শ্যামলী, ঢাকা

- **মুফতি কাজী মঈনুল হক**
  উস্তায, মাদরাসাতুল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ, নবীনবাগ, খিলগাঁও, ঢাকা

## মাওলানা মনযুর আহমদ দা.বা.-এর

# দুআ ও বাণী

পরম করুণাময় সেই মহান রাব্বুল আলামিনের নামে শুরু করছি। সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের জন্য। দরুদ ও সালাম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশন দারুত তাকবীর 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটি সিরিজ আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে। সিরিজের চৌদ্দতম খণ্ডটি অনুবাদ করেছেন তরুণ আলেম স্নেহভাজন মুফতি আবু নাঈম মুহাম্মদ সাজিদ। বইটি সম্পর্কে যতই বলা হবে ততই কম হবে। 'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন'-এর মাধ্যমে আমরা ইমাম গাযালি (র)-এর জ্ঞানসমুদ্র সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে তিনি বিস্ময়কর কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো বহু শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলো দিয়ে যাচ্ছে।

'ইহয়াউ উলূমিদ্দীন' গ্রন্থটিতে মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির যাবতীয় দিক আলোচিত হয়েছে নিপুণ বিশ্লেষণে। শরয়ি বিধিবিধান বর্ণনার পাশাপাশি সেগুলোর হাকীকত ও রহস্যও উন্মোচিত হয়েছে বিজ্ঞানসম্মতভাবে। সেই সাথে মানুষের যাবতীয় আত্মিকব্যাধির চিকিৎসাপদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে কুরআন-হাদিস এবং যুক্তির আলোকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহ যদি গ্রন্থটিকে আবার দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে, তাহলে তা তাদের মুক্তির পথ দেখাবে নিঃসন্দেহে।

তামামবিশ্বে একাধিক ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে। এর প্রতিটি কথা পুনঃনিরীক্ষণ ও যাচাই বাছাইয়ের কাজ হয়েছে। বাংলাভাষায়ও এর একাধিক অনুবাদ হয়েছে। অগ্রজদের সেসব অবদান আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

দারুত তাকবীর কালের এই অমূল্য গ্রন্থটি সরল বর্ণনায় তথ্যসূত্রসহ উপস্থাপনের মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গ্রন্থটি আমি পড়ে দেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ! সিরিজের এখণ্ডটির অনুবাদে যথেষ্ট শ্রম ও যত্নের ছাপ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বইটিকে সার্বজনীন কল্যাণের আধার করুন এবং আমাদের সবাইকে এগ্রন্থ থেকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফিক দিন। আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামীন

(মাওলানা মনযুর আহমদ)

# সূচিপত্র

বিষয়..... পৃষ্ঠা

## রজা ও খওফ (আশা ও ভয়)

### প্রথম পরিচ্ছেদ

### রজা (আশা) [১৯]

রজা (আশা) -এর স্বরূপ..... ১৫
রজার ফযিলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান..... ২১
রজা বা আশা হাসিলের পদ্ধতি..... ২৬
'রজা' তথা আশা সংক্রান্ত হাদিস..... ৩০
রজা বা আশা সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি..... ৪১

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### খওফ (ভয়) [৫৪]

খওফ (ভয়)-এর প্রকৃতি..... ৫০
খওফের স্তর..... ৫৩
খওফের উপকার..... ৫৫
ভয়ের প্রকার এবং উপায়সমূহ..... ৫৬
খওফের ফযিলত ও তার প্রতি উৎসাহ প্রদান..... ৬৩
ভয় ও আশার প্রাবল্যের মধ্যে কোনটি শ্রেয়..... ৬৭
খওফ হাসিলের উপায়..... ৮২
নিকৃষ্ট অন্তিমকালের বর্ণনা..... ১০৩
অন্তিম মুহূর্তে অশুভ পরিণতির কারণ..... ১০৯
প্রয়োজনমাফিক খাবার..... ১১৫
পোশাকের প্রয়োজন..... ১১৬
আবাসের প্রয়োজন..... ১১৬
নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণের ভয়ের বর্ণনা..... ১১৭
সাহাবী, তাবিয়ী ও সালাফে সালেহীনের মধ্যে ভয়ের প্রাবল্য..... ১২৫

## নিয়ত, আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতা

নিয়তের ফযিলত ..... ১৪২
নিয়তের ফযিলত সম্পর্কে সাহাবি ও বুযুর্গগণের বাণী ..... ১৪৬
নিয়তের প্রকৃতি ..... ১৪৮
আমলের চেয়ে নিয়ত উৎকৃষ্ট ..... ১৫১
নিয়ত সম্পর্কিত আমলের বর্ণনা ..... ১৫৫
নিয়ত কারও ইচ্ছাধীন নয় ..... ১৬৭
ইখলাসের ফযিলত ..... ১৭২
ইখলাসের প্রকৃতি ..... ১৮১
ইখলাস সম্পর্কে মনীষীদের বাণী ..... ১৮৬
যেসব বিষয় ইখলাসকে কলুষিত করে ..... ১৮৯
সংমিশ্রিত আমলের সওয়াবের বর্ণনা ..... ১৯২
সত্যবাদিতার ফযিলত ..... ১৯৮
সিদকের চিত্র ..... ২০২

[] সপ্তদশ খণ্ড সমাপ্ত []

# রজা ও খওফ

## (আশা ও ভয়)

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, যাঁর অনুগ্রহ ও পুরস্কারের প্রত্যাশা করা হয়। যার পাকড়াও ও শাস্তির ভয় করা হয়। যিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে প্রত্যাশার প্রাণ সঞ্চার করে তাদের অন্তর সঞ্জীবিত করেছেন এবং তার পরীক্ষার স্থান ও শত্রুদের অবস্থানস্থল থেকে ফিরিয়ে মর্যাদাপূর্ণ এবং পুণ্যময় ঘরের (জান্নাতের) দিকে নিয়েছেন। তার সমীপে উপস্থিত হতে অনাগ্রহীদের ভয়ের চাবুক ও কঠোর সতর্কবাণী দ্বারা সতর্ক করেছেন। নেতাদের অনুসরণ করে তাঁর ক্রোধের পাত্র হওয়ার পরিবর্তে কঠিন শৃঙ্খল ও অনুগ্রহের বন্ধনে আবদ্ধ করে তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করেছেন। আর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক নবীকুলের সরদার সৃষ্টির সেরা মানবতার জন্য রহমত স্বরুপ প্রেরিত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি তাঁরই বান্দা ও রাসূল। এছাড়াও তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবিগণের ওপর এবং তাঁর বংশধরদের ওপর মহান আল্লাহ রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

ঈমানদারের জন্য রজা বা আশা খওফ বা ভয় দুটি ডানার মতো, যাতে ভর করে নৈকট্যশীল ব্যক্তি শ্রেষ্ঠতম মাকাম পর্যন্ত উড্ডয়ন করে। অথবা এগুলোকে বলা যায় বাহন, যাতে আরোহণ করলে আখেরাতের প্রতিটি

কঠিন পথ অতিক্রম করা যায়। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য, স্থায়ী সুখশান্তি এবং খোদায়ী সন্তুষ্টির সুশোভিত উদ্যান বহু দূর-দূরান্তে অবস্থিত এবং অপ্রিয় কর্ম ও কায়িক শ্রম দ্বারা আবৃত। আশার মশাল ব্যতীত কারও পক্ষে সে আঁধার ঘুচানো অসম্ভব। পক্ষান্তরে জাহান্নামের বহ্নিশিখা সূক্ষ্ম রিপুর তাড়না এবং অদ্ভুত আনন্দ ও ভোগের মাঝে গুপ্ত আছে। ভয়ের চাবুক ও ভীতির আধিপত্য ব্যতীত কেউ এ থেকে বাঁচতে পারে না। তাই আশা ও ভয়ের স্বরূপ পরস্পর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এগুলোর সমন্বয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা অপরিহার্য। সেজন্য এ বিষয়কে দুটি পরিচ্ছেদে ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে আলোচনা করা হলো।

**প্রথম পরিচ্ছেদ** : রজা (আশা)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ** : খওফ (ভয়)

# প্রথম পরিচ্ছেদ
# রজা (আশা)

## রজা (আশা) -এর স্বরূপ

রজা (আশা) হচ্ছে মারেফাতের পথিক ও সাধকগণের গুরুত্বপূর্ণ মাকাম ও হাল। মাকাম ও হালের পার্থক্য এই, কোনো গুণ সাধকের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হয়ে গেলে তাকে মাকাম বলা হয়। আর যদি কোনো গুণ হাসিল হওয়ার পর স্থায়ী না হয় এবং তাড়াতাড়ি বিলীন হয়ে যায়, তবে তাকে হাল বলা হয়। অন্তরের এ অবস্থাটি সকল ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়।

আশা বা রজার মধ্যে তিনটি বিষয় থাকে; ইলম, হাল ও আমল। ইলম হতে হাল এবং হাল হতে আমল উৎপন্ন হয়। কিন্তু এগুলোর মধ্যে শুধু হালকেই রজা তথা আশা বলা হয়। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, মানুষের প্রিয় অথবা অপ্রিয় বস্তু অতীত, বর্তমান অথবা ভবিষ্যত, এই তিনটি কালের মধ্য থেকে যেকোনো এক কালে স্থায়িত্ব লাভ করবে। যদি অতীত কালে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত কোনো বস্তুর ধ্যান অন্তরে উদিত হয়, তাহলে তাকে "যিকির ও তাযাক্কুর" (স্মরণ) বলা হয়। অন্তরে আসা বস্তু যদি বর্তমান থাকে, তাহলে তাকে "ওয়াজদ" (আবেগ), "যওক" (স্বাদ) ও "ইদরাক" (অনুভূতি) বলা হয়। আর যদি অন্তরে কোনো বস্তুর আশঙ্কা ভবিষ্যৎ কালে হয় এবং তা অন্তরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তবে এর নাম হয়

"ইন্তিযার" ও "তাওয়াক্কু" (প্রতীক্ষা ও প্রত্যাশা)। যে জিনিসের অপেক্ষা করা হয়, তা যদি অমঙ্গল হয় এবং মানসিক কষ্টের কারণ হয়, তাহলে তাকে বলা হয় "খওফ" (ভয়) ও "ইশফাক" (উদ্বেগ)। পক্ষান্তরে যদি সেই জিনিসটি প্রিয় ও আনন্দদায়ক হয়, তবে এই সুখানুভূতিকে বলা হয় "রজা"। সুতরাং, রজা তথা আশার সংজ্ঞা হচ্ছে, আন্তরিকভাবে সুখকর জিনিস, যার প্রতীক্ষায় অন্তরে আনন্দ লাভ হয়।

প্রসঙ্গত, প্রিয় বস্তুর আশা করার কিছু কারণও থাকতে হবে। যদি আশা করে এ কারণে যে, তার নিকট তার অধিকাংশ উপকরণ মজুত রয়েছে, তাহলে এ রকম আশা করাকে রজা বলা যথার্থ। আর যদি উপকরণ কিছু না থাকে অথবা অকার্যকর উপকরণ থাকে, তাহলে এ আশাকে ধোঁকা ও বোকামি বলাই যুক্তিযুক্ত। যদি উপকরণের অস্তিত্ব জানা না থাকে এবং উপকরণ না থাকার বিষয়টিও জানা না থাকে, তাহলে এরকম প্রত্যাশা ও প্রতীক্ষাকে "তামান্না" বলা হয়। মোটকথা, অর্জিত হওয়া নিশ্চিত নয়, এমন বিষয়ের জন্যে রজা প্রযোজ্য হয়। আর যা অর্জিত হওয়া নিশ্চিত, তার ক্ষেত্রে রজা প্রয়োগ করা হয় না। যেমন, সূর্যোদয়ের সময় আমরা বলি না যে, আমরা সূর্যোদয়ের আশা করছি আবার সূর্যাস্তের সময় বলি না যে, সূর্য ডুবে যাবে বলে আশঙ্কা করছি। কেননা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত নিশ্চিত বিষয়। হ্যাঁ, এটা বলা যায় যে, বৃষ্টি হওয়ার আশা করা যায় এবং অনাবৃষ্টির আশঙ্কা আছে।

আরেফদের তথা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের কাছে এটা স্পষ্ট যে, ইহকাল পরকালের শস্যক্ষেত্র, অন্তর হলো মাটি, ঈমান হলো বীজ আর ইবাদত ও সৎকাজ হলো হালচাষ করা ও খাল কেটে পানি সেচের ব্যবস্থা করার মতো। লোভী ও দুনিয়ার মোহে নিমজ্জিত অন্তর নোনা ভূমির ন্যায়, যাতে বীজ উৎপন্ন হয় না। পরকাল হচ্ছে শস্য কাটার দিন। দুনিয়াতে যে যা কিছু বপন করবে, পরকালে সে তাই কাটবে। নোনা ভূমিতে যেমন বীজের ফলন হয় না, তেমনি অন্তরে গোমরাহী ও অসচ্চরিত্রের উপস্থিতিতে ঈমানরূপী বীজ কমই উদ্‌গত হয়। যে বান্দা মাগফিরাতের আশা করে, তার অবস্থা জমির মালিকের ন্যায় মনে করতে হবে। যদি কোনো কৃষক উর্বর ভূমি বেছে নেয়, তাতে ভালো মানের বীজ বপন করে, সময়মতো পানি দেয় এবং কাঁটা, আগাছা ইত্যাদি পরিষ্কার করে, এরপর আল্লাহ

তাআলার অনুগ্রহের অপেক্ষা করে তবে তার এই অপেক্ষাকে রজা বলা হবে। অপরদিকে কেউ লবণাক্ত জমিতে বীজ বপন করার পর সেখানে পানি না দিয়ে এবং যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ না করেই ফসল তোলার অপেক্ষা করে, তবে তার এই অপেক্ষাকে রজা না বলে নির্বুদ্ধিতাই বলা হবে। এ থেকে জানা গেল যে, রজা শুধু সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর অপেক্ষাকে বলা হয়, যাতে বান্দার পক্ষ থেকে সকল উপায়-উপকরণ প্রয়োগ করা যায়। এখানে শুধু তাই বাকি থাকে, যা বান্দার ইচ্ছাধীন।

আর যদি কোনো ভালো জমিতে বীজ বপন করা হয় কিন্তু সেখানে সিঞ্চন করার মতো কোনো পানি না থাকে। ফলে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকতে হয়, কিন্তু অবস্থা এমন যে বৃষ্টি আসা এবং না আসা উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে তাহলে এমন অপেক্ষাকে তামান্না বলা হয়; রজা বলা হয় না। এর দ্বারা বোঝা গেল, রজা শুধু ওই অবস্থাকেই বলে, যেখানে কাঙ্খিত বস্তুর অপেক্ষা করা হয়।

একইভাবে বান্দা যদি অন্তরের জমিতে ঈমানের বীজ বপন করে, একে ইবাদত ও আনুগত্যের পানি দ্বারা সেচ দেয়, অন্তরকে অসচ্চরিত্রের আগাছা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখে, এরপর আল্লাহর অনুগ্রহে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার এবং উত্তম পরিসমাপ্তির অপেক্ষায় থাকে তাহলে এই অপেক্ষাকে প্রকৃত রজা বলা হবে। এ রজার জন্য ঈমানের যে সকল উপায়-উপকরণের মাধ্যমে মাগফিরাত পূর্ণতা লাভ করে, সেগুলো আজীবন পালন করে যাওয়া একান্ত কর্তব্য। যা কখনো পরিহার করা যাবে না। পক্ষান্তরে যদি ঈমানের বীজ বপন করার পর যথাযথ পরিচর্যা করে না, ইবাদত ও আনুগত্যের পানি দিয়ে সেচ না দেয়, অন্তর কুস্বভাব দ্বারা পূর্ণ রাখে, পার্থিব উল্লাসের খোঁজে ডুবে থাকে, এরপর মাগফিরাতের অপেক্ষায় থাকে তাহলে এই অপেক্ষা বোকামি ও প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا.

তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো এমন একদল লোক, যারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তির অনুগামী হলো। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা মারইয়াম : ৫৯)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেন,

فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتٰبَ يَاْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذَا الْاَدْنٰى وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا.

অতঃপর অযোগ্য উত্তরপুরুষেরা একের পর এক তাদের স্থলাভিষিক্তরূপে কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে। তারা দুনিয়ার এ তুচ্ছ সামগ্রী গ্রহণ করে এবং বলে, 'অচিরেই আমরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হব। (সূরা আরাফ : ১৬৯)

কুরআন কারীমে উদ্যানের মালিকের নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে, যে তার বাগানে প্রবেশ করে বলেছিল,

مَا اَظُنُّ اَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖٓ اَبَدًا. وَّمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّ لَئِنْ رُّدِدْتُّ اِلٰى رَبِّيْ لَاَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا.

আমি মনে করি না যে, তা কখনো ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি মনে করি না যে, কিয়ামত হবে। আর আমাকে যদি আমার প্রতিপালকের নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হয় তবে আমি তো নিশ্চয়ই তা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (সূরা কাহফ : ৩৫-৩৬)

মূলত যে বান্দা ইবাদত ও আনুগত্যে সচেষ্ট হয় এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকে, সে আল্লাহর নিকট নিয়ামাত পূর্ণ হওয়ার আশা করার উপযুক্ত। কিন্তু গুনাহগার যদি তাওবা করে এবং কৃত ভুলের জরিমানা দেয়, তাহলেই তাওবা কবুল হওয়ার আশা করা তার জন্য শোভা পায়। রজার কারণাদি মজবুত হলেই রজা তথা আশা হতে পারে। সেজন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ.

যারা ঈমান আনে, হিজরত করে এবং জিহাদ করে আল্লাহর পথে, তারাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে। (সূরা বাকারা : ২১৮)

অর্থাৎ, তারাই রহমত আশা করার যোগ্য। এর অর্থ কিন্তু এটা নয় যে, আশা শুধু তাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। কারণ, আশা অন্যরাও করে,

যাদের মধ্যে উল্লিখিত গুণাবলি বিদ্যমান নেই। সর্বদা আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির মধ্যে ডুবে থাকে। আত্মসমালোচনা করে না। দৃঢ়তার সঙ্গে তাওবা করে না এবং গুনাহের পথ থেকে ফিরেও আসে না। সুতরাং এমন ব্যক্তির ক্ষমার প্রত্যাশা করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই না। সে ওই ব্যক্তির মতোই, যে ব্যক্তি কোনো উর্বর জমিতে ফল পাওয়ার আশায় বীজ বপন করে। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করে যে গাছের পরিচর্যা করবে না এবং আগাছাও পরিষ্কার করবে না।

নবী করীম (স) ইরশাদ করেন,

اَلْأَحْمَقُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ.

অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি নির্বোধ, যে নিজেকে আপন প্রবৃত্তির অনুগামী করে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট মাগফিরাত কামনা করে। (জামে তিরমিযী : ২৫৪৯, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২৬০)

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায (র) বলেন, আমার মতে চূড়ান্ত বোকামি হচ্ছে গুনাহ মাফ হওয়ার আশায় অনুশোচনা ছাড়াই একের পর এক গুনাহ করে যাওয়া, ইবাদত না করেই আল্লাহর নৈকট্য আশা করা, জাহান্নামের বীজ বপন করে জান্নাতের অপেক্ষা করা, গুনাহ করেও আনুগত্যশীলদের মাকাম তালাশ করা এবং আমল ব্যতীতই সওয়াবের আশা করা এবং সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহর দয়া কামনা করা। যেমন কবি বলেন,

تَرْجُو النَّجَاةَ وَلَمْ تَسْلُكْ مَسَالِكَهَا إِنَّ السَّفِيْنَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبَسِ.

জাহান্নামের পথে চলে জান্নাত আশা করা যায় না, যেমন মরুভূমিতে জাহাজ চলতে পারে না। (দিওয়ানে আবিল আতাহিয়া : ১৯৪)

উপর্যুক্ত বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, রজা ইলমের এমন একটি অবস্থা, যা অধিকাংশ উপকরণ অর্জিত হওয়ার কারণে অন্তরে সৃষ্টি হয়। এই অবস্থা দাবি করে যে, অবশিষ্ট উপকরণগুলো অর্জন করার ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। উল্লিখিত দৃষ্টান্তে যার বীজ ভালো হবে, ভূমি উর্বর হবে এবং পানিও পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে, তার রজা সত্যিকার হবে। এই রজা তাকে খেতের পরিচর্যা করতে, আগাছা পরিষ্কার করতে, পরিচর্যায় অলসতা না করতে এবং শস্য কাটার সময় পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণ অব্যাহত

রাখতে উদ্বুদ্ধ করবে। এর কারণ এই যে, রজার বিপরীত হচ্ছে হতাশা। হতাশা এমন যা পরিচর্যার অন্তরায়। উদাহরণত যে জানে যে, তার ভূমি লবণাক্ত, পানি পৌঁছানোও দুষ্কর এবং তাতে বীজ কখনো অঙ্কুরিত হবে না, সে কখনো চাষাবাদে সম্মত হবে না এবং পরিচর্যার কষ্টও সহ্য করবে না। নিরাশা আমল থেকে বিরত রাখে আর রজা আমলে উৎসাহিত করে। প্রত্যাশী রজার ফলশ্রুতিতে সর্বদা আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট থাকার মধ্যে আনন্দ পায়, মোনাজাতে স্বস্তি পায় এবং বিনয় সহকারে আল্লাহর খোশামোদ করতে থাকে। এসব বিষয় সেই ব্যক্তির মধ্যেও প্রকাশ পায়, যে দুনিয়াত কোনো বাদশাহের কাছে প্রত্যাশা করে। অতএব, সত্যিকার বাদশাহ মহান আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করার মধ্যে প্রকাশ পাবে না কেন? যদি প্রকাশ না পায়, তবে বুঝতে হবে যে, এই ব্যক্তি রজার মাকাম থেকে এখনও বঞ্চিত এবং প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার তলদেশে নিপতিত।

হযরত যায়িদ খাইর (রা) রেওয়ায়েত করেন; আমি রাসূলে কারীম (স)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম, আমি জানতে চাই, আল্লাহ তাআলা যার মঙ্গল চান তার কী নিদর্শন এবং যে ব্যক্তি এ ধরনের নয়, তার নিদর্শন কী? রাসূলুল্লাহ (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার অবস্থা কী? আমি আরয করলাম, আমার অবস্থা হলো, আমি সৎকাজ এবং সৎকর্মশীলদের ভালোবাসি। যখন কোনো সৎকাজ করতে সক্ষম হই, তখন বিলম্ব না করে তা করে ফেলি এবং এর বিনিময়ে সওয়াবের আশা রাখি। কোনো সৎকাজের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে সেজন্য দুঃখিত হই এবং তার আগ্রহ রাখি। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন,

هٰذِهِ عَلَامَةُ اللهِ فِيْمَنْ يُرِيْدُ، وَلَوْ أَرَادَكَ بِالْأُخْرٰى هَيَّأَكَ لَهَا، ثُمَّ لَا يُبَالِيْ فِيْ أَيِّ أَوْدِيَتِهَا هَلَكْتَ.

এটাই সেই ব্যক্তির পরিচয়, আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ করতে চান। আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য ভিন্ন কিছু চাইলে সেজন্যে তোমাকে প্রস্তুত করতেন এবং তুমি কোন পথে হারিয়ে গেছ, তার কোনো ভ্রূক্ষেপই করতেন না। (কাবীর তাবারানী: ১০ : ২০২, আল কামেল, ইবনে আদী : ২ : ২২)

আলোচ্য হাদিসে সৎলোকদের পরিচয় বর্ণিত হয়েছে। যে ব্যক্তি সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশা করে, অথচ তার মধ্যে এসব আলামত নেই, সে প্রতারিত।

## রজার ফযিলত এবং এর প্রতি উৎসাহ প্রদান

আশা নিয়ে আমল করা খওফ তথা ভয় হকারে আমল করার চেয়ে উত্তম। কারণ, সেই বান্দাই আল্লাহর সান্নিধ্যশীল হয়, যে আল্লাহর সঙ্গে সবচাইতে বেশি সম্পর্ক রাখে। আর রজা দ্বারাই ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। যেমন, দু'জন বাদশাহের মধ্যে মানুষ একজনের সেবা করে তার ভয়ে এবং অপরজনের সেবা করে তার অনুগ্রহ লাভের আশায়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় বাদশাহের প্রতিই মহব্বত বেশি হবে। এ জন্যই শরিয়তে রজা সম্পর্কে বিশেষত মৃত্যুর সময় আশাবাদী হওয়ার জন্য অনেক উৎসাহবাণী বর্ণিত আছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ.

তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। (সূরা যুমার : ৫৩)

আলোচ্য আয়াতে নিরাশ হতে নিষেধ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর প্রতি এই মর্মে ওহি প্রেরণ করেন, তুমি কি জান আমি তোমার ও ইউসুফের মধ্যে বিচ্ছেদ কেন ঘটিয়েছি? এর কারণ, তুমি বলেছিলে,

اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ.

আমি আশঙ্কা করি তাকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে, আর তোমরা তার প্রতি উদাসীন থাকবে। (সূরা ইউসুফ : ১৩) তুমি নেকড়ের ভয় করলে কেন? আমার নিকট আশা করলে না কেন? তুমি ইউসুফের ভ্রাতাদের অসতর্কতার প্রতি খেয়াল করেছ, আমার হেফাযতের কথা ভেবে দেখনি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৫)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

لَا يَمُوْتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি সুধারণা ব্যতীত মৃত্যুবরণ না করে। (সহিহ মুসলিম : ২৮৭৭)

এক হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ، فَلْيَظُنَّ بِيْ مَا شَاءَ.

আমি আমার বান্দার ধারণার সঙ্গেই থাকি। অতএব, সে আমার প্রতি যেরূপ ইচ্ছা ধারণা রাখুক। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬৩৩, মুসনাদে আহমদ : ১৬০১৬)

একবার রাসূলুল্লাহ (স) এক ব্যক্তির অন্তিমমুহূর্তে তার কাছে গেলেন এবং বললেন, এখন তোমার কী অবস্থা? সে বলল, নিজ গুনাহের জন্য ভয় করি এবং আল্লাহর রহমতের আশা করি। তিঁনি বললেন,

مَا اجْتَمَعَا فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي هَذَا المَوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا رَجَا، وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ.

এ সময়ে যে বান্দার অন্তরে এ দুটি বিষয় (আশা ও ভয়) থাকে, আল্লাহ তাকে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু দান করেন এবং যে বিষয়কে সে ভয় করে, তা থেকে হেফাজত করেন। (জামে তিরমিযী : ৯৮৩, সুনানে নাসায়ী : ১০৮৩৪, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২৬১)

এক ব্যক্তি অধিক পাপের ভয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছিল। হযরত আলী (রা) তাকে বললেন, তোমার এই নিরাশ হওয়াটা সকল পাপের চেয়ে বড় পাপ। (হুসনুয যন্ন বিল্লাহ, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৯৪; কূতুল কুলূব : ১ : ২১৫)

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি এ কথা ভেবে কোনো পাপ করে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে এর ক্ষমতা দিয়েছেন। এরপর সে ক্ষমার আশা রাখে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। এ কারণে যে, আল্লাহ তাআলা এক সম্প্রদায়ের দোষ এভাবে বর্ণনা করেছেন,

وَ ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ.

‘তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণাই তোমাদের ধ্বংস করেছে। (সূরা ফুসসিলাত : ২৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَ ظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا.

তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়! (সূরা ফাতহ : ১২)

হাদিসে আছে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাকে বলবেন, অন্যায় কাজ দেখে নিষেধ করোনি এর কারণ কি? তখন যদি আল্লাহ তাআলা তাকে সঠিক জবাবের সামর্থ্য দেন তাহলে সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশা এবং মানুষকে ভয় করেছিলাম। আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪৫১৭)

হাদিসে আছে, পূর্ববর্তী উম্মতের এক লোকের রূহকে ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করল, তুমি কি কোনো ভালো কাজ করেছ? সে বলল, না। ফেরেশতারা বলল, ভালো করে মনে করো। সে বলবে, আমি মানুষকে ঋণ দিতাম। এরপর আমার সন্তানদের বলতাম, তোমরা অভাবীকে সুযোগ দিবে এবং সচ্ছলদের এড়িয়ে যাবে। নবীজি বলেন, তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরাও তার হিসাবের বিষয়টি এড়িয়ে যাও। (সহিহ মুসলিম : ১৫৬০, সহিহ বুখারী, সংক্ষেপিত : ২৩৯১)

কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ.

যারা আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদের যে রিজিক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করে এমন ব্যবসায়ের, যার ক্ষয় নেই। (সূরা ফাতির : ২৯)

একবার রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে কম হাসতে, বেশি কাঁদতে, বনে-জঙ্গলে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঘুরতে এবং আপন রবের দরবারে চিৎকার করতে। এরপর জিবরাঈল (আ) এসে বললেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন যে, আমার বান্দাদেরকে নিরাশ করা হচ্ছে কেন? এরপর রাসূলুল্লাহ

(স) সাহাবায়ে কিরামের কাছে গিয়ে তাদেরকে আশা ও আগ্রহের বাণী শোনালেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ১১৩, মুসনাদে আহমদ : ৫১৭৩)

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, যে আমাকে ভালোবাসে তুমি তাকে ভালোবাসো। সৃষ্টিজীবের কাছে আমাকে প্রিয় করে তোলো। তিনি বললেন, প্রভু হে! কীভাবে আমি আপনাকে আপনার সৃষ্টিজীবের কাছে প্রিয় করে তোলবো? আল্লাহ বললেন, তুমি তাদের সামনে আমার সুন্দর গুণাবলি আলোচনা করো। আমার দয়া ও নিয়ামতরাজির কথা তাদের শোনাও। এসবের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দাও। তাহলে তারা আমাকে সুন্দরভাবে জানবে এবং আমার উত্তম পরিচয় লাভ করবে। (বায়হাকী : ৭২৬২, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৫৩৯৫)

আবান ইবনে আবি আইয়াশ অধিকাংশ সময় মানুষকে আশার বাণী শুনাতেন। মৃত্যুর পর লোকেরা তাকে স্বপ্নে দেখল যে তিনি বলছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে নিজের কাছে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন কথাবার্তা কেন বলতে? আমি বললাম, আমার এ কামনা ছিল যে, আপনাকে মানুষের নিকট প্রিয় করে দেই। তখন আল্লাহ বললেন, যাও, আমি তোমাকে মাফ করলাম। (কুতূল কুলূব : ১ : ২২২)

বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আকছাম (রা)-কে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে বললেন, হে মন্দবুড়ো! তুমি তো এই এই অপরাধ করেছ! ইয়াহইয়া বলেন, আল্লাহ জানেন, তখন আমি ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। তারপর আমি বললাম, হে প্রভু! আপনার সম্পর্কে তো আমার কাছে এমনটা বর্ণনা করা হয়নি। আল্লাহ বললেন, তোমার কাছে কী বর্ণনা করা হয়েছে? আমি বললাম, আবদুর রাযযাক মা'মার হতে, তিনি যুহরি হতে, তিনি আনাস (রা) হতে, তিনি আপনার নবী (স) হতে, তিনি জিবরাঈল হতে বর্ণনা করেছেন, 'আমি আমার বান্দার ধারণার সঙ্গে থাকি। অতএব সে আমার যেমন ইচ্ছা ধারণা করতে পারে; আপনার প্রতি আমার ধারণা আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন না। আল্লাহ বললেন, জিবরাঈল সত্য বলেছে। আমার

নবী সত্য বলেছেন। আনাস, যুহরী, মা'মার এবং আবদুর রাযযাক সত্য বলেছে। তুমিও সত্য বলেছ। ইয়াহইয়া বলেন, অতঃপর আমাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করানো হয়। শিশুরা আমার সামনে দিয়ে জান্নাতে গমন করে। তখন আমি বললাম, আহা কী আনন্দ! (কূতুল কুলূব : ১: ২২২, তারীখে বাগদাদ : ১৪ : ২০৬, তারীখে দিমাশক : ৬৪ : ৯১)

এক হাদিসে আছে, যায়েদ বিন আসলাম থেকে বর্ণিত, বনি ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মানুষকে নিরাশ করতো এবং তাদের প্রতি কঠোরতা প্রয়োগ করতো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বলবেন, আজ আমি তোমাকে আমার রহমত থেকে নিরাশ করব, যেভাবে তুমি আমার বান্দাদের আমার রহমত থেকে নিরাশ করতে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৩, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১১ : ২৮৮, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ২২২)

নবীজি (স) ইরশাদ করেন, এক ব্যক্তিকে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। দীর্ঘ এক হাজার বছর জাহান্নামে অবস্থান করার পর একদিন সে চিৎকার করে ডাকবে, ইয়া হান্নান (হে দয়াময়!) ইয়া মান্নান! (হে মেহেরবান প্রভু!) আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ)-কে বলবেন, যাও আমার বান্দাকে নিয়ে এসো। নবীজি বলেন, তখন জিবরাঈল (আ) তাকে এনে আল্লাহর সামনে দাঁড় করাবেন। আল্লাহ বলবেন, তোমার স্থানটি কেমন পেলে? সে বলবে, বড় নিকৃষ্ট স্থান। আল্লাহ্ বলবেন যাও, তাকে তার জায়গায় রেখে আসো। নবীজি বলেন, লোকটি সামনে হাঁটবে আর পেছনে তাকাতে থাকবে। তখন আল্লাহ বলবেন, পেছনে কী দেখছো? সে বলবে, আমার আশা ছিল, জাহান্নাম থেকে বের করে আনার পর পুনরায় আমাকে সেখানে ফেরত পাঠাবেন না।

তার কথা শুনে আল্লাহ বলবেন, إِذْهَبُوْا بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। (মুসনাদে আহমদ : ৩ : ২৩০; হুসনুয যন্ন বিল্লাহ, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ১০৯; মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৪ : ২১০; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী : ৩১৫, হযরত আনাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত)

আলোচ্য ঘটনাটি এ কথাই প্রমাণ করে যে, আল্লাহর প্রতি নেক আশা পোষণ লোকটির নাজাতের একমাত্র মাধ্যম হয়েছে। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন।

## রজা বা আশা হাসিলের পদ্ধতি

রজার প্রয়োজন দু'ব্যক্তির। প্রথমত যার ওপর হতাশা প্রবল, এর ফলে সে ইবাদত-বন্দেগী ছেড়ে দিয়ে বসে আছে। দ্বিতীয়ত খওফ তথা শঙ্কা যার ওপর প্রবল, ফলে সে ইবাদতে বাড়াবাড়ি করে নিজের ও পরিবার পরিজনের ক্ষতি করে। এ উভয় ব্যক্তি ভারসাম্যের সীমা অতিক্রম করে যথাক্রমে স্বল্পতা ও আধিক্যের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাদের এমন ওষুধের প্রয়োজন, যা দ্বারা তারা ভারসাম্যের গন্ডিতে ফিরে আসবে।

তবে যে লোক পাপে প্রতারিত হয়ে আল্লাহর নিকট আশা করে এবং ইবাদত বিমুখ হয়ে পাপের মধ্যে ডুবে থাকে, তার জন্যে রজার ওষুধ বিষতুল্য। এমন ব্যক্তির জন্য রজার আলোচনা করা ঠিক নয়; বরং এমন প্রতারিত ব্যক্তির জন্য আতঙ্ক ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ আলোচনা ব্যতীত ভিন্ন কোনো চিকিৎসা নেই। সুতরাং যারা মানুষের মধ্যে ওয়াজ-নসিহত করেন, তাদের কর্তব্য হলো, রোগ বুঝে উপযুক্ত চিকিৎসা করা। তারা যেন এমন চিকিৎসা না করেন, যা দ্বারা রোগ আরও বৃদ্ধি পায়। কেননা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হলো সিফাত, আখলাক সব কিছুতে ভারসাম্যপূর্ণ থাকা। সর্বোত্তম বিষয় হলো মধ্যপন্থা অবলম্বন। আশা এবং ভয় উভয় ক্ষেত্রে যখন ভারসাম্যতা হারিয়ে যাবে তখন এমনভাবে চিকিৎসা করতে হবে যাতে তা ফিরে আসে। উম্মাহর অধঃপতনের এই ক্রান্তিলগ্নে আশাজাগানিয়া ওয়াজ-নসিহতের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে ভয় ও সতর্কতামূলক ওয়াজ করা উচিত। তাহলে মানুষ আশার ভেলায় চড়ে গুনাহের অথৈ সাগরে ভেসে বেড়াবে না। নিছক আশাজাগানিয়া ওয়াজ উম্মাহকে সামগ্রিকভাবে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিবে। কিন্তু ওয়ায়েজের উদ্দেশ্য যদি হয় মানুষকে আকৃষ্ট করা ও খ্যাতি কুড়ানো তাহলে সে শ্রোতাদের সামনে শুধু আশার ওয়াজ করে। এতে শ্রোতাদের কান সুখ পায়, অন্তরের ভয় কমে যায় আর তারা আশা প্রত্যাশার দিকে ঝুঁকে পড়ে। একপর্যায়ে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায় এবং লোকজন অবাধ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতায় আরও বেশি গা ভাসিয়ে দেয়। হযরত আলী (রা) বলেন, আলেম সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ করে না এবং আযাব থেকে নির্ভীক বানায় না । (কূতুল কুলূব : ১ : ২২২; হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ৭৭)

আমরা রজার যে সকল উপকরণ বর্ণনা করি, সেগুলো নিরাশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য অথবা এমন ব্যক্তির জন্যে বর্ণনা করি যার ওপর ভয় প্রবল হয়েছে। পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফও তা-ই দাবি করে। কেননা, উভয়ের মধ্যে খওফ ও রজা অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। অর্থাৎ, কুরআন ও হাদিসে সকল প্রকার রোগীর আরোগ্য লাভের উপায় বর্ণিত হয়েছে। যাতে পয়গম্বরগণের ওয়ারিস আলেমগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করে বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো চিকিৎসা করে থাকে; হাতুড়ে চিকিৎসকের মতো চিকিৎসা না করে, যারা মনে করে যে, যে-কোনো ওষুধই প্রত্যেক রোগের উপযোগী।

রজা বা আশা মজবুত করার উপায় দুটি। প্রথমটি হচ্ছে বিশ্বাস। অর্থাৎ, মনে এ বিশ্বাস রাখা যে দুনিয়াতে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই আল্লাহ তাআলা সরবরাহ করেছেন। যেমন আহারের যন্ত্রপাতি, কাজ করার সরঞ্জাম যথা আঙুল, নখ ইত্যাদি। এছাড়া তিনি সাজসজ্জার সামগ্রীও দান করেছেন। যেমন, ভ্রূ বাঁকা করেছেন, চোখে কয়েক প্রকার রং দিয়েছেন এবং ঠোঁট লাল বানিয়েছেন ইত্যাদি। এসব বস্তু না থাকলেও মানবিক উদ্দেশ্যের কোনো ক্ষতি দেখা দিতো না, কেবল সৌন্দর্য বিনষ্ট হতো। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে মানুষ এগুলোও অর্জন করেছে। এখানে চিন্তা করার বিষয়, যেহেতু আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের প্রতি এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুগ্রহ দানেও ভুল করেননি এবং অতিরিক্ত সাজসজ্জা, প্রয়োজন ও স্থায়িত্বের বস্তুসমূহ তাদের হাতছাড়া হতে দেননি, তখন তিনি তাদেরকে চিরস্থায়ী ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে সম্মত হবেন কেমন করে?

বরং মানুষ গভীরভাবে লক্ষ করলে সে জানতে পারবে সৃষ্টির সিংহভাগ ইহকালে তার সুখের উপকরণরূপে প্রস্তুত করা হয়েছে। তাই মানুষ মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে চায় না। তাকে যদি বলা হয়, মনে করো পরকালে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না এবং হাশরেও ওঠানো হবে না তবুও সে মৃত্যু অপছন্দ করবে। কেননা নিয়ামতের উপকরণসমূহ তার ওপর প্রবল। মানুষ কখনোই মৃত্যু কামনা করে না। কখনোবা মৃত্যু কামনা করলেও সেটা হয় পরিস্থিতির শিকার হয়ে।

সুতরাং দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষ যখন শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রত্যাশী হয় তখন আল্লাহর নীতিতে আপনি কোনো পরিবর্তন পাবেন না। অর্থাৎ, আখেরাতের বিষয়টিও এমনই হবে। কেননা দুনিয়া ও আখেরাতের পরিচালক একই সত্তা। তিনি চির ক্ষমাশীল, অসীমদয়ালু। বান্দার প্রতি স্নেহশীল ও মেহেরবান। আপনি চিন্তার যত গভীরে প্রবেশ করবেন আশার উপকরণসমূহ ততই আপনার সামনে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিবে। শরিয়তের দর্শন, দুনিয়ার কল্যাণে এর রীতি এবং বান্দাদের প্রতি দয়ার আচরণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করাও একটি বিশ্বাস বা ইতেবার। জনৈক বুযুর্গ সূরা বাকারার আয়াতে মুদায়ানা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ তথা ঋণগ্রহণ সংক্রান্ত আয়াতকে রজার দৃঢ় উপায় হিসেবে দেখেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি এতে রজা তথা আশার কী উপায় দেখলেন? তিনি বললেন, দুনিয়ার জীবন খুবই কম। মানুষের রিযিকও স্বল্প। ঋণ হলো আরেকটি স্বল্প রিযিক। লক্ষণীয়, ঋণ যে সংক্রান্ত বিষয় সংরক্ষণে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দিকনির্দেশনা দিয়ে কীভাবে দীর্ঘতম আয়াত (বাকারা : ২৮২) নাযিল করেছেন। তাহলে বান্দা কেন তাঁর দীন হেফাজত করবে না, যে দীনের জন্য তিনি তার থেকে কোনো ধরনের বিনিময় নেননি?

রজা বা আশা প্রবল করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে রজা সম্পর্কিত আয়াত, হাদিস ও বুযুর্গদের উক্তিসমূহ অন্বেষণ করা এবং এগুলো নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তাভাবনা করা। এ সম্পর্কে কুরআনে অনেক আয়াত বর্ণিত রয়েছে। যেমন,

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

বলুন ‘হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ (তোমাদের) সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।’ (সূরা যুমার : ৫৩)

وَ الْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ.

এবং ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা শূরা : ৫)

তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, জাহান্নামকে দুশমনদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নিজের প্রিয় বান্দাদের সাবধান করেছেন। তাই বলা হয়েছে,

لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ.

তাদের জন্য তাদের ঊর্ধ্বদিকে থাকবে আগুনের মেঘমালা এবং নিম্নদিকে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। (সূরা যুমার : ১৬)

অন্য এক আয়াতে আরও বলা হয়েছে,

وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ

এবং তোমরা সেই আগুনকে ভয় করো, যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৩১)

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى. لَا يَصْلٰىهَا اِلَّا الْاَشْقَى. الَّذِىْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى.

আমি তোমাদের লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি। তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগা। যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়। (সূরা লাইল : ১৪-১৬)

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

মানুষের সীমালঙ্ঘন সত্ত্বেও আপনার প্রতিপালক মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। (সূরা রাদ : ৬)

বর্ণিত আছে, নবী কারীম (স) সব সময় উম্মতের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করতেই থাকতেন। সবশেষে তাঁর প্রতি উপরোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় এখনও কি আপনি খুশি নন?

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى.

অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে অনুগ্রহ দান করবেন ফলে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (সূরা দুহা : ৫) (কূতুল কুলূব : ১ : ১২৩)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এক মনীষী বলেন, মুহাম্মাদের উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিও যতক্ষণ জাহান্নামে থাকবে ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট

হবে না। (খতীব, তালখীসুল মুতাশাবিহ : ১ :১৭৩; দাইলামী, মুসনাদুল ফিরদাউস : ৭১৭৯)

হযরত আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে আলী (র) বলেন, তোমরা ইরাকিরা قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ আয়াতকে কুরআন মাজীদের সবচেয়ে বড় আশার আয়াত বলে থাকো, আর আমরা নবী পরিবারের লোকেরা وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى এ আয়াতকে সর্বাধিক আশার আয়াত বলে থাকি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৩, আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৫০৭, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ১৭৯)

## 'রজা' তথা আশা সংক্রান্ত হাদিস

হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, নবী কারীম (স) বলেন, আমার উম্মত রহমতপ্রাপ্ত। পরকালে এ উম্মতকে আযাব দেওয়া হবে না। তাদের মন্দ কর্মের শাস্তি আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে ভূমিকম্প ও অন্যান্য মুসিবত দ্বারা দিয়ে দেবেন। কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তি আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে একজনকে পাবে। বলা হবে, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনের "ফিদিয়া" (বিনিময়) এ ব্যক্তি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৩, সুনানে আবু দাউদ : ৪২৭৮, তবে 'কেয়ামতের দিন....' অংশটুকু নেই। ইবনে মাজাহ (র) আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন : ৪২৯২)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এভাবে বলা হয়েছে, এই উম্মতের প্রত্যেকেই একজন ইহুদি অথবা খ্রিস্টানকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে আসবে এবং বলবে জাহান্নামের জন্য এ ব্যক্তি আমার বিনিময়। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষিপ করা হবে। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ৪০৭, সহিহ মুসলিম : ২৭৬৭)

রাসূলুল্লাহ (স) আরও বলেন,

الْحُمّٰى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ وَهِيَ حَظُّ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ, জ্বর জাহান্নামের তাপের অংশ বিশেষ। তা জাহান্নাম হতে মুমিনের অংশ। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ২৫২)

আবু উমামা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে এ শব্দে বর্ণিত আছে,

اَلْحُمّٰى مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ. فَمَا أَصَابَ الْمُؤْمِنُ مِنْهَا كَانَ حَظَّه مِنَ النَّارِ.

জ্বর হলো জাহান্নামের হাপর। মুমিন বান্দা সে জ্বরে পতিত হয়, তা তার জাহান্নামের অংশ থেকে হয়ে থাকে।

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ.

সে দিন আল্লাহ লজ্জা দিবেন না নবীকে এবং তাঁর মুমিন সঙ্গীদের। (সূরা তাহরীম : ৮)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা নবী (স)-এর প্রতি ওহি নাযিল করেন যে, আপনার উম্মতের হিসাব আমি আপনার কাছে অর্পণ করছি। নবী (স) বললেন, لَا يَا رَبِّ، أَنْتَ خَيْرٌ لَّهُمْ مِنِّيْ হে আল্লাহ! আমার তুলনায় আপনিই তাদের জন্যে দয়ায় শ্রেষ্ঠ। আদেশ হলো, اِذًا لَا نُخْزِيْكَ فِيْهِمْ তাহলে আমি তাদের ব্যাপারে আপনাকে অপমানিত করব না। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৩, হুসনুয যন্ন বিল্লাহ, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৬২, মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৩৯৩)

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহ তাআলার নিকট আরজ করলেন, আমার উম্মতের গুনাহসমূহের হিসাব আমার নিকট সোপর্দ করুন। তাদের গুনাহ সম্পর্কে আমি ব্যতীত অন্য কেউ যেন অবহিত না হয়। উত্তরে বলা হলো, তারা তো শুধু আপনার উম্মত; কিন্তু আমার বান্দা। আমি তাদের জন্য আপনার তুলনায় অধিক দয়ালু। সুতরাং তাদের হিসাব আমাকে ব্যতীত কারও কাছে অর্পণ করা হবে না, যাতে তাদের গুনাহ সম্পর্কে আপনিও জানতে না পারেন এবং অন্য কোনো ব্যক্তিও জানতে না পারে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৩, আনাস বিন মালেক থেকে বর্ণিত)

এক হাদিসে আল্লাহর রাসূল (স) বলেছেন, আমার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তোমাদের জন্য উত্তম। জীবদ্দশায় আমি তোমাদের জন্য শরিয়ত প্রবর্তন করি। আর আমার মৃত্যুর পর তোমাদের আমল আমার সামনে পেশ করা হবে। তখন তোমাদের উত্তম আমলমূহের জন্য আমি আল্লাহ

তাআলার প্রশংসা করব এবং মন্দ আমলসমূহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। (তবারানীতে ইবনে সাদ : ২ : ১৭৪, মুসনাদে বাযযার : ১৯২৫, মুসনাদুল ফিরদাউস : ৬৮৬)

নবীজি (স) একদিন বললেন, يَا كَرِيْمَ الْعَفْوِ! হে সর্বোত্তম ক্ষমাকারী!

জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি কি জানেন, كَرِيْمُ الْعَفْوِ-এর ব্যাখ্যা কি? এর ব্যাখ্যা হলো, যিনি পাপসমূহ আপন অনুগ্রহে ক্ষমা করেন। অতঃপর দয়া করে গুনাহকে নেকি দ্বারা বদলে দেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৩, বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ৬৬৪৩)

নবীজি (স) একদিন এক লোককে বলতে শুনলেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ تَمَامَ النِّعْمَةِ. হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে নিয়ামতের পূর্ণতা প্রার্থনা করছি। নবীজি (স) তাকে বললেন, নিয়ামতের পূর্ণতার কী অর্থ, তুমি কি জানো? সে বলল, না। নবীজি (স) বললেন, জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যমে নিয়ামত পরিপূর্ণ হবে। (জামে তিরমিযী : ৩৫২৭, মুসনাদে আহমদ : ৫ : ২৩১)

উলামায়ে কেরাম বলেন, আল্লাহ তাআলা ইসলামকে আমাদের জন্য মনোনীত করে আমাদের উপর নিয়ামত পরিপূর্ণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا.

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন মনোনীত করলাম। (সূরা মায়েদাহ : ৩)

এক হাদিসে এসেছে, বান্দা যখন কোনো পাপ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন, আমার এই বান্দাকে দেখো! সে পাপ করেছে, এরপর ভেবেছে, তার একজন রব আছেন, যিনি ক্ষমা করেন এবং পাপের কারণে শাস্তিও দেন। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, অবশ্যই আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। (সহিহ বুখারী : ৭৫০৭ ও সহিহ মুসলিম : ২৭৫৮)

হাদিসে কুদসীতে আছে,

لَو أَذْنب العَبْد حَتَّى تبلغ ذنُوبه عنان السَّمَاء غفرتها لَهُ مَا استغفرني ورجاني.

বান্দার গুনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে, তবে যতক্ষণ সে মাফ চাইবে এবং আমার নিকট আশা রাখবে, আমি তাকে মাফ করে দিব। (হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, জামে তিরমিযী : ৩৫৪০)

অন্য এক হাদিসে এসেছে, আমার বান্দা যদি পৃথিবী পরিমাণ গুনাহ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হয় তাহলে আমিও সেই পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব। (সহিহ মুসলিম : ২৬৮৭)

এক হাদিসে আছে, যখন মানুষ গুনাহ করে, তখন ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত ফেরেশতা তা আমলনামায় লিখে না এ সময়ের মধ্যে যদি সে তাওবা করে নেয়, তাহলে সে গুনাহ লেখাই হয় না। অন্যথায় একটি গুনাহ লিখে নেওয়া হয়। আরেক বর্ণনায় আছে, ফেরেশতারা গুনাহ লিপিবদ্ধ করার পর বান্দা যদি কোনো নেক আমল করে, তখন ডান কাঁধের ফেরেশতা যিনি আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদের সর্দার, বাম কাঁধের ফেরেশতাকে বলেন, এই গুনাহটা বাদ রাখো। আমি তার একটি নেক আমলকে দশগুণ করব এবং এটাকে আরও নয়টি নেক আমলে উন্নীত করব। এরপর ওই গুনাহটি ফেলে দেওয়া হয়। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৪, হান্নাদকৃত যুহদ : ৯২০)

হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, যখন বান্দা গুনাহ করে, তখন তা তার আমলনামায় লেখা হয়। এক বেদুইন বলল, সে যদি তাওবা করে? তিনি বললেন, তাহলে মুছে ফেলা হয়। সে জিজ্ঞেস করল, যদি আবার গুনাহ্ করে? তিনি বললেন, তাহলে তার আমলনামায় লিখে নেওয়া হয়। বেদুইন বলল, যদি সে তাওবা করে নেয়? তিনি বললেন, তাহলে আমলনামা থেকে পুনরায় মুছে ফেলা হয়। বেদুইন বলল, এভাবে কতক্ষণ পর্যন্ত চলবে? তিনি বললেন, যতক্ষণ সে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করতে থাকবে। বান্দা যে পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনায় অবসন্ন না হয়, আল্লাহ সে পর্যন্ত মাফ করার কাজে অস্থির হন না। এরপর যখন বান্দা নেক কাজের ইচ্ছা করে, তখন ডান দিকের ফেরেশতা তা বাস্তবায়নের আগেই একটি নেকী লিখে নেয়। যদি সে নিয়তের পর তা

বাস্তবায়ন করে, তাহলে সেই ফেরেশতা দশটি নেক লিখে নেয়। এরপর আল্লাহ তাআলা একে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করেন। পক্ষান্তরে যখন মানুষ গুনাহ করার নিয়ত করে, তখন কার্যকর না করা পর্যন্ত কিছুই লেখা হয় না। কার্যকর করলে মাত্র একটি গুনাহ লেখা হয়, এরপর আল্লাহ আপন রহমতে তা মাফও করে দিতে পারেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৪, শুআবুল ঈমান : ৬৬৮৮)

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স) এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, আমি এক মাসের অধিক রোযা রাখি না এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের বেশি নামায পড়ি না। আমার ধনসম্পদে দান-সদকা, হজ, যাকাত ইত্যাদি কিছুই ফরয নয়। এমতাবস্থায় মরণের পর আমি কোথায় থাকবো? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, বেহেশতে। লোকটি বলল, আপনার সাথে? তিনি মুচকি হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথে। তবে শর্ত হলো, তুমি অন্তরকে হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত রাখবে, জিহ্বাকে গীবত ও মিথ্যা থেকে হেফাজত করবে এবং চক্ষুকেও দুটি বিষয় থেকে বিরত রাখবে। (১) আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ দর্শন এবং (২) কোনো মুসলমানকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা থেকে। যদি এ সকল বিষয় থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারো, তবে আমার সাথে একত্রে এবং আমার এ দু'হাতের তালুতে তুমি বেহেশতে যাবে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৫)

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, এক বেদুইন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হিসাব গ্রহণ করার দায়িত্ব কার? নবীজি (স) বললেন, আল্লাহ তাআলার। (বেদুইন জিজ্ঞেস করলেন, স্বয়ং তিনিই কি হিসাব গ্রহণ করবেন? নবীজি (স) বললেন, হ্যাঁ। তখন বেদুইন মৃদু হাসলেন। নবীজি (স) বললেন, হাসছো কেন? বেদুইন বললেন, সম্মানিতরা যখন পরিমাপ করে তখন মাফ করে দেয়। আবার হিসাব গ্রহণ করলে ছাড় দেয়। তখন নবীজি (স) বললেন, বেদুইনটি সত্য বলেছে। জেনে রেখো, আল্লাহ তাআলা থেকে অধিক সম্মানিত কেউ নেই। তিনি সর্বাধিক সম্মানিত। তারপর নবীজি (স) বললেন, এই বেদুইন দীনের সঠিক বুঝ পেয়ে গেছে। এই হাদিসে আরও এসেছে, আল্লাহ তাআলা কাবাঘরকে গৌরব ও মর্যাদা দান করেছেন। যদি কেউ এর এক একটি পাথর পৃথক করে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে পুড়িয়ে ফেলে, তাহলে অতটুকু পাপ হবে না,

যতটুকু আল্লাহর একজন অলীকে অবজ্ঞা করার কারণে হয়।[১] বেদুইন জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহর অলী কারা? তিনি বললেন, ঈমানদার সকলেই আল্লাহর অলী। তুমি কি কুরআনের সেই আয়াত শোননি, যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় বের করে আনেন। (সূরা বাকারা : ২৫৭) (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৪)

এক হাদিসে আছে,

اَلْمُؤْمِنُ أَفْضَلُ مِنَ الْكَعْبَةِ.

মুমিন ব্যক্তি কাবার চেয়েও উত্তম। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৯৩২ মর্মার্থ)

আরেক হাদিসে আছে,

اَلْمُؤْمِنُ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْمَلآئِكَةِ.

মুমিন আল্লাহ তাআলার নিকট ফেরেশতাদের থেকেও অধিক সম্মানিত। (শব্দের ভিন্নতা নিয়ে সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৯৪৭, শুআবুল ঈমান : ১৫০)

অন্য এক হাদিসে আরও বর্ণিত আছে,

خَلَقَ اللهُ تَعَالٰى جَهَنَّمَ مِنْ فَضْلِ رَحْمَتِهٖ سَوْطًا يَسُوْقُ اللهُ بِهٖ عِبَادَهٗ إِلَى الْجَنَّةِ.

আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে একটি চাবুকের মতো বানাবেন এবং তা দ্বারা (মুমিন বান্দাদের) জান্নাতের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৯)

আবু হুরায়রা (রা) মারফূ সূত্রে বর্ণিত,

عَجِبَ اللهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِي السَّلاَسِلِ.

আল্লাহ তাআলা এক কওমের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন যারা শৃঙ্খলিত হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (সহিহ বুখারী : ৩০১০)

---

১. আল্লামা হাফেজ ইরাকী (র) বলেছেন, আমি এই হাদিসটি খুঁজে পাইনি। ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ১৭৯।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَرْبَحُوْا عَلَيَّ، وَلَمْ أَخْلُقْهُمْ لَأَرْبَحَ عَلَيْهِمْ.

আমি সৃষ্টিজীবকে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা আমার কাছে লাভবান হয়। আমি তাদের দ্বারা লাভবান হওয়ার জন্য তাদের সৃষ্টি করিনি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৯, আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৫১)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন,

مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالٰى شَيْئًا إِلَّا جَعَلَ لَهُ مَا يَغْلِبُه، وَجَعَلَ رَحْمَتَهُ تَغْلَبُ غَضَبَهُ.

আল্লাহ তাআলা কোনো কিছু সৃষ্টি করার পর তারচে প্রবল আরেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। যেমন তিনি তাঁর ক্রোধের ওপর তাঁর রহমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৪ : ২৪৯, মুসনাদুল ফিরদাউস : ৬২০৭, মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১১ : ৪৬৩, যায়েদ বিন আসলামা থেকে 'মুরসাল' সূত্রে বর্ণিত)

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الخَلْقَ: إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِيْ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিজীব সৃষ্টির পূর্বেই নিজের ব্যাপারে এ কথা নির্ধারণ করে নিয়েছেন যে, আমার রহমত আমার গযবের ওপর প্রবল হয়ে থাকে। (সহিহ বুখারী : ৭৫৫৪, সহিহ মুসলিম : ২৭৫১)

হযরত মুয়ায বিন জাবাল এবং আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত নবীজি (স) বলেছেন,

مَنْ قَالَ: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৯, সুনানে নাসায়ী সংকলিত : عَمَلُ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ)

مَنْ كَانَ اٰخِرُ كَلَامِهٖ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ.

যার শেষ কথা হবে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ জাহান্নাম তাকে স্পর্শ করবে না। (সুনানে আবু দাউদ : ৩১১৬)

مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ النَّارَ.

যে ব্যক্তি শিরক থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে... জাহান্নাম তার ওপর হারাম করে দেওয়া হবে। (বুখারী; আনাস (রা) থেকে বর্ণিত : ১২৯; সহিহ মুসলিম; জাবের থেকে বর্ণিত : ৯৩)

অপর এক হাদিসে রয়েছে,

لَوْ عَلِمَ الْكَافِرُ سَعَةَ رَحْمَةِ اللهِ مَا اَيِسَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ.

অর্থাৎ, যদি কাফের আল্লাহ তাআলার রহমতের প্রশস্ততা সম্পর্কে জানতে পারতো তাহলে কোনো ব্যক্তিই আল্লাহর জান্নাত থেকে নিরাশ হতো না। (সহিহ বুখারী : ৬৪৬৯; সহিহ মুসলিম : ২৭৫৫)

একদিন রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন,

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ.

(জেনে রেখো) কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার! (সূরা হজ : ১)

এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো এটা কোন দিন? এটা সেই দিন, যখন আদম (আ)-কে বলা হবে, দাঁড়াও এবং নিজের সন্তানাদির মধ্য থেকে জাহান্নামের রসদ বের করো। তিনি বলবেন, কী পরিমাণ বের করব? বলা হবে, একহাজারের মধ্যে একজনকে বেহেশতের জন্য এবং অবশিষ্ট নয়শ' নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের জন্য বের করো। একথা শুনে সাহাবারা আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং কাঁদতে শুরু করলেন। সেদিন কোনো কাজেই তাদের মন বসলো না।

আল্লাহর রাসূল (স) তাদের এ অবস্থা দেখে বললেন, তোমরা কাজ করছ না কেন? তারা বললেন, আপনার মুখে সেই হাদিস শোনার পর কাজ করার ক্ষমতা কার আছে? নবী কারীম (স) বললেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় তোমাদের সংখ্যা কত? তাবীল, তারীছ, মুনসুক, ইয়াজুজ-মাজুজ, সম্প্রদায় কোথায়? সেসব সম্প্রদায় তো এত বেশি, যার সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাদের সামনে তোমাদের কোনো গণনাই হতে পারে না। তাদের সকলের তুলনায় তোমরা কাল গরুর চামড়ায় একটি সাদা চুল কিংবা ঘোড়ার পায়ে অন্য রঙের মতো। (জামে তিরমিযী : ৩১৬৮, সহিহ বুখারী : ৩৩৪৮, সহিহ মুসলিম : ২২২)

এ হাদিস থেকে জানা গেল, সাহাবায়ে কেরামকে রাসূলুল্লাহ (স) ভীতির চাবুক দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যেতেন। তারপর আশার লাগাম টেনে কীভাবে

আল্লাহর দিকে নিয়ে আসতেন। তিনি প্রথমে শঙ্কার চাবুক দিয়ে হাঁকিয়েছেন। কিন্তু যখন জানতে পারলেন, অত্যধিক ভয় তাদেরকে সীমার বাইরে নিয়ে গেছে এবং তারা হতাশার গর্তে পড়ে গেছে, তখন খুব দ্রুত আশার ওষুধ প্রয়োগ করে তাদের চিকিৎসা করলেন। এভাবে তাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন।

এক হাদিসে আছে,

لَوْلَا أَنَّكُمْ تُذْنِبُونَ لَخَلَقَ اللهُ خَلْقًا يُذْنِبُونَ لِيَغْفِرَ لَهُمْ.

তোমরা যদি পাপ না করো, তবে আল্লাহ তাআলা অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন, যারা গুনাহ করবে যাতে আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

لَذَهَبَ بِكُمْ وَجَاءَ بِخَلْقٍ اٰخَرَ يُذْنِبُوْنَ فَيَغْفِرُلَهُمْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

তিনি তোমাদের ধ্বংস দিয়ে অপর এক সৃষ্টি আনবেন যারা গুনাহ করবে তখন তিনি তাদের ক্ষমা করবেন। নিশ্চয় তিনি পরম ক্ষমাশীল, চির দয়াময়। (সহিহ মুসলিম : ২৭৪৮, ২৭৪৯)

এক হাদিসে আছে,

لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَخَشِيْتُ عَلَيْكُمْ مَا هُوَ شَرٌّ مِنَ الذُّنُوْبِ، قِيْلَ: مَا هُوَ؟ قَالَ اَلْعُجْبُ.

তোমরা যদি গুনাহ না কর, তাহলে তোমাদের ব্যাপারে আমি এমন বিষয়ের ভয় করি, যা গুনাহের চেয়েও ভয়ানক। প্রশ্ন করা হলো, সে বিষয়টি কী? তিনি বললেন, অহমিকা। (মুসনাদে বাযযার : ৬৯৩৬)

নবী কারীম (স) বলেছেন,

وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لله أَرْحم بِعَبْدِهِ الْمُؤمن من الوالدة الشفيقة بِوَلَدِهَا.

ওই সত্তার কসম! যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ। সন্তানের প্রতি একজন মমতাময়ী মায়ের দয়াদ্রতার চেয়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনেক অনেক দয়ালু। (সহিহ বুখারী : ৫৯৯৯, সহিহ মুসলিম : ২৭৫৪)

হাদিসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এত বিপুল পরিমাণে ক্ষমা করবেন, যা কারও কল্পনায় আসবে না। এমনকি ক্ষমা লাভের আশায় ইবলিস

শয়তানও ছোটাছুটি করবে। (হুসনুয যন্ন বিল্লাহ, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৯৩, যুহুদ-এ ইবনে মোবারকের একটি বর্ণনা কাছাকাছি অর্থের : ১২৭০)

এক হাদিসে আরও বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর ১০০টি রহমতের মধ্যে ৯৯টি নিজের নিকটে রেখেছেন এবং একটি মাত্র রহমত দুনিয়াতে প্রকাশ করেছেন। এ একটি রহমতের কারণেই সমগ্র মানবজাতি একে অপরের জন্য দয়া করে। মা তার সন্তানকে স্নেহ করে এবং জীবজন্তু তাদের বাচ্চাদের পছন্দ করে। কেয়ামতের দিন আল্লাহ এই একটি রহমতকে সেই নিরানব্বইটি রহমতের সঙ্গে যোগ করে সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন। তন্মধ্যে প্রত্যেক রহমত আকাশ ও পৃথিবীর স্তরসমূহের সমান হবে। সেদিন হতভাগা ব্যক্তিরাই ধ্বংস হবে; অন্য কেউ নয়। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২১, অনুরূপ সহিহ বুখারী : ২০০০, ২৪৬৯ ও সহিহ মুসলিম : ২৭৫২)

আল্লাহর রাসূল (স) আরও বলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যার আমল তাকে জান্নাতে পৌঁছাবে অথবা জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনিও কি তেমনি?

তিনি বললেন,

وَلَا انا الا ان يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِهِ.

হ্যাঁ, আমার অবস্থাও তাই; যে পর্যন্ত আল্লাহর রহমত আমাকে ঢেকে না নেয়। (সহিহ বুখারী : ৫৬৭৩, সহিহ মুসলিম : ২৮১৬)

আরেক হাদিসে নবীজি (স) বলেন,

اِعْمَلُوْا وَأَبْشِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَن أَحَدًا لَنْ يُّنْجِيْهِ عَمَلُهُ

আমল করো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। জেনে রাখো, আমল কাউকে নাজাত দিবে না। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২১)

এক হাদিসে বলা হয়েছে, আমি আমার শাফাআত উম্মতের পাপীদের জন্য গোপন রেখেছি। শাফাআত শুধু মুত্তাকীদের জন্যই নয়; বরং গুনাহগারদের জন্যও বটে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২১, সহিহ বুখারী : ৬৩০৪, সহিহ মুসলিম : ১৯৮, সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪৩১১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ.

আমাকে সঠিক সহজ সরলতম দীন নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ২৬৬, কূতুল কুলূব : ১ : ২২২)

নবীজি (স) বলেন,

أُحِبُّ أَن يَّعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ أَنَّ فِيْ دِيْنِنَا سَمَاحَةً.

আমি চাই, ইহুদি খ্রিস্টানরা জানুক আমাদের ধর্মে রয়েছে উদারতা। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২২, মুসনাদে আহমদ : ৬ : ১১৬)

উপর্যুক্ত হাদিসের মর্মার্থের ওপর প্রমাণ বহন করে মুমিনদের এই প্রার্থনা وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا (আমাদের ওপর বোঝা চাপাবেন না) এবং আল্লাহ তাআলার প্রার্থনা কবুল করে এই বক্তব্য প্রদান—

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

(এবং যিনি মুক্ত করেন তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল হতে যা তাদের ওপর ছিল)।

মুহাম্মদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (র) আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো, فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيْلَ 'হে নবী! আপনি উত্তমরূপে মার্জনা করুন। (সূরা হিজর : ৮৫) নবীজি (স) বললেন, হে জিবরাঈল! উত্তম মার্জনার কী অর্থ? তিনি বললেন, কেউ আপনার প্রতি জুলুম করলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তাকে ভর্ৎসনা করবেন না। নবীজি (স) বললেন, হে জিবরাঈল, তাহলে আল্লাহ তাআলা যাকে ক্ষমা করবেন, তাকে ভর্ৎসনা করা থেকে তিনি অতি মহান। এ কথা শুনে জিবরাঈল কাঁদতে শুরু করেন। সঙ্গে নবীজি (স)ও কাঁদতে থাকেন। তখন আল্লাহ তাআলা মিকাঈল (আ)-কে তাঁদের কাছে প্রেরণ করে সংবাদ দেন। আপনাদের রব আপনাদের সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন, আমি যাকে ক্ষমা করি তাকে কীরূপে ভর্ৎসনা করবো? আমার মহত্বের সঙ্গে ভর্ৎসনা যায় না। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৩, আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, শুআবুল ঈমান : ৭৯৮৬)

রজা তথা আশা সম্পর্কে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, কলেবর বৃদ্ধির শঙ্কায় সংক্ষিপ্ত করা হলো।

## রজা বা আশা সম্পর্কে বুযুর্গগণের উক্তি

হযরত আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তির পাপ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে গোপন রাখেন, তাঁর রহমত এটা চায় না যে, তার পাপের পর্দা পরকালে খুলে দেবেন। আর যে লোক পাপের শাস্তি দুনিয়াতেই পেয়ে যায়, আল্লাহর ন্যায়পরায়ণতা এটা চায় না যে, পরকালে সে পুনরায় শাস্তি ভোগ করুক। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৪, জামে তিরমিযী : ২৬২৬, সুনানে ইবনে মাজাহ : ২৬০৪)

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমার হিসাব যদি আমার পিতা-মাতার হাতে দেওয়া হয়, তবু আমি ভালো মনে করি না। কেননা, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলা আমার জন্য পিতা-মাতার চেয়েও অধিক মেহেরবান। (কূতুল কূলুব : ১ : ২১৩)

এক বুযুর্গ ব্যক্তি বলেন, মুমিন যখন অবাধ্য হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তার গুনাহ ফেরেশতাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দেন, যাতে তারা অপরাধ দেখে সাক্ষী না হতে পারে। (কূতুল কুলূব : ২১৩)

মুহাম্মদ ইবনে মুসআব (র) এক পত্রে আসওয়াদ ইবনে সালেমকে লিখেন— যখন বান্দা নিজের প্রতি জুলুম করে এরপর "ইয়া রব" বলে হাত উঠায়, তখন ফেরেশতারা তার আওয়াজ ফিরিয়ে রাখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার তাই করে। অতঃপর বান্দা যখন চতুর্থবার ইয়া রব! ডাকে, তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার আওয়াজ কতক্ষণ পর্যন্ত গোপন রাখবে? আমার বান্দা তো জেনে নিয়েছে যে, আমি ব্যতীত তার গুনাহ মাফ করার মতো আর কোনো রব নেই। আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাকে মাফ করে দিলাম। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৪)

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বলেন, এক রাতে একাকী কাবা ঘর তওয়াফ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বৃষ্টিপূর্ণ গভীর অন্ধকার রাতে আমি মুলতাযামে কাবার দরজার নিকট দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে গুনাহ থেকে বাঁচান। আমি কখনো যেন আপনার নাফরমানি না করি। সাথে সাথে কাবা ঘরের ভিতর থেকে এক গায়েবী আওয়াজ এলো, হে ইবরাহীম! তুমি আমার নিকট পাপমুক্ত থাকার প্রার্থনা করছ। ঈমানদার মাত্রই তা চায়। কিন্তু আমি যদি সবাইকে নিষ্পাপ বানিয়ে দেই, তাহলে আমার করুণা ও ক্ষমা কার জন্যে থাকবে? (কূতুল কুলূব : ১ : ২২০)

হাসান বসরী (র) বলতেন, ঈমানদার ব্যক্তি যদি গুনাহ না করত, তবে অদৃশ্য জগৎ ও আসমানি রহস্যসমূহে উড়ে বেড়াত। কিন্তু গুনাহর কারণে আল্লাহ তাআলা বান্দার পাখা ভেঙ্গে দিয়েছেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২০)

জুনাইদ (র) বলেন, যদি দয়ার দৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয় তাহলে গুনাহগাররাও নেককারদের দলভুক্ত হয়ে যাবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ২৬৩)

মালেক ইবনে দিনার (র) ইয়াহইয়া ইবনে আবান (র)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, আপনি কতজন মানুষকে ক্ষমার বাণী শুনিয়েছেন। এরপর তিনি বললেন, হে ইয়াহইয়া! আমি আশা করছি, কেয়ামতের দিন তুমি আল্লাহ তাআলার ক্ষমা দেখে আনন্দে তোমার পোশাক ছিঁড়ে ফেলবে। (হুসনুয যন্নি বিল্লাহ, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৮২)

হযরত রিবয়ী ইবনে খেরাশ (র)-এর ঘটনা। তিনি বর্ণনা করেন, আমার ভাইয়ের ইন্তিকাল হলে তাকে কাফন পরিয়ে জানাযার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলাম। এমন সময় ভাই তাঁর চেহারা থেকে কাফনের কাপড় সরিয়ে সোজা হয়ে বসে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, আমি আমার মহান প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি আমাকে উত্তম অভিবাদন জানিয়েছেন এবং তোমরা যেমন কঠিন মনে করেছিলে আমি বিষয়টি তার চেয়ে অনেক সহজ পেয়েছি। এখন আর বিলম্ব করো না। (জানাযা দিয়ে দাও।) কেননা রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর সাহাবীগণ আমার অপেক্ষায় আছেন। আমি তাদের কাছে ফিরে যাব। এ কথা বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। অতঃপর আমরা তাকে দাফন দিয়ে দিলাম। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২২)

এক হাদিসে বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পরস্পরে ভাই ভাই ছিল। তাদের একজন গুনাহগার, অপরজন আবেদ (ইবাদতগুজার)। আবেদ সর্বদা গুনাহগার ভাইকে উপদেশ দিতো ও তিরস্কার করতো। সে উত্তরে বলত, আমি জানি আর আমার প্রতিপালক জানেন। তুমি আমার ওপর পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পাওনি। একদিন আবেদ তাকে কবিরা গুনাহ করতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে ফেলল, আল্লাহ তোকে ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাআলা এই গুনাহগারকে কিয়ামতের দিন বলবেন, কারও সাধ্য নেই যে আমার রহমত আমার বান্দা থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর

আবেদকে বলবেন, তোমার জন্যে আমি দোযখ অপরিহার্য করে দিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, এই আবেদ এমন কথা বলল, যা দ্বারা তার দীন ও দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস হয়ে গেল। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৯০১)

বর্ণিত আছে, বনি ইসরাঈলের এক চোর চল্লিশ বছর পর্যন্ত চুরি করে যাচ্ছিল। একদিন হযরত ঈসা (আ) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার পিছনে ছিল একজন হাওয়ারী। (হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীকে হাওয়ারী বলা হয়)। চোর মনে মনে বলল, আল্লাহর এই নবী পথ দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর সাথে রয়েছেন একজন হাওয়ারী। আমিও যদি তাদের সাথে চলতে থাকি তাহলে ভালো হবে। এই মনস্কামনায় সে তাদের সঙ্গে চলতে লাগলো। হাওয়ারীর সম্মান মর্যাদা এবং নিজের তুচ্ছ অবস্থানের কথা ভেবে তার পিছনে পিছনে চলে বলতে লাগলো, আমার মতো মানুষের একজন আবেদের সঙ্গে চলা সমীচীন নয়। অপরদিকে আবেদ বুঝতে পারল যে, লোকটি চোর। সে মনে মনে ভাবলো, একটি চোর আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে! এ কথা ভেবে সে সামনে এগিয়ে হযরত ঈসা (আ)-এর বরাবর হাঁটতে লাগলো। বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহ তাআলা তখন হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট ওহি প্রেরণ করেন যে, তাদের দুজনকে বলে দিন, তোমাদের পূর্বের সকল আমল বরবাদ হয়ে গেছে। সুতরাং নতুনভাবে আমল শুরু করো। হাওয়ারীর নেক আমল নষ্ট হওয়ার কারণ ছিলো আত্মম্ভরিতা। পক্ষান্তরে চোরের খারাপ কর্মসমূহ মিটিয়ে দেওয়ার কারণ ছিলো নিজেকে ছোটো মনে করা। হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী তাদেরকে বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। অতঃপর চোরকে নিজের সঙ্গে নিয়ে তাকে হাওয়ারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৩)

মাসরুক (র) থেকে বর্ণিত, কোনো এক নবী (আ) সিজদায় ছিলেন। তখন এক দুরাচারী তাঁর ঘাড় মাড়িয়ে দেয় এবং তার মুখমণ্ডল ধূলিমলিন করে ফেলে। নবী (আ) ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে সিজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে নবীকে জানালেন, তুমি আমার বান্দার ব্যাপারে আমার শপথ করছো! যাও, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৩)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (স) নামাযে মুশরিকদের জন্য বদদুআ করতেন। এর প্রেক্ষিতে আয়াত নাযিল হয়—

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ.

(হে নবী!) আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি দিবেন, এ বিষয়ে আপনার করণীয় কিছুই নেই। (সূরা আলে ইমরান : ১২৮)

এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বদদুআ বর্জন করলেন এবং আল্লাহ তাদের অধিকাংশকে ইসলাম গ্রহণের হেদায়েত দান করলেন। (সহিহ বুখারী : ৪০৭০, সহিহ মুসলিম : ৬৭৫, কূতুল কুলূব : ১ : ২২৩)

বর্ণিত আছে, দুই আবেদ ইবাদতে এক সমান ছিল। যখন তারা বেহেশতে গেল, তখন একজন অপরজনের চেয়ে উচ্চ মর্যাদা পেল। যার মর্যাদা কম ছিল, সে বলল, হে রব! দুনিয়াতে এ লোক আমার চেয়ে বেশি ইবাদত করতো না। কিন্তু আপনি তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন! আল্লাহ তাআলা বললেন, দুনিয়ায় সে আমার কাছে উচ্চ মর্যাদার আবেদন করতো। আর তুমি শুধু জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার দুআ করতে। অতএব আমি প্রত্যেককে তার আবেদন অনুযায়ী দান করেছি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৪)

এ থেকে বোঝা গেল যে, আশা নিয়ে ইবাদত করা উত্তম। কেননা, যে আশা করে তার মধ্যে মহব্বত বেশি থাকে। এদিকে লক্ষ্য করেই রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

سَلُوا اللهَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا فَإِنَّمَا تَسْأَلُوْنَ قَرِيْبًا.

আল্লাহ তাআলার কাছে উচ্চ মর্যাদা কামনা করো। কেননা তোমরা এমন দাতার কাছে চাও, দান করা যার জন্য কোনো কঠিন বিষয় নয়। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৪)

তিনি আরও বলেন,

إِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاعْطُوْا الرَّغْبَةَ وَسَلُوْا الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلٰى فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ.

যখন আল্লাহর নিকট কোনো কিছু চাও, তখন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে চাও এবং উচ্চতম ফিরদাউসের আবেদন করো। কেননা, কোনো জিনিসই তার নিকট বড় নয়, যা তিনি দিতে সক্ষম নন। (সহিহ বুখারী : ২৭৯০, সহিহ মুসলিম : ২৬৭৯)

বকর ইবনে সুলাইম আস সওয়াফ বলেন, মালিক বিন আনাস যেদিন সন্ধ্যায় মৃত্যুবরণ করেন আমরা তার সঙ্গে সেদিন দেখা করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনার কাছে কেমন লাগছে? তিনি বললেন, আমি বলতে পারছি না। তবে অচিরেই তোমরা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কল্পনাতীত ক্ষমা প্রত্যক্ষ করবে।' এরপর তিনি ইন্তেকাল করেন। (হুসনুয যন্ন বিল্লাহ, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৮৫, আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪৬)

ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায তার মুনাজাতে বলতেন ইলাহী! যদিও আমি অনেক গুনাহ করেছি তবুও তোমার উপর আমি এমনভাবে ভরসা করি যা নিজের আমলের উপর করি না। কারণ আমল তো ইখলাসের উপর নির্ভরশীল। যখন আমি ইখলাসের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হবো তখন আমি বিপদে পড়ে যাবো। আমি তো গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। এ অবস্থায় আমার ভরসা কেবলই তোমার উপর। তুমি যদি ক্ষমা না করো তাহলে ক্ষমা তোমার অনুপম বৈশিষ্ট্য হয় কেমন করে?

বর্ণিত আছে, এক অগ্নিপূজারি হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)-এর নিকট আতিথেয়তা চাইলে তিনি বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে গেলে আমি তোমার মেহমানদারি করব। এতে অগ্নিপূজারি চলে গেল। আল্লাহ তাআলা সাথে সাথে হযরত ইবরাহীমের নিকট এ মর্মে ওহি পাঠিয়ে বললেন, তুমি ভিন্নধর্মী হওয়ার কারণে তাকে খেতে দাওনি। অথচ সত্তর বছর ধরে কুফরি করা সত্ত্বেও আমি তাকে খাদ্য দিয়ে আসছি। এক বেলা খাইয়ে দিলে তেমন কী হত? হযরত ইবরাহীম (আ) মুহূর্তকাল দেরি না করে অগ্নিপূজক লোকটির পিছনে দৌড়ে গেলেন এবং তাকে ফিরিয়ে এনে খাইয়ে দিলেন। অগ্নিপূজক এখন মেহমানদারির কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। অগ্নিপূজক বলল, আল্লাহ তাআলা আমার সাথে এমন ব্যবহার করেন! এরপর সে মুসলমান হয়ে যায়। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪৭, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ১৮৯)

আবু সাহল সালউকী (র) মানুষকে সর্বদা আখেরাতের ভীতি প্রদর্শন করতেন। তিনি আবু সাহল যুজাজী (র)-এর ইন্তিকালের পর স্বপ্নে তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি আমার মোয়ামালা

সহজ পেয়েছি। অর্থাৎ মৃত্যু পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে তিনি খুবই ভীত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর প্রশস্ত রহমতের কারণে সহজতা লাভ করেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪৭)

বর্ণিত আছে, কেউ উস্তাদ আবু সাহল (র)-কে তাঁর মৃত্যুর পর অত্যন্ত সুন্দর অবস্থায় দেখতে পেলেন, যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এমন মর্যাদা আপনি কীভাবে লাভ করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ সম্পর্কে উত্তম ধারণা পোষণ করতাম, ফলে আমাকে তা-ই দেওয়া হয়েছে। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪৯)

বর্ণিত আছে, আবুল আব্বাস বিন সুরাইজ (র) অন্তিম অসুস্থতার দিনগুলোতে একদিন স্বপ্নে দেখলেন, যেন কেয়ামত কায়েম হয়ে গেছে। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তাআলা বলছেন, আলেমরা কোথায়? ইবনে সুরাইজ বলেন, আলেমগণ উপস্থিত হওয়ার পর আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা তোমাদের ইলম অনুযায়ী কী আমল করেছ? তারা বললেন, আমরা অপরাধ করেছি এবং গুনাহ করেছি। আল্লাহ তাদের পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন যেন তাদের জবাবে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি; তাদের থেকে ভিন্ন জবাব চাচ্ছেন। তখন আমি বললাম, আমার আমলনামায় কোনো শিরক নেই। আর আপনি ওয়াদা করেছেন, শিরক ব্যতীত সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ বললেন, তোমরা একে নিয়ে যাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। এ স্বপ্নের তিনদিন পর আবুল আব্বাস ইবনে সুরাইজ ইন্তেকাল করেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪৯)

বর্ণিত আছে, এক মদখোর ব্যক্তি একবার জমকালো পার্টির আয়োজন করল। তাতে ছিল বিভিন্ন প্রকার মদে সুসজ্জিত পানশালা। দাওয়াত করল তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের। সব ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হলে ভৃত্যের হাতে চার দিরহাম দিয়ে মেহমানদের জন্য ফল কিনে আনার নির্দেশ দিল। ভৃত্য দিরহাম হাতে বাজারের দিকে ছুটলো। পথিমধ্যে তার সাক্ষাৎ হলো প্রখ্যাত বুযুর্গ মানসুর ইবনে আম্মারের সঙ্গে। মানুসর ইবনে আম্মার বলছিলেন, যে দারিদ্র্যপীড়িত ও অভাবীকে চার দিরহাম দান করবে তার জন্য আমি চারটি দুআ করবো। ভৃত্য তার কথায় বিগলিত হয়ে চারটি দিরহাম দান করে দিল। মানসুর ইবনে আম্মার তার দিকে তাকিয়ে বললেন, বৎস! বলো, কী দুআ করাতে চাও?

ভৃত্য বলল, আমি দাসত্ব থেকে মুক্তি চাই। আমি চাই আল্লাহ তাআলা আমাকে চার দিরহামের বদলে চার দিরহাম দিয়ে দেন। আল্লাহ যেন আমার মনিবকে শরাব পান থেকে তওবা করার তাওফিক দেন। আল্লাহ যেন আমি, আমার মনিব, আপনি ও সবাইকে ক্ষমা করেন।

মানসুর ইবনে আম্মার হাত তুলে দুআ করলেন।

ভৃত্য খালি হাতে পানশালায় ফিরে এলো। তাকে খালি হাতে দেখে মনিব জিজ্ঞেস করল, এত দেরি হলো কেন? ফল আনতে বলেছিলাম তা কেন আনোনি?

ভৃত্য তার সঙ্গে ঘটে যাওয়া সব কথার বর্ণনা দিল। চারটি দুআর বিনিময়ে চার দিরহাম দিয়ে আসার কথাও বলল সে।

বর্ণনা শুনে মনিবের রাগ কিছুটা প্রশমিত হলো। আওয়াজ নরম করে বলল, ঠিক আছে বলো, কী দুআ চেয়েছো তুমি? তোমার প্রথম চাওয়াটা কী ছিল?

-আমি নিজের জন্য মুক্তি চেয়েছি।

মনিব বলল, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। আজ থেকে তুমি মুক্ত।

-তোমার দ্বিতীয় চাওয়াটা কী ছিল?

-আল্লাহ যেন আমার চারটি দিরহাম ফেরত দেন।

-তোমাকে চার হাজার দিরহাম প্রদান করা হলো, বলল মনিব।

-তোমার তৃতীয় চাওয়াটি কী?

-আল্লাহ যেন আপনাকে তওবা করার তাওফিক দান করেন।

ভৃত্যের কথা শুনে মনিব মাথা নিচু করে ডুকরে কেঁদে ওঠল। হাত থেকে শরাবের বোতল ছুঁড়ে ফেললো। অন্য বোতলগুলোও ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বলল, আমি আল্লাহর কাছে তওবা করছি। আর কখনো শরাব পান করবো না।

-এবার বলো, তোমার চতুর্থ চাওয়া কী ছিল?

-আল্লাহ যেন আমাকে, আপনাকে এবং কওমের সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

মনিব বলল, এটি আমার সাধ্যের বাইরে; এটি আমার কাজ নয়। এটি ক্ষমার আধার দয়াময়ের জন্যই সংরক্ষিত। সে রাতে মনিব স্বপ্নে দেখলো,

অদৃশ্য থেকে তাকে উদ্দেশ্য করে বলা হচ্ছে, বান্দা! তুমি তোমার সাধ্যের সবটুকু করেছো। কীভাবে ভাবলে যে, আমি আমার দায়িত্ব আদায় করবো না?

হে বান্দা! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ক্ষমা করে দিয়েছেন, তোমার গোলাম, মানসুর ইবনে আম্মারসহ অপরাপর সবাইকে। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪৯)

আবদুল ওয়াহহাব ইবনে আবদুল হামিদ সাকাফী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে একটি জানাযা নিয়ে যেতে দেখলাম। আমি তখন মহিলাটি জানাযার খাটের যে অংশটি বহন করছিল তা নিয়ে নিলাম এবং কবরস্থানে গিয়ে জানাযার নামায পড়ে সে ব্যক্তিকে দাফন করলাম। আমি মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, মৃত ব্যক্তি আপনার কে হয়? সে বলল, আমার ছেলে। আমি বললাম, আপনার কি কোনো প্রতিবেশী নেই, তারা সঙ্গে এলো না কেন? তিনি বললেন, প্রতিবেশী তো আছে। কিন্তু তারা আমার ছেলেকে ঘৃণা করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তার মধ্যে এমন কী খারাপ গুণ আছে, যার কারণে মানুষ তাকে ঘৃণা করতো? উত্তরে মহিলা বললেন, আমার ছেলে নপুংসক ছিল। এই ঘটনা শুনে মহিলার প্রতি আমার দয়া হলো। আমি তাকে কিছু টাকাপয়সা ও কাপড়চোপড় দিয়ে দিলাম। সেই রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাদা পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি আমার নিকট এলো। দেখে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় জ্বলজ্বল করছে মনে হচ্ছিল। সে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? সে বলল, আমি ওই নপুংসক ব্যক্তি যাকে আজ আপনি দাফন করেছেন। মানুষ আমাকে ঘৃণা করতো, তাই আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি দয়া করেছেন। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৫০)

ইবরাহীম উতরোশ (র) বর্ণনা করেন, আমরা কিছু লোক বাগদাদের দজলা নদীর তীরে হযরত মারূফ কারখী (র)-এর সঙ্গে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে একটি নৌকাতে কয়েকজন যুবক শরাব পান করে, ঢোল পিটিয়ে নৌ-বিহারে বের হলো। আমরা হযরত মারূফকে বললাম, দেখুন, এরা প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানি করছে। এদের জন্য বদদুআ করুন। তিনি হাত তুলে দুআ করলেন, ইয়া রব! আপনি তাদেরকে দুনিয়াতে যেমন

উৎফুল্ল রেখেছেন, পরকালে তেমনি উৎফুল্ল রাখুন। উপস্থিত লোকেরা বলল, আমরা তো তাদের জন্য বদদুআ করতে বলেছিলাম, আপনি কী করলেন? তিনি বললেন, যদি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পরকালে উৎফুল্ল রাখেন, তবে প্রথমে দুনিয়াতে তাওবা করার তাওফিক দেবেন। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ৬২৭৬, আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৫১)

অর্থাৎ, তাঁর দুআর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যেন এসব কুকর্ম থেকে তওবা নসীব করেন।

এক বুযুর্গ তার দুআয় বলছিলেন, হে আল্লাহ! মানুষ আপনার নাফরমানি করে, কিন্তু তাদের ওপর আপনার নিয়ামত পর্যাপ্ত এবং আপনার রিযিক অফুরন্ত। আপনি মহান, আপনার মর্যাদা সুউচ্চ। আপনার নাফরমানি করা হয়। তথাপি আপনি অজস্র নিয়ামত বর্ষণ করেন এবং ফল্গুধারায় রিযিক প্রদান করেন। কেমন যেন আপনার অনুগত্য করা হয়।

হে আমার রব, আপনি কতো সহনশীল! আপনার নাফরমানি করা হয় আর আপনি অবারিত রিযিক দান করেন এবং অসংখ্য নিয়ামতে আচ্ছাদিত করে রাখেন। হে প্রভু! মনে হয় আপনি অসন্তুষ্ট হন না। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ১৫১)

উপর্যুক্ত বিষয়বস্তুগুলো দ্বারা ভীত ও নিরাশ ব্যক্তিদের অন্তরে রজা বা আশা প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। কিন্তু নির্বোধ ও আত্মপ্রতারিতদেরকে কখনো এসব কথা শুনাতে নেই। তাদের জন্যে উপযুক্ত বিষয়বস্তু হচ্ছে খওফ (ভয়), যা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হবে। কেননা, অধিকাংশ লোক কেবল খওফ বা ভয় দ্বারাই সংশোধনপ্রাপ্ত হয়।

# দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
# খওফ (ভয়)

## খওফ (ভয়)-এর প্রকৃতি

খওফ হচ্ছে অন্তরের দুঃখ ও অভ্যন্তরীণ পীড়া, যা ভবিষ্যতের কোনো খারাপ পরিণামের আশঙ্কায় সৃষ্টি হয়। যে আল্লাহর সাথে নিবিড় সম্পর্ক রাখে এবং যে সর্বক্ষণ আল্লাহর সৌন্দর্য অবলোকন করে, তার ভবিষ্যতের প্রতি কোনোই খেয়াল থাকে না। ফলে তার ভয় ও আশা কোনো কিছুই হয় না। তার অবস্থা এ সকল বিষয়ের ঊর্ধ্বে। কেননা, ভয় ও আশা হচ্ছে দুটি লাগাম, যা মনকে তার দাম্ভিকতার দিকে যেতে দেয় না। ওয়াসেতী (র) এদিকেই ইঙ্গিত করে বলেছেন, খওফ হলো আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মাঝে একটি পর্দা মাত্র। (তবাক্বাতুস সুফিয়্য : ২৩৩, আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৩৭)

তিনি আরও বলেন, যখন অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর হক প্রবল হয় তখন অন্তরে খওফ ও রজার সুযোগ থাকে না। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৩৯)

প্রেমিকের অন্তর যদি প্রেমাস্পদকে দেখার সময় বিচ্ছেদের ভয়ে কাঁপতে থাকে, তাহলে দর্শনে ত্রুটি দেখা দেবে। বরং দর্শন সর্বদা অব্যাহত থাকা চাই, যা চূড়ান্ত মাকাম। কিন্তু আমরা এখানে প্রাথমিক স্তর সম্পর্কে আলোচনা করব যাতে ভয়ও থাকে।

খওফও তিনটি বিষয়ের দ্বারা গঠিত; ইলম, হাল ও আমল। ইলম অর্থ সেই সবব বা কারণের জ্ঞান, যা ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। যেমন এক ব্যক্তি অপরাধ করে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল। সে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ডের ভয় করবে। যদিও মাফ পাওয়া ও পালিয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু তার অন্তরে ভয় সে পরিমাণে হবে হত্যার কারণ সম্পর্কে যে পরিমাণ জ্ঞান মজবুত হবে। সে যদি জানে যে, তার অপরাধ গুরুতর কিংবা শাসক খুবই প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ক্ষুব্ধ এবং তার নিজের কাছেও বাঁচার কোনো উপায় নেই, তাহলে নিঃসন্দেহে তার খওফ বা ভয় অধিক জোরদার হবে।

অবশ্য এসব কারণ দুর্বল হলে ভয়ও দুর্বল হবে। কখনো অপরাধ ছাড়াই ভয় হয়ে থাকে। যেমন, আমরা বাঘ, সিংহ ইত্যাদি হিংস্র জন্তুকে ভয় করি। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা কখনো গুনাহের কারণে এবং কখনো তাঁর মারিফাত ও শক্তিমত্তা জানার কারণে হয়ে থাকে। তিনি ইচ্ছা করলে সারা দুনিয়া ধ্বংস করে দিতে পারেন। এতে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। আল্লাহ তাআলা যা করেন, তার কোনো জবাবদিহিতা নেই এবং বান্দাকে তার প্রত্যেকটি কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এসকল বিষয় মানুষ যত অধিক জানবে, তার ভয়ও তত বেশি হবে। এ থেকে বোঝা যায়, আল্লাহকে সে-ই বেশি ভয় করবে, যে নিজেকে বেশি জানবে। এজন্যই রাসূলে কারীম (স) বলেন, إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ আমি তোমাদের তুলনায় আল্লাহকে ভয় বেশি করি। (সহিহ বুখারী : ৫০৬৩)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির : ২৮)

এ জ্ঞান পূর্ণ হলে তা ভয় ও অন্তর্জ্বালার কারণ হয়। এরপর এর প্রভাব অন্তর হতে দেহে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সংক্রমিত হয়। ফলে দেহ দুর্বল ও বিবর্ণ হয়ে যায়। মানুষ আহাজারি করে কান্নাকাটি করে এবং কখনো জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং আনুগত্যের কাজে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে অতীতের কাফফারা এবং ভবিষ্যতে অধিক

কর্মক্ষমতা হাসিল হয়। এ জন্যই বলা হয়, সে ব্যক্তি ভীত নয়, যে কিছুক্ষণ কান্নাকাটি করে চোখ মুছে ফেলে। বরং ভীত তাকেই বলা হবে, যে ভয়ের কাজ বর্জন করে। (আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলমি : ৩৬)

আবুল কাসিম হাকীম (র) বলেন, যে লোক কোনো কিছুকে ভয় করে, সে তা থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ায়। কিন্তু যে আল্লাহকে ভয় করে, সে তাঁর দিকেই ছুটে যায়। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৩৬)

যুন্নুন মিসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হল, বান্দা কখন ভীত হয়? তিনি বললেন, বান্দা যখন নিজেকে রোগী মনে করে। কেননা, রোগী রোগ বৃদ্ধির ভয়ে আরও সতর্কতা অবলম্বন করে। (প্রাগুক্ত)

খওফের এক বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে প্রবৃত্তির শিকড় উপড়ে যায় এবং যাবতীয় আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হয়। ফলে, যে গুনাহপ্রিয় ছিল, তা অপ্রিয় হয়ে যায়। যেমন, মধুপানে আগ্রহী ব্যক্তি যখন শুনতে পায় যে, মধুতে বিষ আছে, তখন ভয়ে আগ্রহ দূর হয়ে যায়। ভয়ে যাবতীয় প্রবৃত্তিও এমনিভাবে দূর হয়ে যায়। অন্তরে বিনয়, নম্রতা ও অসহায়ত্ব সৃষ্টি হয়। অহংকার, হিংসা ও বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। আল্লাহর চিন্তা, আত্মজিজ্ঞাসা ও সাধনা ব্যতীত অন্য কোনো কাজ থাকে না। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের মধ্যে কিছু লোকের অবস্থা তদ্রূপ ছিল। আল্লাহর মহিমা, গুণাবলি, ক্রিয়াকর্ম এবং নিজের ভুলত্রুটির মারেফাত শক্তিশালী হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর ধ্যান, আত্মজিজ্ঞাসা ও সাধনা ততটুকুই মজবুত ও শক্তিশালী হয়, যতটুকু ভয় মজবুত হয়।

খওফের প্রভাব প্রকাশ পাওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে শরিয়তের হারাম বিষয়সমূহ থেকে দূরে থাকা। যেসব বিষয় নিশ্চিতরূপে হারাম নয় কিন্তু হারাম হওয়ার ব্যাপারে সংশয় রয়েছে, সেগুলো থেকেও বিরত থাকা, এ স্তরের মধ্যে গণ্য। এ স্তরের নাম 'তাকওয়া'। কেউ যদি শুধু প্রয়োজনীয় জিনিস ব্যবহার করে এবং অপ্রয়োজনীয় জিনিস ত্যাগ করে; যেমন— যে লোক ঘরে থাকে না, ঘর নির্মাণও করে না, যে জিনিস খাওয়ার উপযোগী নয় তা সঞ্চয় করে না এবং ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি ফিরেও তাকায় না, এ স্তরকে বলা হয় 'সিদক' এবং এ ধরনের ব্যক্তিকে 'সিদ্দীক' বলা যেতে পারে।

কোনো কোনো কাজ থেকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিরত রাখা এবং কোনো কোনো কাজে তৎপর হওয়ার মাধ্যমেও খওফের প্রভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে বিশেষ কর্ম থেকে বিরত থাকাকে শরিয়তে বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন, কামপ্রবৃত্তি থেকে দূরে থাকাকে বলা হয় 'ইফফাত'। এর ঊর্ধ্ব স্তরের নাম 'অরা', যা প্রত্যেক নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকাকে বলা হয়। এর উপরস্থ স্তর হচ্ছে 'তাকওয়া', যা নিষিদ্ধ ও সংশয়পূর্ণ উভয় প্রকার বিষয় থেকে বিরত থাকার নাম। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে 'সিদক ও কুরব'। এসকল স্তর যেহেতু একটি অপরটির ঊর্ধ্বে, তাই সর্বোচ্চ স্তরে নিচের সবগুলো স্তরই শামিল থাকে। সুতরাং এগুলোর শাব্দিক নাম স্বতন্ত্র হলেও অর্থ স্বতন্ত্র নয়।

## খওফের স্তর

খওফ বা ভয় একটি উত্তম বিষয়। সুতরাং কেউ ভাবতে পারে যে, এটি যত শক্তিশালী ও বেশি হবে, ততই মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। মূলত খওফ বা ভয় আল্লাহর চাবুক বিশেষ, যা দ্বারা তিনি বান্দাকে ইলম ও আমলের দিকে তাড়িয়ে নেন, যাতে সে নৈকট্যের স্তর লাভ করতে সক্ষম হয়।

প্রসঙ্গত খওফের কম-বেশি মাত্রা রয়েছে। তন্মধ্যে মধ্যবর্তী মাত্রাই উৎকৃষ্ট। কম মাত্রার খওফকে মহিলাদের ক্রন্দনের মতো মনে করা উচিত। তারা যখন কোনো কুরআনের আয়াত শুনে কিংবা অন্য কোনো ভয়াবহ বিষয়ের মুখোমুখি হয়, তখন ভয়ে কান্না শুরু করে এবং অশ্রু প্রবাহিত করে। কিন্তু যখনই ভয়ের বিষয়টি দৃষ্টি থেকে চলে যায়, তখনই মন আগের মত গাফেল হয়ে পড়ে। এ ধরনের ভয় মধ্যবর্তী মাত্রার চেয়ে কম এবং এর উপকারিতাও অল্প। এর উদাহরণ হলো হিংস্র প্রাণীকে গাছের নরম ও দুর্বল ডাল দ্বারা প্রহার করার মতো। এতে সে ব্যাথাও পায় না এবং তার কোনো উপকারও হয় না।

আরেফ তথা তত্ত্বজ্ঞানী সাধক ও আলেমগণ ব্যতীত সকল মানুষের ভয় এমনি ধরনের। এক্ষেত্রে আলেম অর্থ তারা নয়, যারা আলেমদের পোশাক পরে নামকা ওয়াস্তে পন্ডিত হয়। বরং আলেম বলে আমাদের উদ্দেশ্য তারা, যারা আল্লাহ তাআলা, তাঁর নিয়ামাতসমূহ এবং তাঁর কাজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। এ দিক লক্ষ্য করে হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (র) বলেন,

তোমাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর? তখন চুপ থেকো। কেননা যদি বলো, ভয় করি না তাহলে কুফরি করলে আর যদি বলো, ভয় করি তবে মিথ্যুক বলে গণ্য হবে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৬)

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খওফ তাই, যা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং ইবাদত ও আনুগত্যের পথে চালায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ভয়ের এ প্রভাব ফুটে না উঠা পর্যন্ত তাকে ভয় না বলে ভয়ের কল্পনা বলাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।

মধ্যবর্তী সীমার অধিক খওফ হচ্ছে, খওফ করতে করতে নৈরাশ্যের অন্ধকারে নিপতিত হওয়া। এটাও নিষিদ্ধ। কেননা, এটা আমলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

এখানে খওফ বা ভয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেত্রাঘাতের ভয়। এ ভয় আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। যদি ভয়ের কারণে আমল ছেড়ে দেয়, এভয়ের কী লাভ? বরং এটা তো ক্ষতিকর। মূর্খতা এবং অক্ষমতা থেকে এ ভয় জন্ম নেয়। মূর্খতা হলো, কোনো কাজের পরিণতি না জানা। জানা হলে নিরাশ না হয়ে ভয় করতো। কেননা ভয়ের বিষয়টি অজ্ঞতার দরুন ধোঁয়াশাপূর্ণ থাকে। আর অক্ষমতা হলো এমন কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়া, ব্যক্তি যা প্রতিহত করতে অক্ষম। মোটকথা মানুষের অসম্পূর্ণতা সামনে রাখা হলে এ জাতীয় ভয় প্রশংসনীয়। বলতে পারেন, এ ভয় হওয়ার চেয়ে না হওয়াই উত্তম। একমাত্র প্রশংসার যোগ্য হলো, ইলম, কুদরত ইত্যাদি গুণাবলি। এসব গুণাবলি দ্বারা আল্লাহ তাআলার গুণ বর্ণনা করা যায়। যা দ্বারা আল্লাহ তাআলার গুণ বর্ণনা করা যায় না তা প্রশংসাযোগ্য নয়। সুতরাং ভীষণ ভয়ে আমল না করার চেয়ে বেতের ভয়ে আমল করার ভয় প্রশংসনীয়। যেমন মৃত্যুর চেয়ে ওষুধ খেয়ে ব্যথা দমানোর ক্ষতি সহ্য করা প্রশংসনীয়।

মোটকথা, যে খওফ নৈরাশ্য সৃষ্টি করে, তা নিন্দনীয়। খওফ কখনো রোগ, দুর্বলতা, সংজ্ঞাহীনতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি এমনকি মৃত্যুরও কারণ হয়ে যায়। এধরনের খওফও নিন্দনীয়। যেমন শিশুকে এমন প্রহার করা যার দরুণ শিশুর মৃত্যু ঘটে। কিংবা পশুকে প্রহার করে মেরে ফেলা বা কোনো অঙ্গহানী ঘটানো। রাসূলুল্লাহ (স) রজার উপায়-উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বর্ণনা করেছেন, এর উদ্দেশ্য মাত্রাতিরিক্ত খওফের প্রতিকার করা।

## খওফের উপকার

সতর্কতা, খোদাভীতি, তাকওয়া, সাধনা, ইবাদত, ফিকির, যিকির এবং আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্য লাভের সব উপায় লাভ। প্রতিটি বিষয় সুস্থ দেহ ও সুস্থ মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল। যে ভয় এসব উপায়ের মধ্যে বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে তাই নিন্দনীয়।

প্রশ্ন হতে পারে, কেউ যদি আল্লাহকে ভয় করে এবং ভয়ের কারণে মারা যায় তাহলে সে শহিদ হয়। এমন ব্যক্তির হাল কীরূপে নিন্দনীয় হতে পারে?

জবাব, এই ব্যক্তিকে শহিদ বলার অর্থ হলো, ভয়ের কারণে মৃত্যুবরণ করায় সে এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, ভয়ের কারণ ছাড়া মৃত্যু হলে সে এমন স্তরে পৌঁছতো না। এ হিসেবে তার শহিদী মর্যাদা তৈরি হয়েছে। ধরে নিন, যদি সে জীবিত থাকতো এবং দীর্ঘ হায়াত পেয়ো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করত, আধ্যাত্মিক সাধনা করে সাধকদের স্তরে উন্নীত হত তাহলে তার একটি শহিদের স্তর কেন অসংখ্য শহিদের স্তর লাভ হতো। এমনটা না হলে, একজন শিশু মৃত্যুবরণ করলে কিংবা একটা পাগল হিংস্র প্রাণীর আক্রমণে মারা গেলে তাদের মর্যাদা একজন নবী কিংবা একজন অলী থেকে বেশি হবে যিনি হঠাৎ মারা গেছেন। এটা অসম্ভব, এমনটা কখনোই হতে পারে না। সুতরাং ভয়ে মরে যাওয়া উচিত এমন ধারণা করা কখনোই কাম্য নয়। বরং আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে জীবন কাটিয়ে দেওয়ার মধ্যেই রয়েছে বিরাট সৌভাগ্য। যে ভয় জীবন, বিবেক-বুদ্ধি কিংবা সুস্থতা বিনষ্ট করে জীবনকে স্থবির করে তোলে তা এক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর। (কারণ দ্রুত চলে যাওয়ায় তার নেকির খাতা সমৃদ্ধ হয়নি।) আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে ফযিলতপূর্ণ। যেমন শাহাদাত লাভ করা এর নিচের স্তরসমূহের ওপর মর্যাদাপূর্ণ। তবে নবীগণ এবং সিদ্দীকদের স্তরের তুলনায় শাহাদাত নিম্নস্তরের। সারকথার, খওফ বা ভয় আমলের মধ্যে ক্রিয়া সৃষ্টি না করলে ভয় থাকা না থাকা বরাবর। যেমন, পশুকে মারলেও নড়ে না; দাঁড়িয়ে থাকে।

খওফের কারণে আমলের মধ্যে ক্রিয়া সৃষ্টি হলে, ক্রিয়ার প্রকাশ হিসেবে স্তর নির্ণিত হবে। খওফের কারণে রিপুর তাড়না হতে বেঁচে থাকলে শুধু ইফফতের স্তর হবে। এর উর্ধ্বের স্তর হবে 'অরা' সর্বোচ্চ স্তর হলো সিদ্দিকদের দরজা। এ স্তরে উন্নীত মানুষের ভেতর বাহির সব আল্লাহর

জন্য হয়ে যায়। এটা সুপ্রশংসিত স্তর। এ স্তরে স্বাস্থ্য ও বোধবুদ্ধি সুস্থির থাকে। খওফের কারণে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে সেটা অসুস্থতা। যার চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে। যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ভয়ের এ স্তরটি প্রশংসনীয়। আশার বাণী শুনিয়ে তার খওফ দূর করতে হবে। এজন্য দেখা যায়, সাহল তসতরী (র)-এর মুরিদরা একাধারে কয়েক দিন অনাহারে থাকলে তিনি তাদের বলতেন, দেখো, ক্ষুধার কারণে তোমাদের মস্তিষ্কে যেন বিকৃতি না ঘটে। তোমরা তোমাদের মেধা ঠিক রাখ। কারণ আল্লাহর কোনো অলী বিকৃত মস্তিষ্কের ছিলেন না। (কূতুল কুলুব : ১ : ২৩৮)

## ভয়ের প্রকার এবং উপায়সমূহ

উল্লেখ্য, কোনো খারাপ কিছুর অপেক্ষার কারণে ভয়ের সৃষ্টি হয়। আর খারাপ বস্তু দুধরণের হয়ে থাকে। ১. সত্তাগতভাবেই খারাপ। যেমন আগুন, জাহান্নাম। ২. যা নিজে খারাপ এবং অন্য খারাপ বিষয়ের দিকে টেনে নেয়। যেমন গুনাহ এ হিসেবে খারাপ যে, তা আখেরাতের মন্দ পরিণতির দিকে টেনে নেয়। রুগ্ন ব্যক্তি রোগের প্রকোপ বাড়িয়ে দেয় এ জাতীয় ফল থেকে বেঁচে থাকে।

অতএব প্রত্যেক ভীতু ব্যক্তির ভয় উপর্যুক্ত দুটি প্রকারের কোনো এক প্রকার হবে, এবং তার অন্তরে ভয়ের প্রতীক্ষা বাড়তে থাকবে। এক পর্যায়ে বিপদের চিন্তা করে অন্তর জ্বলতে থাকবে।

খায়েফ তথা আল্লাহর ভয়ে ভীরুলোকদের অবস্থান খারাপ বিষয়ের ভয় অন্তরে প্রভাব বিস্তারের অনুপাতে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। প্রথম দল যাদের অন্তরে এমন বস্তু প্রভাব বিস্তার করে যা সত্তাগতভাবে খারাপ নয়। বরং অন্য কোনো বস্তুর কারণে খারাপ হয়। উদাহরণত, কারও উপর তাওবা ভঙ্গ এবং চুক্তি ভঙ্গ, কিংবা আল্লাহর হক আদায় করতে গিয়ে শক্তি কমে যাওয়ার কিংবা অন্তরের নম্রতা চলে গিয়ে কঠোর হয়ে যাওয়ার কিংবা সত্যচ্যুত হওয়ার বা প্রবৃত্তির অনুগামী হওয়ার আশঙ্কা প্রবল হয়। যে নেককাজের ওপর আমরা ভরসা করি এবং যার দ্বারা মানুষের মাঝে সম্মান লাভ করি আল্লাহ তাআলা আমাদের তার উপর নির্ভরশীল করে দেওয়ার আশঙ্কা প্রবল হওয়া। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের প্রাচুর্য পেয়ে অহংকারী হয়ে যাওয়ার কিংবা আল্লাহ ছাড়া গাইরুল্লাহর প্রতি ঝুঁকে

যাওয়ার ভয়, কিংবা ধীরে ধীরে নিয়ামত লাভ করার সুযোগের ভয়, আনুগত্যের মাঝে যে ধোঁকা ও ছলচাতুরী রয়েছে তা আল্লাহর সামনে প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার ভয়, মানুষের গীবত, খেয়ানত, প্রতারণা ও চোগলখোরীর শাস্তির ভয়, ভবিষ্যত জীবনে অনাহূত বিপদের ভয়, দুনিয়াতে শাস্তি তড়ান্বিত হওয়ার এবং মৃত্যুর পূর্বে লাঞ্ছিত হওয়ার ভয়। দুনিয়ার চাকচিক্য দেখে প্রতারিত হওয়ার ভয়, নিজের ভেতরের উদাসীনতা ও গাফলতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার অবগত হওয়ার ভয়, মৃত্যুর সময় মন্দ পরিণতির ভয়, পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের পরিণতির ভয়। আরেফ তথা আল্লাহওয়ালাগণ এসব ভয়ে ভীত থাকেন। প্রত্যেক প্রকারের ভয়ের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। অর্থাৎ, যে বিষয়ে ভয় হয় মানুষ তা থেকে বেঁচে থাকে।

যেমন, যে ব্যক্তি কোনো বদঅভ্যাসের ভয় করে সে তা ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা তার অন্তরের গাফলতি সম্পর্কে জেনে যাওয়ার ভয় করে সে অন্তর পরিচ্ছন্ন রাখার চিন্তা করে এবং একে ওয়াসওয়াসা থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে সচেতন থাকে।

মুত্তাকিগণ শেষ পরিণতি নিয়ে সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত থাকেন। শেষ পরিণতি ভয়ের সবচেয়ে বড় প্রকার এবং এর মাধ্যমে মারেফাতের পূর্ণতা এবং ভাগ্যের ফলাফল নির্মিত হয়। অর্থাৎ, লওহে মাহফুজে যা লিপিবদ্ধ ছিল খাতেমা তথা অন্তিম মুহূর্তে তা প্রকাশিত হয়।

খাতেমা এবং তাকদীরের পূর্ব নির্ধারিত ফয়সালার ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত হলো, বাদশাহ দুব্যক্তির ব্যাপারে ফরমান জারি করেছে। হতে পারে এ ফরমানে উভয়ের কল্যাণের ফায়সালা হয়েছে, কিংবা উভয়ের শাস্তির ফায়সালা হয়েছে। দণ্ডিত ব্যক্তিদ্বয়ের কেউই জানে না ফরমানে কী নির্দেশ রয়েছে। শুধু এতটুকু জানে যে, তাদের ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে গেছে। এদের একজন ভাবছে, বাদশাহ ফরমান জারি করার সময় না জানি কোন অবস্থায় ছিলেন, তিনি খোশমেযাজে ছিলেন না ক্ষুব্ধ ছিলেন। ফরমান লেখানোর সময় তার মনে দয়ার উদ্রেক হয়েছিল কিনা? আরেকজন ভাবছে, কখন ফরমান আসবে? কখন সেটা খুলে পড়ব? এই লোক কেবল ফরমান নিয়েই চিন্তিত। কিন্তু প্রথমজন সে ফরমানের কারণের পাশাপাশি বাদশাহর মনের অবস্থা নিয়েও চিন্তিত। স্বাভাবিকভাবেই প্রথমজন

দ্বিতীয়জনের তুলনায় অনেক দূরদর্শী। তদ্রুপ যারা লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত তাকদীর নিয়ে শঙ্কিত তারা তাদের তুলনায় যারা শুধুমাত্র অন্তিম মুহূর্তের পরিণতি নিয়ে শঙ্কিত। একটি বর্ণনা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

একবার নবীজি (স) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন। একপর্যায়ে তিনি ডান হাত মুষ্ঠিবন্ধ করে বললেন,

هٰذَا كِتَابُ اللهِ، كُتِبَ فِيْهِ أَهْلُ الْجَنَّةِ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، لَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ.

এটা হলো আল্লাহ তাআলার কিতাব। এতে জান্নাতবাসী এবং তাদের পিতাদের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে কোনো একটি নাম বাড়বেও না এবং কমবেও না।

অতঃপর তিনি বাম হাত মুষ্ঠিবন্ধ করে বলেন,

هٰذَا كِتَابُ اللهِ، كُتِبَ فِيْهِ أَهْلُ النَّارِ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ، لَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ.

এটা হলো আল্লাহ তাআলার কিতাব এতে জাহান্নামবাসী এবং তাদের পিতাদের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে কোনো একটি নাম বাড়বেও না এবং কমবেও না। সৌভাগ্যবানরা দুর্ভাগাদের আমল সম্পর্কে জানতে পারবে। এমনকি তাদের বলা হবে, এরা তাদের মতোই ছিলো, বরং দুর্ভাগাই ছিল। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে যদিও তা এক মুহূর্ত আল্লাহ তাদের উদ্ধার করেছেন (সৌভাগ্যশীল করেছেন)। আর হতভাগারাও সৌভাগ্যবানদের আমল সম্পর্কে জানবে। তাদের বলা হবে, এরাও তাদের মতো ছিল। বরং সৌভাগ্যবান নেককার ছিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে যদিও তা এক মুহূর্ত আল্লাহ তাআলা তাদের নেককারদের দল হতে বের করে দিয়েছেন। অতঃপর নবীজি (স) বলেন,

اَلسَّعِيْدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللهِ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللهِ، وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْمِ.

সৌভাগ্যবান তো সে-ই আল্লাহ তাআলার ফায়সালায় যার নাম সৌভাগ্যবানদের তালিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর দুর্ভাগা তো সে-ই যার

নাম আল্লাহর ফায়সালায় দুর্ভাগাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর আমল (কবুল হওয়া না হওয়া) অন্তিম পরিণতির উপর নির্ভরশীল। (জামে তিরমিযি : ২১৪১)

খাতেমা এবং পূর্ব নির্ধারিত তকদীরের ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের জন্য আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো দুব্যক্তি, যাদের একজন আপন গুনাহের ভয়ে ভীত আর আরেকজন আল্লাহর ভয়ে ভীত। কারণ সে আল্লাহর মহান গুণাবলির পরিচয় জানে, তাঁর ওই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবগত যা ভয়ের সঞ্চার করে। প্রকাশ থাকে এ ব্যক্তির স্তর অনেক উঁচু। এ জন্য তার খওফ বা ভয় সদা বিরাজমান থাকে। যদি সে নেক কাজে লেগে থাকে তাহলে ধোঁকা প্রতারণা হতে বেঁচে থাকতে পারে।

পক্ষান্তরে নেককার লোকেরা গুনাহকে ভয় করে চলে। কিন্তু একত্ববাদে পূর্ণবিশ্বাসী ও সিদ্দীকগণ আল্লাহকে ভয় করেন। এ ভয় হলো আল্লাহর মারেফাতের ফলাফল। যে ব্যক্তি আল্লাহর মারেফাত লাভ করেছে এবং তাঁর সিফাতের ইলম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, নিঃসন্দেহে ভয়ের দাবী হিসেবে আল্লাহ তাআলার বৈশিষ্টাবলির ইলম তার অর্জিত হয়। তবে শর্ত হলো এ ব্যক্তি হতে কোনো গুনাহ না হতে হবে। বরং আমরা তো বলি কোনো গুনাহগার যদি আল্লাহর মারেফত লাভ করে তাহলে সে গুনাহ না বরং আল্লাহকে ভয় করে।

আল্লাহর ভয়ই প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদি আল্লাহ তাআলার সত্তাকে ভয় করা উদ্দেশ্য না হতো তাহলে তিনি স্বীয় বান্দাদের গুনাহের এক্তিয়ার দিতেন না এবং তাদের জন্য গুনাহের পথও সহজ করে দিতেন না। গুনাহের উপকরণও প্রস্তুত করে দিতেন না। কেননা গুনাহের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেওয়ার অর্থ হলো আপন রহমত হতে দূরে সরিয়ে দেওয়া। অতপর প্রথম গুনাহ করার পূর্বে বান্দার পক্ষ হতে এমন কোনো গুনাহ সংঘটিত হয় না যদ্দরুণ বান্দাকে গুনাহগার সাব্যস্ত করা যায়। এমনিভাবে প্রথম নেক আমলের পূর্বে বান্দার নিকট কোনো নেক আমল ছিল না যদ্দরুন তাকে নেককার সাব্যস্ত করা যাবে। এসব আল্লাহ তাআলার ফায়সালার নিগূঢ় রহস্য। পাপীর ওপর পাপের ফায়সালা হয়েছে। চাই এ ফায়সালা সে মেনে নিক বা না নিক। তদ্রুপ নেককার বান্দার তাকদীরে নেক আমল লিখে দেওয়া হয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে

কোনো মাধ্যম ছাড়াই তাঁকে মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন করা হয়েছে। আর আবু জাহেলের জন্মের পূর্বেই কোনো অপরাধ ছাড়াই তাকে সর্বনিকৃষ্ট স্তরে রাখা হয়েছে।

যখন কোনো বান্দা নেক কাজ করে তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তাকে নেক কাজের ইচ্ছা ও ক্ষমতা দান করা হয়। ইচ্ছা ও ক্ষমতা একত্র হওয়ার পর বান্দার দিক থেকে নেক কাজটি সংঘটিত হওয়া অপরিহার্য হয়ে যায়। তেমনি কোনো বান্দা যখন নাফরমানি করে তখন এ জন্যই করে যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে ইচ্ছা ও ক্ষমতা দান করা হয়েছে।

আমাদের জানা নেই, এক ব্যক্তিকে কেন নেককাজের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নেককাজের ওপর বাধ্য করা হয়েছে এবং সফলতা ও সৌভাগ্যের জন্য উপযুক্ত বানানো হয়েছে। আরেক ব্যক্তিকে গুনাহের ক্ষমতা দিয়ে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার যোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এসব আল্লাহ তাআলার গোপন হিকমত। আল্লাহ তাআলার হিকমত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে আমারা জানি না কে নাফরমান এবং কে অনুগত বান্দা। কেননা তাকদীরে যে ফায়সালা করা আছে তার উপরই আমার খাতেমা বা মৃত্যু ঘটবে। সুতরাং অজ্ঞতার দাবি এটাই যে, জ্ঞানী শেষ পরিণতি বা খাতেমা নিয়ে সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে। আর তাকদীরের গোপন রহস্য অনুসন্ধান করা এবং এ নিয়ে কথা বলা না জায়েয।

আল্লাহ তাআলার সিফাতে জালাল সম্পর্কে ভয় কেমন হবে একটি উদাহরণের মাধ্যমে তা অনুধাবন করা যায়। শরিয়তের অনুমতি না থাকলে কোনো গবেষক বা দূরদর্শী ব্যক্তির এ ব্যাপারে উদাহরণ পেশ করার দুঃসাহস হতো না। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা দাউদ (আ)-এর কাছে ওহি প্রেরণ করলেন,

يَا دَاوُوْدُ، خِفْنِيْ كَمَا تَخَافُ السَّبُعَ الضَّارِيَ.

হে দাউদ! তুমি আমাকে এমনভাবে ভয় করো, যেমন তুমি কোনো হিংস্র প্রাণীকে ভয় করো।[১] (কূতলু কুলুব : ১ : ২৪১)

---

১ হাফেজ ইরাকী (র) বলেন, এ বর্ণনার কোনো ভিত্তি আমি খুঁজে পাইনি। লেখক সম্ভবত কোনো ইসরাঈলী বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাই তিনি বলেছেন, جاء الخبر (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন :

এ উদাহরণের মাধ্যমে আপন উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে পারবেন, কিন্তু কারণ নির্ণয় করতে পারবেন না। কেননা কারণ নির্ণয় করার অর্থ হলো তাকদীরের ভেদ উদঘাটনের চেষ্টা করা। এটা এমন এক ভেদ যা কেবল তাঁর স্রষ্টাই উদ্‌ঘাটন করবেন।

মোটকথা হিংস্র প্রাণিকে আমরা এ কারণে ভয় করি যে, হিংস্রপ্রাণির স্বভাব হলো মানুষের উপর চড়াও হওয়া। এর জন্য তাকে আমাদের উত্ত্যক্ত করতে হয় না। বরং তার এই স্বভাবই মানুষের মনে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট। প্রাণীটি যখন কারো উপর চড়াও হতে চায়, কারো পরওয়া না করে চড়াও হয়ে বসে। যদি আপনাকে মেরেও ফেলে তবুও তার মনে আপনার প্রতি কোনো দয়া হবে না এবং আপনাকে মারার জন্য সে অনুতপ্তও হবে না। পক্ষান্তরে আপনাকে নাগালে পেয়েও যদি আপনার উপর হামলা না করে আপনাকে ছেড়ে দেয় তাহলে তা এজন্য নয় যে, দয়াবশত আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে। বরং তার দৃষ্টিতে আপনি নিতান্তই মূল্যহীন অচ্ছুতমাত্র। আপনাকে খেতে তার রুচি হয়নি। একটি সিংহ এক হাজার মানুষকে হিংস্রতা নিয়েই হত্যা করে। শিকার নাগালে পেয়ে হত্যা না করা সম্পূর্ণ সিংহের মর্জি। উপর্যুক্ত উদাহরণের এটা একটা উদ্দেশ্য। তবে আল্লাহ তাআলার ভয় সিংহের চেয়ে হাজার গুণ বেশি। তিনি নিজেই ইরশাদ করেন, وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلٰى সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত আল্লাহর জন্য। (সূরা নাহল : ৬০)

যে ব্যক্তি মারেফাত হাসিল করেছে এবং যাহের মুশাহাদা হতে মজবুত দৃঢ় বাতেনি মুশাহাদার ইলম অর্জন করেছে সে হাদিসে কুদসীর সত্যতার ইলম অর্জন করেছে। বর্ণিত হয়েছে,

هٰؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي وَهٰؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي.

এরা জান্নাতবাসী, এতে আমার কোনো পরওয়া নেই। আর এরা জাহান্নামী, এতেও আমার কোনো পরওয়া নেই। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ১৮৬, সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩৩৮)

---

৯ : ২০৭) ইমাম সুয়ূতী কৃত, দুররে মানসূর : ৩ : ২৭০ এসেছে, ইবনুল মুনযির (র) আবু জাফর (র) হতে বর্ণনা করেন, (اَوْحَى اللهُ إِلٰى دَاوُوْدَ... خِفْنِيْ عَلٰى كُلِّ حَالٍ...)

আল্লাহ তাআলার এ অমুখাপেক্ষীতা ও বেনিয়াযির মধ্যে খওফ তথা ভয়ের অসংখ্য উপকরণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহকে ভয় করার জন্য তাঁর এ বেনিয়াযিই যথেষ্ট।

খওফকারীদের দ্বিতীয় শ্রেণিতে রয়েছে ওইসব লোক যারা খারাপ অবস্থার ভয় করে। যেমন মৃত্যুযন্ত্রণার তীব্রতা, কবরে মুনকার নকীরের সাওয়াল-জবাব, কবরের আযাব, পুনরুত্থান, আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়ানোর ভয়। আল্লাহর সামনে পর্দা খুলে যাবে এবং তিনি কমবেশি প্রশ্ন করবেন। কিংবা সূক্ষ্ম পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করার ভয়। জাহান্নামের শৃঙ্খল এবং এর ভয়ংকর ঘাঁটিসমূহের ভয়। কিংবা জান্নাতের চিরস্থায়ী আবাস এবং এর নিয়ামতরাজি হতে বঞ্চিত হওয়ার ভয়, অথবা আল্লাহ এবং তার মাঝে অন্তরাল তৈরি হওয়ার ভয়।

এসব কারণ সত্তাগতভাবেই খারাপ। বরং ভয়ংকর। তবে খওফকারীদের অবস্থাভেদে এর মাঝে ভিন্নতা আসে। সবচেয়ে বড় ভয় হলো বান্দার এবং আল্লাহর মাঝে অন্তরাল তৈরি হওয়ার ভয়। এই ভয় আরেফীন তথা আল্লাহওয়ালাদের ভয়। এ ছাড়া অন্যান্য ভয় যথাক্রমে আবেদ, সালেহ, যাহেদ, এবং সাধারণ জগৎবাসীর ভয়।

প্রভুর সঙ্গে মিলনের স্বাদ এবং প্রভু হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দুঃখ ও যন্ত্রণা একমাত্র সে-ই অনুভব করতে পারবে যে মারেফাতের পূর্ণতা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যার মারেফত পূর্ণ হয়নি তার অন্তর্দৃষ্টির উপর পর্দা পড়ে গেছে। সে প্রভুর সঙ্গে মিলনের স্বাদও অনুভব করে না আবার বিচ্ছেদের যন্ত্রণাও সে ভোগ করে না। এজন্য তার সামনে যখন আলোচনা করা হয় যে, আল্লাহ ওয়ালাগণ দোযখের আগুনকে ভয় করেন না বরং তারা আল্লাহ ও তাদের মাঝে অন্তরালকে ভয় করেন তখন সে বিষয়টি ভেবে হতভম্ব হয়ে যায় এবং বিস্ময় প্রকাশ করে। এ জাতীয় লোকজন কখনো কখনো আল্লাহর দিদারের স্বাদও অস্বীকার করে। শরীয়তভাবে একে অস্বীকারের অবকাশ থাকলে তারা প্রকাশ্যে অস্বীকার করে বসত। কিন্তু শরয়ি নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুখে কিছু না বললেও মনে মনে (দিদারের কথা) স্বীকার করে না। কারণ, সাধারণ মানুষ উদর এবং লজ্জাস্থানের স্বাদ ভোগ করে এবং রংবেরঙের বস্তু ও সুশ্রী চেহারা দর্শন করে আনন্দিত হয়। কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের স্বাদ তারা ভিন্ন অন্য কেউ অনুভব করতে পারে না। তাই

যারা আল্লাহপ্রেমের স্বাদ অনুভবের যোগ্য নয় তাদের সামনে এর হাকীকত বর্ণনা করা নিষেধ। আর যারা যোগ্য তারা নিজেরাই স্বাদ অনুভব করে। বর্ণনা করে তাদের বোঝানোর প্রয়োজন হয় না।

প্রকৃতপক্ষে ভয় যদি আমলে প্রভাব বিস্তার না করে, তাহলে তার থাকা না থাকা এক সমান। আর যদি প্রভাব বিস্তার করে, তাহলে যে পরিমাণ তার প্রভাব প্রতিফলিত হবে, সে পরিমাণই মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। যেমন, যদি ভয়ের কারণে কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকে, তাহলে শুধু ইফফাতের স্তর লাভ হবে। আর যদি ভয় 'অরা' তথা পরহেযগারীর কারণ হয়, তাহলে পূর্বের তুলনায় স্তর কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে সিদ্দীকগণের স্তর। অর্থাৎ, নিজের বাহির ও ভিতরকে আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া এবং তাতে অন্যের কোন অবকাশ না থাকা। ভয়ের এ স্তরটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়। এটা দৈহিক সুস্থতা ও মস্তিষ্কের নিরাপত্তার সঙ্গে হাসিল হতে পারে। যদি ভয় এ স্তরকে অতিক্রম করে যায় এবং বুদ্ধি ও সুস্থতা নষ্ট করে দেয়, তবে একে রোগ মনে করে আবশ্যিক পর্যায়ে চিকিৎসা করতে হবে। হযরত সহল তস্তরী (র)-এর কিছুসংখ্যক অনুসারী দীর্ঘদিন অনাহার যাপন করতো। তিনি তাদেরকে বলতেন, নিজেদের মস্তিষ্কের হিফাজত করো। কেননা, আল্লাহর অলীদের মধ্যে কেউ ত্রুটিপূর্ণ-মস্তিষ্ক ছিল না।

## খওফের ফযিলত ও তার প্রতি উৎসাহ প্রদান

আমরা খওফের ফযিলত প্রথমত যুক্তির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত কুরআন ও হাদিসের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবো। যুক্তির মাধ্যমে এভাবে যে, কোনো বস্তুর ফযিলত ততটুকুই হয়, যতটুকু পরকালীন সৌভাগ্য লাভে সহায়ক হয়। কেননা পরকালীন সৌভাগ্য ব্যতীত মানুষের আর কোন লক্ষ্য নেই। এ সৌভাগ্য হচ্ছে আল্লাহর দিদার ও তাঁর নৈকট্য লাভ। সুতরাং এ সৌভাগ্য হাসিলে যে বস্তু যে পরিমাণে সাহায্য করবে, সে পরিমাণ তার মর্যাদা লাভ হবে। এটা জানা কথা যে, দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসা লাভ করা ছাড়া পরকালে তাঁর দিদারের সৌভাগ্য লাভ সম্ভব নয়। মারেফাত ছাড়া মহব্বত লাভ হয় না এবং মারেফাত লাভের জন্য সার্বক্ষণিক চিন্তাফিকির শর্ত। সার্বক্ষণিক যিকির ফিকির এর জন্য দুনিয়ার

মহব্বত মন থেকে আলাদা করা ব্যতীত লাভ করা যায় না। দুনিয়ার মহব্বত মন থেকে পৃথক করতে হলে দুনিয়াবী আনন্দ ও প্রবৃত্তি বর্জন করতেই হবে। দুনিয়াবী আনন্দ ও প্রবৃত্তি পরিত্যাগ ভয়ের আগুন দ্বারা যতটুকু খওফ হতে পারে, অন্য কোনো কিছুর দ্বারা ততটুকু হতে পারে না। এতে জানা গেল যে, ভয় এমন একটি আগুন, যা দ্বারা প্রবৃত্তি জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। সুতরাং প্রবৃত্তি দূর করা, গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা এবং ইবাদত ও আনুগত্যে উৎসাহিত করা যতটুকু কাম্য হবে, ততটুকুই ভয়ের ফযিলত লাভ হবে। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এটা ভয়ের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী বিভিন্নরূপ হতে পারে।

এ ছাড়া ভয় দ্বারা ইফফাত, আর, তাকওয়া ও মুজাহাদা হাসিল হয়। এ সবগুলোই ফযিলত ও নৈকট্য অর্জনে সহায়ক। সুতরাং যে ভয় এমন উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বিষয়সমূহ হাসিলের কারণ হয়, তার ফযিলত ও শ্রেষ্ঠত্ব অবশ্যই যুক্তিগ্রাহ্য।

ভয়ের ফযিলত সম্পর্কে কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে। আল্লাহ তাআলা হিদায়াত, রহমত, ইলম ও রজা, জান্নাতীদের এ স্তর চতুষ্টয়কে তিনটি আয়াতে ভয়কারীদের জন্য নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। ভয়ের ফযিলতের জন্য এটাই যথেষ্ট। হিদায়াত ও রহমত এ আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে,

هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّلَّذِيْنَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ.

যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য তাতে লিখিত ছিল পথ-নির্দেশ ও রহমত। (সূরা আরাফ : ১৫৪)

ইলম সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির : ২৮)

আরেক আয়াতে ভয়কারীদের জন্যে সন্তুষ্টির কথা উল্লিখিত হয়েছে,

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ، ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ.

আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে। (সূরা বায়্যিনাহ : ৮)

এ ছাড়া ইলমের ফযিলত সম্পর্কে যা কিছু আলোচিত রয়েছে, তা দ্বারা ভয়ের ফযিলতও বোঝা যায়। কেননা ভয় হচ্ছে ইলমের ফল। এ কারণেই হযরত মূসা (আ)-এর হাদিসে বলা হয়েছে যে, খওফকারীরা 'রাফীকে আলার' (মহান সঙ্গীর) সঙ্গ লাভ করবে। এতে অন্য কেউ তাদের সাথে অংশীদার হবে না। এই সঙ্গ বিশেষভাবে তাদের জন্যেই নির্ধারিত হওয়ার কারণ এই যে, সাধারণত আলেমগণ ভীরু হয়ে থাকেন। আলেমরা নবীগণের ওয়ারিস হওয়াতে নবীগণের সোহবত আলেমগণই লাভ করবেন। আর নবীগণ ও তাঁদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মহান আল্লাহর সঙ্গ লাভ করবেন। এ কারণেই ইন্তিকালের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (স)-কে যখন দুনিয়াতে থাকা অথবা আল্লাহ পাকের নিকট চলে যাওয়ার ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয়, তখন তিনি এ কথাই বলতে থাকেন,

اَسْئَلُكَ الرَّفِيقَ الْأَعْلٰى

আমি রফীকে আলা (মহান সঙ্গী)-কে চাই। (সহিহ বুখারী : ৩৬৭০, সহিহ মুসলিম : ২৪৪৪, ২১৯১)

প্রকৃত ভয় সৃষ্টিকারী বিষয়ের দিকে লক্ষ করলে এ হালটি হচ্ছে ইলম এবং ভয়ের পরিণামের প্রতি লক্ষ করলে এটি হচ্ছে 'অরা' ও তাকওয়া। তাকওয়ার ফযিলত সম্পর্কে অনেক কিছু বর্ণিত আছে। এমনকি, 'আকিবাত' তথা শুভ পরিণাম তাকওয়ার জন্যেই নির্ধারিত। যেমন 'হামদ' আল্লাহর জন্যে এবং দরূদ রাসূলুল্লাহ (স) এর জন্য নির্ধারিত। এমনিভাবে শুভ পরিণামও তাকওয়ার একটি বৈশিষ্ট্য। তাই বলা হয়,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। শুভ পরিণাম আল্লাহভীরুদের জন্য এবং দরূদ রাসূলুল্লাহ (স) ও তাঁর বংশধরদের সকলের প্রতি।

তাকওয়াকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় পবিত্র সত্তার জন্যে নির্দিষ্ট করে বলেছেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না সেগুলোর গোশত এবং রক্ত; বরং পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হজ : ৩৭)

তাকওয়ার অর্থ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত : ১৩)

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন,

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اِيَّاكُمْ اَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ.

তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও জোর নির্দেশ দিয়েছি যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। (সূরা নিসা : ১৩১)

আরও বলা হয়েছে,

فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

সুতরাং যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরা তাদের ভয় করো না, কেবল আমাকেই ভয় করো। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৫)

উপর্যুক্ত আয়াতগুলোতে খওফ বা ভয়কে ওয়াজিব করা হয়েছে এবং ঈমানের জন্য শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং কোনো মুমিনকে ভয় থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবা যায় না। প্রত্যেক মুমিনের মধ্যে কমবেশি ভয় অবশ্যই থাকবে। এক্ষেত্রে খওফ ততটুকুই দুর্বল হবে, যতটুকু ঈমানে দুর্বলতা থাকবে।

রাসূলুল্লাহ (স) তাকওয়ার ফযিলত সম্পর্কে বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলকে সমবেত করবেন। তখন এমন আওয়াজে তিনি তাদের ডাক দিবেন যে, দূরতম ব্যক্তিটি তেমন শুনবে যেমন কাছের লোকটি শুনবে। তিনি বলবেন, হে লোকসকল! তোমাদের সৃষ্টির দিন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আমি তোমাদের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনেছি। আজ তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে

শোনো। তোমাদের আমল তোমাদের ফেরত দেওয়া হবে। লোকসকল! আমি একটি সম্পর্ক নির্ধারণ করেছি, আর তোমরা আরেকটি সম্পর্ক নির্ধারণ করেছো। আমার দেওয়া সম্পর্ক বাদ দিয়ে তোমরা নিজেদের সম্পর্ক উন্নত করেছ। আমি বলেছিলাম, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সেই ব্যক্তিই অধিক সম্মানিত যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। (সূরা হুজুরাত : ১৩)

আমার কথা প্রত্যাখ্যান করে তোমরা বলেছ, অমুক বেশি ধনী। আজ আমি তোমাদের সম্পর্ক বাদ দিয়ে, আমার সম্পর্ক উঁচু করব। মুত্তাকিরা কোথায়? তাদের জন্য একটি ঝান্ডা ওঠানো হবে। মুত্তাকি সম্প্রদায় ঝান্ডার পিছু পিছু তাদের গন্তব্য জান্নাতে বিনা হিসাবে প্রবেশ করবে। (আবু হুরায়রা (রা) থেকে মারফূ সূত্রে, মুসতাদরাকে হাকেম : ২ : ৪৬৩, মুজামে তাবারানী : ১ : ২৩০ : ৪৫০৮, কূতুল কুলূব : ১ : ২২৫)

এক হাদিসে আছে—

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللهِ.

প্রজ্ঞার আসল হচ্ছে আল্লাহর ভয়। (আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বায়হাকী শুআবুল ঈমান : ৭৩০, উকবা ইবনে আমের থেকে দালায়িলুন নবুওয়াহ : ৫ : ২৪১, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৫৩৯৩)

আল্লাহর রাসূল (স) হযরত ইবনে মাসঊদ (রা)-কে উদ্দেশ্যে করে বলেন, তুমি যদি আমার সাথে মিলিত হতে চাও, তাহলে আমার পরে আল্লাহকে খুব বেশি ভয় করবে। (তাহযিবুল আসরার : ২২৬)

হযরত ফুজাইল (রা) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সে ভয় তার সামনে সব ধরনের কল্যাণের রাস্তা খুলে দেয়। (প্রাগুক্ত)

হযরত শিবলী (র) বলেন, যখন অমি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি, তখন আমার সামনে হেকমত তথা প্রজ্ঞা ও জ্ঞান লাভের এক অভূতপূর্ব দরজা খুলে যায়, যা আমি কখনো দেখিনি। (তাহযিবুল আসরার : ২২৮)

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুআয (র) বলেন, যে মুমিন কোনো দোষ করে, তার পেছনে দুটি নেকি থাকে। শাস্তির ভয় এবং ক্ষমার আশা। (তাহযিবুল আসরার : ২২৮)

হযরত মুসা (আ)-এর হাদিসে আছে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন ইরশাদ করবেন, প্রত্যেক ব্যক্তিরই হিসাব নেওয়া হবে। তবে যারা পরহেযগার ও খোদাভীরু তাদেরকে হিসাবের জন্য দাঁড় করাতে আমি লজ্জাবোধ করি। যেহেতু, তাদের সম্মান এর চেয়ে ঊর্ধ্বে। (তাবরানী কাবীর : ১২ : ১২০, বাইহাকী শুআবুল ঈমান : ১০০৪৭)

জ্ঞাতব্য, 'অরা' ও 'তাকওয়া' শব্দ দুটির অর্থে ভয়ের শর্ত রয়েছে। খওফ বা ভয় না থাকলে 'অরা' ও 'তাকওয়া' অর্জিত হবে না।

এমনিভাবে ফযিলতের কতিপয় আয়াতকেও আল্লাহ তাআলা খওফের সঙ্গে নির্দিষ্ট করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। (সূরা আলা : ১০)

আরও বলা হয়েছে,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ.

আর যে ব্যক্তি আল্লাহর (সামনে) উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি উদ্যান। (সূরা আর রহমান : ৪৬)

এক হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার ইজ্জতের কসম! আমি আমার বান্দার মধ্যে দুটি ভয় ও দুটি নিরাপত্তা একত্রিত করবো না। যদি সে দুনিয়াতে আমার সম্পর্কে নির্ভীক থাকে তাহলে কিয়ামতে তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করব। আর যদি দুনিয়াতে আমাকে ভয় করে তাহলে কিয়ামতে তাকে নির্ভয় রাখবো। (সহিহ ইবনে হিব্বান : ৬৪০, শুআবুল ঈমান : ৭৫৯)

রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন,

مَنْ خَافَ اللهُ تَعَالٰى خَافَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللهِ خَوَّفَهُ اللهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

অর্থাৎ, যে আল্লাহকে ভয় করে, তাকে সকল জিনিস ভয় করে। আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করে আল্লাহ তাকে সকল বস্তুর ব্যাপারে ভীত করেন। (আবুশ শায়েখ, কিতাবুস সাওয়াব-এ আবু উমামা থেকে দুর্বল সনদে উল্লেখ করেছেন)

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুআয (র) বলেন, অসহায় মানুষ দারিদ্র্যকে যে পরিমাণ ভয় করে, সে পরিমাণ ভয় যদি জাহান্নামের আগুনকে করতো, তবে জান্নাতে প্রবেশের অধিকার পেয়ে যেত। (তারিখে বাগদাদ : ১৪ : ২১৫, আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৩৬)

হযরত যুননুন (র) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তার অন্তর নরম হয়ে যায়। আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা দৃঢ় হয় এবং তার বিবেক পরিপক্ক হয়। (তাহযিবুল আসরার : ২২৯, আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৩৮)

তিনি আরও বলেন, রজার তুলনায় খওফ বেশি হওয়া উচিত। কেননা রজা বেশি হলে অন্তর বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। (তাহযিবুল আসরার : ২২৯)

আবুল হুসাইন (র) বলতেন, সৌভাগ্যের পরিচয় হলো দুর্ভাগ্যকে ভয় করা। কেননা, ভয় হচ্ছে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে একটি লাগামের মতো। যখন তা ছিড়ে যায় তখন বান্দা ধ্বংস হয়ে যায়। (তাহযিবুল আসরার : ২৩০)

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কিয়ামতের দিন সব থেকে নিরাপদ ও নির্ভীক কে থাকবে? তিনি বললেন, ওই ব্যক্তি যে দুনিয়াতে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। (তাহযীবুল আসরার : ২৩১)

সাহল তস্তরী (রা) বলেন, যতদিন তুমি হালাল খাবার গ্রহণ করবে ততদিন আল্লাহর ভয় অনুভব করবে। (তাহযীবুল আসরার : ২৩২)

হাসান বসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবু সাঈদ! ওইসব লোকদের সঙ্গে ওঠাবসাকে আপনি কীরূপ মনে করেন, যারা আমাদের আখেরাতের ভয় দেখায় এমনকি ভয়ে আমাদের অন্তর উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়? হাসান বসরী (র) বলেন, আল্লাহর কসম! এমন লোকদের সঙ্গে তোমার ওঠাবসা করা উত্তম যারা তোমাকে আখেরাতের ভীতি প্রদর্শন করবে অবশেষে তুমি নিরাপত্তা লাভ করবে। ওই লোকদের সঙ্গে ওঠাবসা থেকে যারা তোমাকে অভয় দিবে অবশেষে ভয় তোমাকে পেয়ে বসবে। (যুহদ ইবনুল মোবারক : ৩০৩, প্রশ্নকারী ছিলেন মুগিরা বিন মুখাদেশ)

সুলাইমান দারানী (র) বলেন, যে অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই তা বিরান ঘরের মতো! (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৩৭)

হযরত সাহল তস্তরী (র) বলেন, মানুষ যতক্ষণ হালাল খাদ্য না খাবে, ততক্ষণ খওফ হাসিল হবে না।

আল্লাহ তাআলার শাস্তি থেকে নির্ভীক হওয়া প্রসঙ্গে যে সকল নিন্দা বর্ণিত রয়েছে, সেগুলোও ভয়ের ফযিলত জ্ঞাপন করে। কেননা কোনো বিষয়ের নিন্দা করা হলে মূলত তার বিপরীত বিষয়ের প্রশংসা হয়ে যায়। হতাশার নিন্দা দ্বারা যেমন আশার মর্যাদা জানা যায়, তেমনি ভয়হীনতার নিন্দা দ্বারা ভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায়। বরং আমরা বলি, রজার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোও ভয়ের ফযিলত জ্ঞাপক। কেননা, রজা ও খওফ তথা ভয় ও আশা একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে। কারণ, যে ব্যক্তি কোনো প্রিয় বস্তুর কামনা করে, তা না পাওয়ার ভয়ও তার থাকবে। যদি এ ভয় না থাকে, তাহলে সে বস্তু তার প্রিয় হবে না এবং তার অপেক্ষা করবে না।

মূলত খওফ ও রজা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি অপরটি থেকে পৃথক হতে পারে না। তবে ভয় এবং আশা একটি অপরটির ওপর প্রাধান্য পেতে পারে। আবার অন্তর একটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয় এবং উদাসীনতার দরুণ অন্যটির দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। কারণ ভয় এবং আশা উভয়টি একটি সংশয়পূর্ণ বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। নিশ্চিত বিষয়ে ভয় এবং আশা কোনোটাই থাকে না। মোটকথা কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি অস্তিত্বে আসতে পারে, না-ও আসতে পারে। অস্তিত্বে আসবে মনে করলে মন আনন্দিত হয়ে ওঠে, এর নাম রজা। অস্তিত্বে আসবে না মনে করলে মন ব্যথিত হয়ে যায়, যার নাম খওফ বা ভয়। নিঃসন্দেহে ভয় এবং আশা দুটি পরস্পর বিরোধী বিষয়। কেননা প্রতীক্ষিত বিষয়টি সংশয়পূর্ণ।

তবে কিছু মাধ্যমের উপস্থিতিতে সংশয়পূর্ণ দুটি দিকের একটি অপরটির উপর প্রাধান্য পেতে পারে। তখন এই মাধ্যমকে 'যন' বা ধারণা বলা হবে। যদি ধারণা প্রবল হয় তাহলে রজা শক্তিশালী হবে এবং খওফ হ্রাস পাবে। বিপরীতও হতে পারে।

খওফ ও রজা পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় আল্লাহ তাআলা উভয়টি একসাথে উল্লেখ করেছেন।

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا كَانُوْا.

তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে। (সূরা আম্বিয়া : ৯০)

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا.

তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয়ে ভয়ে ও আশায় আশায়। (সূরা সাজদাহ : ১৬)

কুরআন মাজীদের অনেক স্থানে রজা খওফ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ এরা পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এটা আরবিভাষার একটি রীতি।

ক্রন্দন খওফের ফল বিধায় ক্রন্দনের ফযিলত দ্বারাও খওফের ফযিলত বুঝতে পারা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا.

অতএব তারা সামান্যতম হেসে নিক। এরপর তারা (আখেরাতে) প্রচুর কাঁদবে। (সূরা তাওবা : ৮২)

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে,

وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا.

এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে চিবুকের উপর পতিত হয় এবং এটি (তথা কুরআন) তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি করে। (সূরা বনি ইসরাঈল : ১০৯)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ. وَ تَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ. وَ اَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ. فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَ اعْبُدُوْا.

তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্মিত হচ্ছো! এবং (একে উপহাসের বিষয় বানিয়ে) হাসি-ঠাট্টা করছো! কাঁদছো না! তোমরা তো উদাসীন, সুতরাং আল্লাহকে সিজদা করো এবং তাঁর ইবাদত করো। (সূরা নাজম : ৫৯-৬২)

ক্রন্দনের ফযিলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوعٌ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، ثُمَّ تُصِيبُ شَيْئًا مِنْ حُرِّ وَجْهِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

কোনো ঈমানদার বান্দার চোখ থেকে অল্প পরিমাণ অশ্রুও বের হয়ে গণ্ডদেশে প্রবাহিত হয় যদিও তা মাছির মাথা পরিমাণ হয়, এরপর আল্লাহ তার ওপর দোযখের আগুন হারাম করে দেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১৯৭)

অন্য এক হাদিসে আছে,

إِذَا اقْشَعَرَّ قَلْبَ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ، تَحَاتَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ مِنَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا.

আল্লাহর ভয়ে ঈমানদারের অন্তর যখন কেঁপে উঠে, তখন তার পাপ গাছের পাতার মতো ঝরে পড়ে। (মুসনাদে বাযযার : ১৩২২)

আরও বলা হয়েছে,

لَا يَلِجُ النَّارَ اَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللهِ حَتّٰى يَعُوْدَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কান্নাকাটি করে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত স্তন থেকে বের হওয়া দুধ স্তনে ফিরে না যাবে। (জামে তিরমিযি : ১৬৩৩, সুনানে নাসায়ী : ৬ : ১২)

হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) একদিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তির উপায় কী? তিনি বললেন,

اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখো, ঘর থেকে বের হয়ো না এবং গুনাহর জন্য কান্নাকাটি করো। (জামে তিরমিযি : ২৪০৬)

একদিন হযরত আয়েশা (রা) আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উম্মতের কেউ কি বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, نَعَمْ مَنْ ذَكَرَ ذُنُوْبَهُ فَبَكٰى যে ব্যক্তি নিজের গুনাহ স্মরণ করে কাঁদবে, সে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২১৪)

এক হাদিসে আছে,

مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ، قَطْرَةٌ مِنْ دُمُوعٍ فِي خَشْيَةِ اللهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

আল্লাহ তাআলার কাছে দুটি ফোঁটার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো ফোঁটা নেই। একটি চোখের পানির ফোঁটা, যা আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত হয় এবং অপরটি রক্তের ফোঁটা, যা আল্লাহর পথে প্রবাহিত হয়। (জামে তিরমিযী : ১৬৬৯)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِي عَيْنَيْنِ هَطَّالَتَيْنِ تَشْفِيَانِ الْقَلْبَ بِذُرُوْفِ الدَّمْعِ مِنْ خَشْيَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَصِيْرَا الدُّمُوْعُ دَمًا وَالْأَضْرَاسُ جَمْرًا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে দুটি ক্রন্দনকারী চক্ষু দান করুন, যা অশ্রু বিসর্জন করে অন্তরে শান্তি দিবে সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন অশ্রু রক্ত হয়ে যাবে এবং চোয়াল হয়ে যাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। (তাবারানি, মুজামুল আওসাত : ১৪৫৭, হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ১৭৬)

আল্লাহর রাসূল (স) বলেন,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ : وَذَكَرَ مِنْهُمْ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ.

আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন সাত ব্যক্তিকে আরশের ছায়ার মধ্যে রাখবেন, যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে একজন হবে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে স্মরণ করে নির্জনে কান্নাকাটি করে। (সহিহ বুখারী : ৬৬০, সহিহ মুসলিম : ১০৩১)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলেন, যে ব্যক্তি কাঁদতে পারে, সে কান্নাকাটি করুক এবং যে পারে না, সে কান্নার ভান করুক। (যুহদ, ইবনুল মুবারক : ১৩১, বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ৭৮৫)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র) যখন কান্নাকাটি করতেন তখন চোখের পানি মুখমণ্ডলে এবং দাঁড়িতে মুছে নিয়ে বলতেন, আমি জানতে পেরেছি, যে স্থানে চোখের পানি লাগবে সেখানে জাহান্নামের আগুন পৌঁছবে না। (আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলমি ৭১, তারিখে দিমাশক : ৫০ : ৫৬)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (র) বলেন, তোমরা জাহান্নামের ভয়ে কাঁদো, কান্না না আসলে কান্নার ভান করো, ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ। তোমাদের কেউ যদি পরকালের (শাস্তির) কথা জানতো, তাহলে সে চিৎকার করে করে গলা ভেঙ্গে ফেলতো এবং নামায পড়তে পড়তে কোমরের হাড় ভেঙ্গে ফেলতো। (মুস্তাদরাকে হাকেম : ৪ : ৫৭৮)

হযরত আবু সুলায়মান দারানী (র) বলেন, যার চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রুতে টগবগ করবে, কিয়ামতের দিন তার চেহারায় দুশ্চিন্তা ও অপমানের ছাপ থাকবে না। যদি সে অশ্রু প্রবাহিত করে তাহলে তার অশ্রুর প্রথম ফোঁটা কয়েক সমুদ্র পরিমাণ জাহান্নামের আগুনের জন্য যথেষ্ট হবে। সে যদি লোকদের জামাতে ক্রন্দন করে তাহলে উক্ত জামাতকে শাস্তি দেওয়া হবে না। (ইহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২১৫)

কাব আহবার (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে গণ্ডদেশে অশ্রু প্রবহিত করা আমার নিকট একটি স্বর্ণের পাহাড় দান করার চেয়েও উত্তম। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৩৬৬৯৩, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ৩৬৬)

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আল্লাহর ভয়ে আমার চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া আমার কাছে হাজার দিনার দান করার চেয়েও উত্তম। (বায়হাকী শুআবুল ঈমান : ৮১৬)

হযরত হানযালা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমরা আল্লাহর রাসূল (স) এর দরবারে হাজির ছিলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ওয়ায করলেন, আমাদের অন্তর বিগলিত হয়ে গেল এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর আমি যখন বাড়ি গিয়ে পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হলাম এবং সাংসারিক কথাবার্তায় ব্যস্ত হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে আমার যে অবস্থা ছিল তা মন থেকে উধাও হয়ে গেল এবং আমি দুনিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম। এরপর বিষয়টি আবার মনে পড়ল। তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, আমি মুনাফিক হয়ে গেছি। কেননা, যে খওফ ও নম্রতা আমার মধ্যে ছিল, তা এখন আর নেই। এই চিন্তা মনে আসতেই আমি ঘর থেকে বের হয়ে পড়লাম এবং চিৎকার করে বলতে লাগলাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। ইত্যবসরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, হানযালা কিছুতেই মুনাফিক হয়নি। এরপর আমি নবী কারীম (স)-এর সম্মুখে একথা বলতে বলতে হাজির হলে তিনি ইরশাদ করলেন, তুমি মোটেই মুনাফিক হওনি। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার নিকট ছিলাম। আপনি ওয়ায করলেন। এতে আমার অন্তর বিগলিত হলো এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হলো। আমরা নিজেদের

সম্পর্কে জানতে পারলাম। অতঃপর বাড়ি ফিরে পার্থিব কাজে মশগুল হওয়ার পর তা সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন, হে হানযালা! এখন তুমি ভয়ের যে স্তরে অবস্থান করছ, যদি তা সবসময় থাকে, তাহলে ফেরেশতারা তোমার সাথে পথিমধ্যে এবং শয্যায় মুসাফাহা করবে। তবে সকল বিষয়েরই একটা সময় আছে। (কাছাকাছি শব্দে, সহিহ মুসলিম : ২৭৫০)

মোটকথা, রজা বা আশার ও কান্নার ফযিলত সম্পর্কে যেসব বিষয় বর্ণিত আছে, তাতে খওফ ও ভয়ের ফযিলতও বোঝা যায়। কারণ, এগুলো খওফের সাথে সম্পৃক্ত। কোনো কোনো বিষয় খওফের কারণ এবং কোনো কোনো বিষয়ের কারণ স্বয়ং খওফ।

## ভয় ও আশার প্রাবল্যের মধ্যে কোনটি শ্রেয়

খওফ ও রজার ফযিলত সম্পর্কে অনেক বর্ণনা রয়েছে। তাই পাঠকের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় যে, এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ? খওফ না রজা? মূলত এ প্রশ্ন করা অর্থহীন। এটা এমন, যেমন কেউ প্রশ্ন করে যে, রুটি শ্রেষ্ঠ না পানি? এর উত্তর এটাই হবে যে, ক্ষুধার্তের জন্য রুটি উত্তম এবং তৃষ্ণার্তের জন্য পানি উত্তম। যদি কারও ক্ষুধা ও পিপাসা দুটিই হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে যেটি প্রবল হবে সেটিই নিতে হবে। অর্থাৎ, ক্ষুধা প্রবল হলে রুটি শ্রেষ্ঠ হবে এবং তৃষ্ণা প্রবল হলে পানি। উভয়টি এক হলে রুটি ও পানি এক হবে।

রজা ও খওফ অন্তরের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ওষুধ বিশেষ। তাই এদের ফযিলত এ পরিমাণই হবে, অন্তরে যে পরিমাণ রোগ থাকবে। যদি অন্তরে আল্লাহর শাস্তি থেকে নির্ভয় হওয়ার রোগ থাকে, তাহলে খওফ তার জন্য উত্তম। আর যদি অন্তরে হতাশার আধিক্য থাকে, তাহলে রজা উত্তম। অনুরূপ যদি কারও পাপের মাত্রা বেশি থাকে, তাহলে ভয়ই উত্তম। এমনও বলা যায় যে, খওফ সর্বাবস্থায় উত্তম। কেননা, গুনাহ ও গোমরাহের রোগ মানুষের মধ্যে অনেক বেশি। হ্যাঁ, ভয় ও আশার উৎসের দিকে তাকালে রজা উত্তম। কেননা, আশার উৎস হচ্ছে রহমতের দরিয়া এবং ভয়ের উৎস ক্ষোভ ও ক্রোধের দরিয়া। আল্লাহর গুণাবলির মধ্যে কৃপা ও রহমতসূচক গুণাবলির দিকে যার লক্ষ থাকবে, তার মধ্যে মহব্বত শক্তিশালী হবে, এর

পরে আর কোন স্তর নেই। ভয়ের মধ্যে কঠোর গুণাবলির প্রতি লক্ষ থাকে বিধায় এ মনোযোগে মহব্বত ততটুকু থাকে না, যতটুকু রজাতে থাকে। এ জন্য রজা তথা আশা উত্তম।

যে মুত্তাকি ব্যক্তি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গুনাহ বর্জন করেছে, তার জন্যে উত্তম হচ্ছে ভয় ও আশা সমান সমান থাকা। এ জন্যেই প্রসিদ্ধ একটি উক্তি বর্ণিত আছে যে, যদি মুমিনের ভয় ও আশা পরিমাপ করা হয়, তাহলে উভয়টি সমান হবে। (আল লামউ, আবু নাসের তূসি : ৯১, খুরকুশি, তাহযিবুল আসরার : ২২৭)

বর্ণিত আছে, হযরত আলী (রা) তাঁর এক পুত্রকে বললেন, হে বৎস! আল্লাহকে এমনভাবে ভয় করো যে, যদি তুমি তাঁর নিকট পৃথিবীর সকল মানুষের সাওয়াব নিয়ে যাও, তবু তিনি সেগুলো কবুল করবেন না। পক্ষান্তরে আশাও এই পরিমাণ করো যে, যদি তুমি তাঁর নিকট সকল মানুষের গুনাহ নিয়ে যাও, তবু তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন। (হুসনুয যন্ন বিল্লাহ, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ১৩৩, হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ২০৮)

হযরত উমর (রা) বলেন, আল্লাহর তরফ থেকে যদি ঘোষণা হয় যে, একজন ছাড়া সকল মানুষ জাহান্নামে যাবে, তবে আমি বলব, সেই এক ব্যক্তি আমি হবো। পক্ষান্তরে যদি এই ঘোষণা হয় যে, সকল মানুষ জান্নাতে যাবে কিন্তু শুধু এক ব্যক্তি ব্যতীত। তবে আমি ভয় করব যে, সেই এক ব্যক্তি আমিই হতে পারি। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ৫৩)

যদি কেউ বলে, ওমর (রা)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তির ভয় এবং আশা বরাবর হওয়া কাম্য নয়। বরং তার রজা প্রবল হওয়াটাই কাম্য। রজার উপায়সমূহ মজবুত হলে রজাও মজবুত হয়, বীজ ও চাষাবাদের ন্যায়। উদাহরণত, একলোক একটি উর্বর জমিতে ভালো মানের বীজ ফেলল। নিয়মিত যত্ন নিল। চাষাবাদের সব ব্যাপারে খেয়াল রাখল। এ লোকের মনে ফসল তোলার রজা প্রবল হবে। তার শঙ্কা কখনোই আশার সমতূল্য হবে না। প্রত্যেক মুমিনের অবস্থা এমনই হওয়া উচিত।

জবাব হলো, যে লোক কেবল শব্দ ও দৃষ্টান্ত হতে জ্ঞান আরহণ করে তার পরকালের খওফ-রজা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইহকালের রজা প্রবল হয় অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে। যেমন, উর্বর ভূমি, বীজ

ভালো, আবহাওয়া, সেচ ব্যবস্থাপনা সবকিছু অনুকূল হলে ফসল ভালো হওয়ার আশা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয়ে বীজটি এমন অভিজ্ঞতার আলোকে যার শ্রেণি নির্ণয় করা যায়। এমন জমিনে বীজ ছিটানো হয় যেখানে গিয়ে পরিচর্যা করা যায় না। সেখানকার আবহাওয়া অনুকূল না প্রতিকূল তা-ও জানা যায় না। এ জাতীয় বীজের ফসলের বেলায় সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করলেও খওফ রজার ওপর কখনোই প্রবল হবে না। আলোচ্য বিষয়ে বীজ হলো ঈমান। এ বীজ ভালো মানের হওয়ার জন্য শর্তসমূহ খুবই সূক্ষ্ম। জমিন হলো কলব বা অন্তর। এ ভূমির আগাছা হলো শিরকে খফি, রিয়া এবং নিফাক ইত্যাদি। এসব কিছু গোপণ ও দুর্বোধ্য ব্যাধি। ফসলের বিপদ হলো প্রবৃত্তি ও দুনিয়ার চাকচিক্য। আর কলব বর্তমানে সুস্থ থাকলেও ভবিষ্যতে দুনিয়ামুখী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গবেষণা কিংবা অভিজ্ঞতার আলোকে এ ব্যাপারে অবগতি লাভ সম্ভব হয় না। কেননা কখনো কখনো এমন সব সমস্যা সামনে এসে যায় কিংবা আকীদা বিশ্বাসে ত্রুটি দেখা দেয় যার অভিজ্ঞতা থাকে না। এরপর কেয়ামতের দিন হল ফসল পাকা এবং ফসল কাটার সময়। জান্নাতে ফসল উঠানো হয়। এরও কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

যারা পরকালীন বিষয় জানে তাদের দুই অবস্থা। যদি দুর্বলচিত্তের অধিকারী হয় এবং নিজের ব্যাপারে ভীত হয়, নিঃসন্দেহে রজার চেয়ে তার খওফ প্রবল হবে। সাহাবা এবং তাবেয়ীদের ভয়ের হাল যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। আর সবল চিত্তের অধিকারী হয় এবং সাহসী হলে তার খওফ ও রজা বরাবর হবে। শুধু রজা কখনোই প্রবল হবে না।

হযরত ওমর (রা) নিজের কলবের ব্যাপক খোঁজখবর করতেন। হযরত হুজাইফা (রা) নিফাক সম্পর্কে (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর বলে যাওয়া মুনাফিকদের তালিকা) জানতেন। ওমর (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন তাঁর নাম মুনাফিকদের তালিকায় রয়েছে কি না। সুতরাং কোন ব্যক্তি নিজের অন্তর গোপন নিফাক এবং শিরকে খফী থেকে পরিচ্ছন্ন রাখতে সক্ষম? যদিও তাঁর হৃদয় এসব থেকে পবিত্র ছিল। কেউ যদি নিজের ব্যাপারে আশ্বস্ত থাকেও এরপরও কীভাবে সে নিশ্চিত হয় যে, তার খাতেমা বা শেষ পরিণতি ভালো হবে?

অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَمْسِيْنَ سَنَةً، حَتّٰى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا شِبْرٌ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : إِلَّا قَدْرُ فُوَاقِ نَاقَةٍ- فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ.

কোনো ব্যক্তি পঞ্চাশ বছর জান্নাতবাসীর ন্যায় আমল করে, এমনকি তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে এক হাত দূরত্ব থাকে। অন্য বর্ণনায় আছে, উটনীর দুধ দোহনের বিরতিকালীন পরিমাণ সময়। এরপর তার আমলনামা ওঠানো হয় এবং তাকে জাহান্নামীদের আমলের ওপর খাতেমা দেওয়া হয়। (সহিহ মুসলিম : ২৬৪৩, কূতুল কুলূব : ১ : ২২৬, আওসাতে তাবারানী : ২৪৬৯)

অর্থাৎ, ওলানে একবার চাপ দিয়ে দুধ বের করার পর দ্বিতীয়বার চাপ দেওয়ার মধ্যবর্তীকালীন সময়ে দৈহিক কোনো আমল করা সম্ভব হয় না। কিন্তু অন্তিম মুহূর্তে এ সামান্য সময়ে মনে কুমন্ত্রণা চলে এলে খাতেমা খারাপ হবে। সুতরাং কীভাবে নিশ্চিত থাকা সম্ভব? এটাই হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ের ভয় ও আশা।

তবে যদি কোন পাপী ব্যক্তি ধারণা করে যে, যারা জাহান্নামে যাবে না সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে, তবে এটা রজা নয় বরং তার গোমরাহি (ভ্রষ্টতা)। বেশিরভাগ লোকের মধ্যে রজার আধিক্য বিভ্রান্তিতে পড়া এবং মারেফাত কম হওয়ার পরিচায়ক। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার গুণাবলি বর্ণনা প্রসঙ্গে খওফ ও রজাকে একসঙ্গেই উল্লেখ করে বলেছেন,

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا.

তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকে ভয়ে ভয়ে ও আশায় আশায়। (সূরা সিজদাহ : ১৬)

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا كَانُوْا.

তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতির সাথে। (সূরা আম্বিয়া : ৯০)

কিন্তু হযরত উমরের মত ব্যক্তি কোথায়, যার খওফ ও রজা এক সমান হবে?

সুতরাং বর্তমানে যারা আছে, তাদের জন্য খওফের প্রাবল্য উত্তম, যদি তারা খওফের কারণে নিরাশায় ডুবে না যায়। প্রসঙ্গত যে খওফ হতাশা জন্ম দেয় এবং মানুষ আমল ত্যাগ করে গুনাহে ডুবে যায়, তা খওফ নয়। খওফ তো হলো যা আমলে উৎসাহিত করে এবং সকল প্রকার প্রবৃত্তি থেকে দূরে ঘরিয়ে দেয় এবং অন্তরকে দুনিয়ার মোহ থেকে বিরত রাখে।

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে মুআয (র) বলেন, যে লোক আল্লাহর ইবাদত শুধুমাত্র খওফের উদ্দেশ্যে করে, সে ভাবনার সাগরে নিমজ্জিত হয় আর যে কেবল রজার কারণে ইবাদত করে, সে বিভ্রান্তির জালে আটকে ঘুরপাক খেতে থাকে। যদি খওফ ও রজা এই দুটির সম্মিলনে কেউ ইবাদত করে, তাহলে সে সরল ও সঠিক পথে অবস্থান করে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৪২)

মাকহুল নাসাফী (র) বলেন, যে শুধু খওফের কারণে আল্লাহর ইবাদত করে সে হারুভী (সম্প্রদায়)। যে শুধুই রজার কারণে আল্লাহর ইবাদত করে সে মুরজিয়া। যে শুধু মুহাব্বতের কারণে ইবাদত করে সে যিন্দিক। পক্ষান্তরে যে খওফ, রজা, মুহাব্বত তিনটার কারণে ইবাদত করে সে মুওয়াহিহদ, তথা একত্ববাদী। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৪২, ফাতওয়া তাকিউদ্দিন সুবকি : ২ : ৫৫৫, তাফসীরে আবদুর রহমান সুলামি, ২ : ১৩৮)

এতে বোঝা যায় যে, ইবাদতে এই তিন বিষয়ে সমন্বয় আবশ্যক। কিন্তু খওফ প্রবল থাকা মৃত্যুর সম্মুখীন না হওয়া পর্যন্ত অধিক যুক্তিযুক্ত। মৃত্যুর সময় অবশ্য রজার প্রাবল্য উত্তম। কেননা, খওফ আমলে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বেত্রাঘাতের স্থলাভিষিক্ত। আর তখন আমলের সময়ও শেষে হয়ে যায়। সুতরাং মৃত্যুর সময় কোনো আমল করা মানুষের জন্য যেমন অসম্ভব, তেমনিভাবে এ সময় খওফের প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ সহ্য করাও সম্ভব নয়। এতে আগামীকালের মৃত্যু আজই হয়ে যায়। তবে রজার মাধ্যমে অন্তর শক্তি পায় এবং আল্লাহ তাআলার মহব্বত অন্তরে স্থান পায়।

মানুষের উচিত আল্লাহর মহব্বত নিয়ে দুনিয়া থেকে প্রস্থান করা। যাতে করে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎও ভালো মনে করে। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতকে পছন্দ করে, আল্লাহও তার সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আশার সঙ্গে ভালোবাসা জড়িত। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার দয়া

প্রত্যাশা করে সে আল্লাহর প্রিয়পাত্র। আর ইলম ও আমলের লক্ষ্য হলো আল্লাহর পরিচয় লাভ করা। পরিচয় লাভের ফলাফল হলো ভালোবাসা বা মুহাব্বত। যখন মৃত্যুর মাধ্যমেই মাহবুবের দরবারে উপস্থিত হবে তখন মুহাব্বত অনুপাতে তার আনন্দ হবে। যে ব্যক্তি মাহবুব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে সে কঠিন পরীক্ষা ও ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হবে।

কোনো কোনো অন্তরে মৃত্যুর সময় স্ত্রী, সন্তান, পরিজন-বন্ধুস্বজন এবং সম্পদের মুহব্বত জাগরুক থাকে। এ জাতীয় লোকদের ভালোবাসা-মুহব্বত সম্পূর্ণ দুনিয়ামুখী। দুনিয়াই তাদের জান্নাত। কারণ জান্নাত বলা হয় এমন ভূখন্ডকে যাতে ভালোবাসার সবকিছু বিদ্যমান থাকে। মৃত্যুর মাধ্যমে তারা জান্নাত (দুনিয়া) থেকে বের হয়ে যায়। মৃত্যু দ্বারা কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মধ্যে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়ে যায়। এদের অবস্থা অস্পষ্ট নয় বরং সুস্পষ্ট।

পক্ষান্তরে যাদের মাহবুব একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাঁর ধ্যানখেয়ালই তাদের সবকিছু। দুনিয়া এবং দুনিয়ার বন্ধন মাহবুবের পথে তাদের জন্য অন্তরায়। দুনিয়া তাদের নিকট জেলখানা। কেননা জেলখানা হলো এমন স্থান যা প্রেমিককে প্রেমাষ্পদের নিকট গমনে বাধা দেয়। মৃত্যুর মাধ্যমে তারা প্রেমাষ্পদের নিকট গমন করেন এবং জেলখানা থেকে মুক্তি লাভ করেন। জেলখানা থেকে বের হওয়ার পর মাহবুবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে যাদের কোনো অন্তরায় থাকে না তাদের অবস্থাও গোপন নয়। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে দুনিয়া থেকে বিচ্ছেদ হওয়ার পর সাওয়াব ও শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার এটা প্রথম অবস্থা। আল্লাহ তাআলা তার নেককার বান্দাদের জন্য যে নিয়ামতরাজি প্রস্তুত রেখেছেন, যা না কোনো চোখ দেখেছে, কোনো কান শ্রবণ করেছে, না মানব হৃদয়ে কোনো কল্পনা এসেছে তার কথা নাই বললাম। যারা ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দিয়েছে। ইহকাল নিয়ে পরম তুষ্ট থেকেছে তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা যে অবর্ণনীয় শাস্তি, শৃঙ্খল-বেড়ি, লাঞ্ছনা ও অপমান প্রস্তুত রেখেছেন তা-ও উল্লেখ করলাম না। আল্লাহ তাআলার কাছে আমাদের কামনা, ঈমানের সাথে আমাদের মৃত্যু দান করবেন এবং সজ্জনদের সঙ্গে মিলিত করবেন। আমীন।

এ প্রসঙ্গে নবীজি (স) যে দুআ করতেন, তা করাই আমাদের জন্য উত্তম। তিনি এ দুআ করতেন,

اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِيْ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَحُبَّ مَا يُقَرِّبُنِيْ إِلٰى حُبِّكَ وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে আপনার মহব্বত দান করুন এবং যে আপনাকে মুহাব্বত করে তার মুহাব্বত এবং সে মুহাব্বত, যা আমাকে আপনার ভালোবাসায় নৈকট্যশীল করে এবং আপনার মহব্বতকে আমার নিকট ঠান্ডা পানির চেয়েও প্রিয় করে দিন। (জামে তিরমিযী : ৩৪৯০)

মোটকথা, মৃত্যুর সময় রজার প্রাবল্য উত্তম। কেননা, এতে মুহাব্বত থাকে। আর মৃত্যুর পূর্বে খওফ উপযুক্ত। কেননা, এর দ্বারা কামনা-বাসনার আগুন উত্তমভাবে নির্বাপিত হয় এবং দুনিয়ার মোহ কেটে যায়। তাই নবী করিম (স) বলেন,

لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থাৎ, আপন রবের ব্যাপারে সুধারণা ছাড়া তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুবরণ না করে। (সহিহ মুসলিম : ৮২ : ২৮৭৭)

হযরত সুলাইমান তাইমি (র)-এর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর ছেলেকে বললেন, হে পুত্র! আমার নিকট আশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলো এবং মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহত রাখো। আমি সুধারণা নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। (হুসনুয যন্ন বিল্লাহ : ২৯, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ৩১)

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) মৃত্যুর সম্মুখীন হয়ে নিজের মধ্যে ভয় অনুভব করলে আশার কথা শুনতে আলেমদেরকে চারপাশে সমবেত করেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৯)

হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (র) মৃত্যুর সময় স্বীয় পুত্রকে বলেন, আমার কাছে ওই সকল হাদিস বর্ণনা করো, যেগুলোতে আশা ও সুধারণার কথা উল্লেখ আছে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৯)

এ সকল বিষয় দ্বারা আল্লাহ তাআলা প্রিয় হোন এটাই উদ্দেশ্য। এজন্যই হযরত দাউদ (আ) এর প্রতি ওহি প্রেরণ করে আল্লাহ বলেন, আমাকে

আমার বান্দাদের প্রিয়জন করে দাও। তিনি আরয করলেন, কীভাবে? ইরশাদ হলো, তাদের নিকট আমার নিয়ামাত ও অনুগ্রহসমূহ তুলে ধরো। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ৩২)

মোটকথা, মানুষের চূড়ান্ত সৌভাগ্য হলো আল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে মৃত্যুবরণ করা। আর তা দুভাবে অর্জিত হয়। ১. মারেফত। ২. দুনিয়া বিমুখতা।

যাতে দুনিয়া প্রেমাস্পদের মিলনে অন্তরায় হওয়ায় জেলখানার ন্যায় মনে হয়। আবু সুলাইমান দারানী (র)-কে জনৈক বুযুর্গ স্বপ্নে দেখেন, তিনি উড়ছেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি এখন স্বাধীন। বুযুর্গ সকালে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ওই রাতে সুলাইমান দারানী (র) ইন্তেকাল করেছেন।

## খওফ হাসিলের উপায়

সবর এবং শোকরের অধ্যায়ে খওফ হাসিলের উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কেননা খওফ এবং রজা হাসিল করা ছাড়া সবর অর্জন সম্ভব নয়। দীনের প্রথম স্তর হলো ইয়াকীন বা বিশ্বাস। আর ইয়াকীন হলো, আল্লাহ তাআলার প্রতি, আখেরাতের প্রতি, এবং জান্নাত-জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

এই ইয়াকীন জাহান্নামের ভয় এবং জান্নাতের আশা সঞ্চার করে। আর ভয় ও আশা সবরকে মজবুত ও দৃঢ় করে। রিপুর কামনা-বাসনা দ্বারা জাহান্নাম বেষ্টন করে রাখা হয়েছে। খওফ বা ভয়ের প্রাবল্য ব্যতীত প্রবৃত্তি দমন করা যায় না।

এ কারণে হযরত আলী (রা) বলেন, যে জান্নাতের প্রতি আগ্রহী হবে সে প্রবৃত্তির কথা ভুলে যাবে। আর যে জাহান্নামের ভয় করবে সে নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে নিবৃত্ত থাকবে।

খওফ ও রজা হতে অর্জিত সবরের মাকাম মুজাহাদার মাকামে পৌঁছে দেয়। যে মাকামে উন্নীত হয়ে সাধক সর্বদা আল্লাহর যিকির এবং তার ধ্যান খেয়ালে নিমগ্ন থাকে। সর্বদা আল্লাহর স্মরণ মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যায়। তাঁর ধ্যান-খেয়াল মারেফাতের পূর্ণতায় উপনীত করে। সান্নিধ্য ও মারেফাতের পূর্ণতা মুহব্বতের মাকামে পৌঁছায়। এরপর সন্তুষ্টি ও তাওয়াক্কুলে স্তরে। তারপর আরও ঊর্ধ্বে।

এটাই হলো সুলূকের স্তর বিন্যাস। অর্থাৎ, ইয়াকীনের পর খওফ ও রজার স্তর। এরপর সবরের স্তর। সবরের মাধ্যমে মুজাহাদা তৈরি এবং মানবের ভেতর বাহির কেবল আল্লাহর জন্যই হয়ে যায়। মুজাহাদার পর হিদায়াত এবং মারেফাতের বন্ধ দুয়ার খুলে যায়। মারেফাতের পর মুহব্বত এবং সান্নিধ্যের স্তর। মুহাব্বতের দাবি হলো মাহবুবের সন্তুষ্টি অনুযায়ী কাজ করা তার সাহায্যের উপর আস্থা রাখা। এই আস্থা রাখার নাম হলো তাওয়াক্কুল। সবরের অধ্যায়ে খওফ হাসিলের উপায় সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাই যথেষ্ট ছিল। এরপরও বিশেষভাবে সংক্ষিপ্তাকারে খওফ সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

দুটি ভিন্ন পদ্ধতিতে খওফ সৃষ্টি হয় যার একটি অপরটির ঊর্ধ্বে। উভয় পদ্ধতি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে। যেমন, একটি শিশু ঘরে বসে খেলা করছে। এমন সময় একটি হিংস্র প্রাণী অথবা একটি সাপ ঘরে প্রবেশ করে। এমতাবস্থায় সাপ বা হিংস্র প্রাণীকে ভয় না পাওয়া এবং খেলার জন্য এগুলোর দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা স্বাভাবিক। কারণ, শিশুটি এগুলোর ভয়াবহতা সম্পর্কে জানে না। কিন্তু শিশুটির সাথে যদি তার পিতা থাকে তাহলে সে ভয় পাবে এবং সেখান থেকে সরে যেতে উদ্যত হবে। কারণ, সে তার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত। সুতরাং শিশুটি তার পিতাকে ভয় পেতে দেখলে তার মধ্যেও এর ভয় সৃষ্টি হবে এবং সে-ও তার পিতার সঙ্গে সঙ্গে পালাতে উদ্যত হবে। এখানে পিতার ভয় হচ্ছে সাপ ও হিংস্র প্রাণীর বৈশিষ্ট্য তথা আক্রমণ, ছোবল, বিষ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা। পক্ষান্তরে শিশুটির ভয় হলো তার পিতার অনুসরণ। অর্থাৎ, সে বুঝতে পেরেছে যে, পিতার ভয় কোনো ভয়ানক বস্তুর কারণে হয়েছে, সুতরাং সে তার পিতার দেখাদেখি জানতে পারবে যে, হিংস্র প্রাণী ভয়ানক বস্তু, কিন্তু এর কারণ সম্পর্কে সে অজ্ঞ।

জ্ঞাতব্য : আল্লাহ তাআলাকে ভয়ের দু'টি স্থান রয়েছে।

১. আল্লাহ তাআলার শাস্তিকে ভয় করা এবং

২. তাঁর সত্তাকে ভয় করা।

দ্বিতীয় প্রকার ভয় তাদের হয়, যারা ইলম ও অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী। পক্ষান্তরে প্রথম প্রকার ভয় সাধারণ মানুষের হয়, তা শুধু জান্নাত ও

জাহান্নামে বিশ্বাস এবং এগুলোকে ইবাদত ও নাফরমানীর পরিণাম ফল বিশ্বাসের জন্যই তৈরি হয়। এই ভয় অসাবধানতা ও ঈমানের দুর্বলতার জন্য দুর্বল হয়ে পড়ে। কিয়ামতের ভয়াবহতার চিন্তা, পরকালের বিভিন্ন কথা স্মরণ করলে এবং আখেরাতের শাস্তির কথা ভাবলে এ অসাবধানতা দূর হয়। এছাড়া আল্লাহভীরুদের দেখলে এবং তাদের নিকট বসলেও এ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় প্রকার ভয় অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তাকে ভয় করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিকট থেকে দূরে সরে পড়া এবং তাঁর ও বান্দার মাঝখানে আড়াল সৃষ্টির ভয় করা। হযরত যুন্নুন (র) বলেন, বিচ্ছেদের ভয়ের তুলনায় জাহান্নামের ভয় সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মতোই। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৫, তাহযিবুল আসরার, খুরকুশী : ২৩০)

এ খওফ বা ভয় আলেমগণের হয়। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا.

আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে। (সূরা ফাতির : ২৮)

অবশ্য সাধারণ মুমিনরাও এ ভয়ের কিছু অংশ পেয়ে থাকে। কিন্তু তাদের সেই ভয় কেবল অনুসরণে হয়ে থাকে। যেমন শিশু তার পিতার অনুকরণে সাপকে ভয় করে। এ ভয়ের মাঝে অন্তর্দৃষ্টি না থাকার ফলে এটা দুর্বল হয়ে থাকে এবং তা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ হয়ে যায়। তবে যদি সবসময় ভয়ের কারণসমূহ অনুধাবন করা যায় এবং সে অবস্থাতেই দীর্ঘদিন ইবাদত ও গুনাহ থেকে বাঁচা যায়, তাহলে খওফ মজবুত হয়।

মূলত যে লোক মারেফাতে উন্নীত হয়ে আল্লাহ তাআলাকে সঠিকভাবে চিনতে পারে, সে নিজে থেকেই আল্লাহকে ভয় করতে থাকে। তার জন্য কোনো পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। যেমন, কোনো লোক হিংস্র জন্তুর পরিচয় জেনে নেয়। এরপর নিজেকে তার নাগালের মধ্যে দেখতে পেলে, সে এমনিতেই হিংস্র জন্তুকে ভয় করতে থাকবে। এজন্য তার কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হবে না। এজন্যই আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ) এর নিকট ওহি প্রেরণ করে বলেছেন, আমাকে ভয় করো যেমন হিংস্র জন্তুকে ভয় করে থাকো। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৪১)

সুতরাং হিংস্র জন্তুকে ভয় করার জন্য তার পরিচয় জানা এবং তার আক্রমণের অবস্থাটি জানাই যথেষ্ট। অতএব, যে লোক আল্লাহকে চিনবে, সে একথাও জানবে যে, তিনি যখন যা ইচ্ছা তখন তা-ই করেন। যা ইচ্ছা আদেশ করেন। কোনো কিছুর পরওয়া করেন না। এরপর আল্লাহকে ভয় করা ব্যতীত তার কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকবে না।

সুতরাং যে আল্লাহকে চিনল সে জানল যে, তিনি যা চান তাই করেন। কারো পরওয়া করেন না। তিনি যা ইচ্ছা আদেশ করেন। কারো ভয় করেন না। পূর্ব কোনো অসিলা ব্যতীত তিনি ফেরেশতাদের নৈকট্য দান করেছেন এবং অতীতের কোনো অপরাধ ছাড়াই ইবলিসকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তার বৈশিষ্ট্য হলো তার ভাষ্য,

هٰؤُلَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَلَا أُبَالِي وَهٰؤُلَاءِ فِي النَّارِ وَلَا أُبَالِي.

এরা জান্নাতবাসী, এতে আমার কোনো পরওয়া নেই এবং এরা জাহান্নামী, এতেও আমার কোনো পরওয়া নেই। (মুসনাদে আহমদ : ৪ : ১৮৬, সহিহ ইবনে হিব্বান : ৩৩৮)

যদি আপনার মনে হয় যে, আল্লাহ তাআলা কেবল গুনাহের শাস্তি দিবেন এবং আনুগত্যের সাওয়াব দিবেন তাহলে আপনার ভেবে দেখা উচিত, কেন তিনি আনুগত্যকারীকে আনুগত্যের উপায়সমূহ দিয়ে অবকাশ দিয়েছেন যাতে সে চাইলে আনুগত্য করবে বা করবে না? পাপীকে কেন পাপের উপকরণ দিয়ে ছাড় দিয়েছেন। চাইলে পাপ করবে বা পাপ থেকে বেঁচে থাকবে?

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা যখন উদাসীনতা, প্রবৃত্তি ইত্যাদি কামনা বাসনা এবং চরিতার্থ করার সক্ষমতা সৃষ্টি করেছেন অবশ্যই তা কার্যে পরিণত হবে। এখন কথা হলো যাকে তিনি তার দরবার থেকে বের করে দিয়েছেন নিশ্চয় সে-ই অপরাধী, গুনাহগার। এই যে সে অপরাধ করল, কেন করল? কোন বস্তু তার দ্বারা অপরাধ করিয়েছে। না পূর্বের কোনো অপরাধের শাস্তি হিসেবে তার দ্বারা এ গুনাহ সংঘটিত হয়েছে। এভাবে একের পর এক প্রশ্ন আসতে থাকবে যার কোনো শেষ নেই। নাকি বান্দার পক্ষ থেকে প্রথম যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল এটা বান্দার কোনো কর্ম ছিল বরং 'আযাল' তথা অনন্তকালে তার ভাগ্যে এটা লিখে দেওয়া হয়েছিল?

এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (স) ব্যক্ত করেছেন, আল্লাহ তাআলার দরবারে আদম (আ) এবং মুসা (আ) বিতর্ক করছিলেন। মুসা (আ) আদম (আ)-কে বললেন, আপনি আদম। আল্লাহ তাআলা আপনাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন। ফেরেশতাদের দ্বারা আপনাকে সিজদা করিয়েছেন। জান্নাতে আপনাকে অবস্থান করিয়েছেন। এরপর আপনার ভুলের কারণে আপনাকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিয়েছেন।

আদম (আ) বললেন, আপনি তো মুসা। আল্লাহ তাআলা তার রিসালাত ও কালাম দ্বারা আপনাকে মনোনিত করেছেন। আপনাকে কাষ্ঠফলক দান করেছেন। তাতে সবকিছু স্পষ্টরূপে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আপনাকে কালাম করার সঙ্গী বানিয়েছেন। আমার সৃষ্টির কত বছর পূর্বে তাওরাত কিতাব লিপিবদ্ধ করার কথা তাতে পেয়েছেন? মুসা (আ) বললেন, ৪০ বছর পূর্বে। আদম (আ) বললেন, তাতে কি এ কথা লিপিবদ্ধ আছে, وَعَصٰى اٰدَمُ رَبَّهٗ فَغَوٰى 'আদম তাঁর রবের অবাধ্য হয়েছেন অতঃপর দিশাহীন হয়েছেন। মুসা (আ) বললেন, হ্যাঁ, তাতে এ কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। আদম (আ) বললেন, আপনি কি তাহলে আমাকে এমন কাজের জন্য ভর্ৎসনা করছেন যা আল্লাহ তাআলা আমার সৃষ্টির ৪০ বছর পূর্বে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? নবী করীম (স) বলেন, আদম মুসার সঙ্গে তর্ক করে জয়ী হয়েছেন। (সহিহ বুখারী : ৩৪০৯, সহিহ মুসলিম : ২৬৫২)

সুতরাং উপর্যুক্ত বিষয়ের হেতু সম্পর্কে যে ব্যক্তি হেদায়েতের নূরের আলোকে জানবে সে তাকদীরের গোপন ভেদ সম্পর্কে অবগত বিশেষ আরেফদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আর যে ব্যক্তি শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে এবং ঈমান আনবে সে সাধারণ মুমিনদের মধ্যে গণ্য হবে। এ দুশ্রেণির খওফ বা ভয় হবে ভিন্ন ভিন্ন। কেননা প্রতিটি মানুষ আল্লাহ তাআলার কুদরতি কব্জায় ওই শিশুর ন্যায় যাকে হিংস্র প্রাণির অভয়ারণ্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। হিংস্র প্রাণী তার সম্পর্কে অমনোযোগী হলে সে প্রাণিদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। প্রাণী অবগত হলে তাকে ছিড়েফেঁড়ে খাবে। প্রাণির আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকাটা ঘটনা চক্রে হয়ে থাকে। এটাও পূর্ব হতে তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। তাকদীরের ব্যাপারে ব্যক্তির

নিকট মনে হবে ঘটনাটি আচানক ঘটেছে। কিন্তু যারা আল্লাহ তাআলার ইলমের চশমা দিয়ে বিষয়টি প্রত্যক্ষ করবেন তারা একে আচানক ঘটেছে বলবেন না।

যে লোক হিংস্রপ্রাণির অভয়ারণ্যে থাকবে তার মারেফাত যদি পূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে সে হিংস্র প্রাণিকে ভয় করবে না। কেননা তিনি জানেন এটা অনুগত প্রাণী। যদি তার উপর ক্ষুধা চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সে আক্রমণ করে। অন্যথায় সে শিকারের ব্যাপারে গাফেল থাকে। সুতরাং আরেফ বিল্লাহ অনুগত প্রাণিকে কেন ভয় করবে? বরং সে তো তাঁকেই ভয় করবে যিনি একে ভয়ংকররূপে সৃষ্টি করেছেন এবং হিংস্র বানিয়েছেন। আমি এ কথা বলি না যে, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করার দৃষ্টান্ত হলো হিংস্রপ্রাণিকে ভয় করার ন্যায়। বরং পর্দা সরিয়ে দেওয়া হলে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, হিংস্রপ্রাণিকে ভয় করার মানেই হলো আল্লাহকে ভয় করা। কারণ এর মাধ্যমে কাউকে ধ্বংসকারী একমাত্র সত্তা তো তিনিই।

উল্লেখ্য, দুনিয়ার হিংস্র প্রাণির ন্যায় আখেরাতেও হিংস্র প্রাণী রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আযাব ও সাওয়াবের উপকরণ সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের জন্যে উপযুক্ত মাখলুকও সৃষ্টি করেছেন। অনন্ত অসীমকালে যার ভাগ্যে যা লিখা হয়েছে ভাগ্য তাকে সেদিকেই টেনে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন। এর যোগ্য কিছু লোকও সৃষ্টি করেছেন এবং জান্নাতী কাজে তাদের অনুগতও করেছেন। তিনি জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। এর জন্য উপযুক্ত লোক সৃষ্টি করে তাদের জাহান্নামী কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। সুতরাং যে লোক নিজেকে ভাগ্যের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার মাঝে দেখতে পাবে অবশ্যই খওফ বা ভয় তার উপর প্রবল হবে। যারা তাকদীরের ভেদ সম্পর্কে জানেন এটা তাদের ভয়ের স্তর।

তবে যারা লক্ষ্যের চূড়ায় পৌঁছতে অক্ষম তাদের চিকিৎসা হলো রাসূলুল্লাহ (স) এবং সাহাবা ও আল্লাহওয়ালা বুযুর্গদের উক্তি শ্রবণ করা। তাহলে খওফকারী, আরেফদের অবস্থা ও বক্তব্য জানতে পারবে এবং তাদের মেধা ও অবস্থানকে প্রতারিত রজাকারীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বুঝতে পারবে যে, খওফকারী ও আরেফদের অনুসরণ করাই উত্তম। কেননা তারা হলেন নবীগণ, আওলিয়া ও ওলামায়ে কেরাম। আর যারা আশা করে নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে তারা হলো, ফিরআউন, আবু জাহল, নির্বোধ ও প্রতারিত।

রাসূলুল্লাহ (স) হলেন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের সর্দার। তিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করতেন। বর্ণিত আছে, নবীজি (স) একজন শিশুর জানাযা পড়াচ্ছিলেন।

আরেক বর্ণনা মতে, তিনি দুআ করছিলেন,

اَللّٰهُمَّ، قِهِ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ عَذَابَ النَّارِ.

হে আল্লাহ! তাকে কবরের আযাব থেকে এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। (তাবারানী কাবীর : ৪ : ১২১)

আবু আইউব (রা) বর্ণিত আছে, এক শিশুকে দাফন করার পর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

لَوْ أَفْلَتَ أَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ- لَأَفْلَتْ هٰذا الصَّبِيُّ.

কবরের আলিঙ্গন হতে কেউ পালাতে সক্ষম হলে এই শিশুটি পালিয়ে যেত। (মুসান্নাফে আবি শাইবা : ৩০৪৫৫, ১১৭০৮)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) এক শিশুর দাফনকার্য শেষ করার পর বলেন,

اَللّٰهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

হে আল্লাহ! তাকে কবরের আযাব হতে মুক্তি দিন।

অন্য বর্ণনায় আছে নবীজি (স) কাউকে বলতে শুনলেন,

هَنِيْئًا لَكَ، عُصْفُوْرٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ.

তুমি সুখি হও। তুমি জান্নাতী চড়ুই। তার কথা শোনে রাসূলুল্লাহ (স) রাগ হয়ে বললেন,

مَايُدْرِيْكَ أَنَّهُ كَذٰلِكَ؟

তুমি কি জানো, সে এমনই!

وَاللّٰهِ اَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَمَا أَدْرِيْ مَا يُصْنَعُ بِيْ.

আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহর রাসূল! আমিই জানি না আমার সঙ্গে কীরূপ আচরণ করা হবে।

إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَخَلَقَ لَهَا أَهْلًا، لَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَ لَا يُنْقَصُ.

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করেছেন এবং জান্নাতের জন্য উপযুক্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। এদের সংখ্যা বাড়বেও না কমবেও না। (কূতুল কুলূব : ১ : ১২৯, সহিহ মুসলিম : ২৬৬২)

বর্ণিত আছে, হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রা)-এর জানাযায় এসেও নবীজি (স) এমন বলেছিলেন। তিনি ছিলেন প্রথম সারির মুহাজির সাহাবী। তার ইন্তেকালের পর হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেছিলেন, جান্নাত আপনার জন্য সুখকর হোক। এরপর তিনি বলেছিলেন, وَاللهِ، لَا أُزَكِّيْ أَحَدًا بَعْدَ عُثْمَانَ আল্লাহর শপথ, উসমানের পর কাউকে আমি এতটা পবিত্র বলব না। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৯, মুসনাদে আহমদ : ১ : ২৩৭, সহিহ বুখারী : ৭০০৪, আল ইস্তেআব : ৫৫৩, আল ইসাবা-ইবনে হাজার : ৪ : ৪৫৬। এসব কিতাবে উক্তিকারী নারীর নাম নিয়ে ভিন্নতা রয়েছে, যেমন, ১. উম্মুল আলা বিনতুল হারেস, ২. উম্মুস সায়েব, ৩. উম্মে খারেজা বিন যায়েদ)

মুহাম্মদ ইবনুল খাওয়ালা হানাফী (র) বলেন, আল্লাহর শপথ, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে পবিত্রতর কাউকে বলি না। আমার জন্মদাতা পিতাকেও না। তার বক্তব্যে শিয়া সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তখন তিনি হযরত আলী (রা) ফাযায়েল বর্ণনা করা শুরু করেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৯, তারীখে দিমাশক : ৫৪ : ৩৪৯)

এক হাদিসে বর্ণিত আছে, সুফফাবাসী এক সাহাবি ইন্তেকাল করার পর তার মা তাকে বললেন, জান্নাত তোমার জন্য সুখকর হোক। তুমি জান্নাতের চড়ুইসমূহের একটি চড়ুই। রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে হিজরত করে এসেছো। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছ। তার কথা শুনে নবীজি (স) বললেন,

وَمَا يُدْرِيْكَ؟! لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَا يَنْفَعُهُ وَيَمْنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ.

তুমি কী জানো? হয়তো সে জীবদ্দশায় এমন কথা বলত যা তার (মৃত্যুরপর) কোনো কাজে আসবে না এবং এমন সম্পদ দান করা হতে

বিরত থাকত যা করলে ক্ষতি হতো না। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৮, আস্ সমতু ও আদাবুল লিসান, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ১০৯, মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৪০১৭)

বর্ণিত আছে, নবীজি (স) এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তখন এক মহিলাকে বলতে শুনলেন, জান্নাত তোমার জন্য সুখকর হোক। নবীজি (স) বললেন, مَنْ هٰذِهِ الْمُتَأَلِّيَةُ عَلَى اللهِ আল্লাহর উপর হুকুম জারি করছে এই মহিলা কে? রুগ্ন ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি আমার মা, নবীজি (স) বললেন, তুমি কী জানো! সে হয়তো অনর্থক কোনো কথা বলত এবং অপ্রয়োজনীয় সম্পদ দান করতে কার্পণ্য করতো। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৮, আস সমতু ও আদাবুল লিসান : ১১০, অসুস্থ ব্যক্তি ছিলেন হযরত কাব বিন উজারা (রা))

মুমিনরা কেন ভয় করবে না অথচ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সূরা হুদ এবং এ জাতীয় সূরাগুলো (সূরা ওয়াকিয়া, ইযাস শামসু কুব্বিরাত, আম্মা ইয়াতাসাআলুন) আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিয়েছে। (জামে তিরমিযী : ৩২৯৭, মুসতাদরাকে হাকেম : ২ : ৩৪৩)

ওলামায়ে কেরাম বলেন, হাদিসে সম্ভবত সূরা হুদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে!

اَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُوْدٍ.

এ-ও জেনে রেখ! হুদের সম্প্রদায় আদের পরিণাম হয়েছিল লাঞ্ছনাকর। (সূরা হুদ : ৬০)

اَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُوْدُ.

জেনে রাখো! ধ্বংসই ছিল মাদইয়ানবাসীদের পরিণাম, যেভাবে ধ্বংস হয়েছিল সামূদ সম্প্রদায়। (সূরা হুদ : ৯৫)

اَلَا بُعْدًا لِّثَمُوْدَ .

জেনে রেখো! ধ্বংসই হলো সামূদ সম্প্রদায়ের পরিণাম। (সূরা হুদ : ৬৮)

নবীজি (স) জানতেন যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, তারা শরিক করতো না। তিনি ইচ্ছে করলে সকলকে হিদায়েত দিতে পারতেন।

সূরা ওয়াকিয়াতে এসেছে।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ. خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ.

এর সংঘটন অস্বীকার করার কেউ থাকবে না। নীচুকারী, সমুন্নতকারী। (সূরা ওয়াকিয়া : ২-৩)

অর্থাৎ, কলম শুকিয়ে গেছে। তাকদীর পূর্ণ হয়ে গেছে। অবশেষে সূরা ওয়াকিয়া অবতীর্ণ হয়েছে। এক সম্প্রদায়কে উঁচু করেছেন যারা দুনিয়াতে উঁচু ছিল। আরেক সম্প্রদায়কে করেছেন যারা দুনিয়াতে নিচু ছিল। সূরা তাকবীরে কেয়ামতের ভয়াবহতা ও অন্তিম মুহূর্তের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে।

وَ اِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ. وَ اِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ.

জাহান্নামের অগ্নি যখন প্রজ্বলিত করা হবে। যখন জান্নাতকে নিকটবর্তী করা হবে। (সূরা তাকবীর : ১২-১৩)

يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ.

সেদিন মানুষ নিজের কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে। (সূরা নাবা : ৪০)

لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوَابًا.

দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্য কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সঠিক কথা বলবে। (সূরা নাবা : ৩৮)

কুরআন শুরু হতে শেষ পর্যন্ত যারা তাদাব্বুর করে ভেবে ভেবে তিলাওয়াত করবে তাদের মনে খওফ সৃষ্টি হবে। যদি আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

وَ اِنِّىْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدٰى.

এবং আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল ওই ব্যক্তির প্রতি, যে তাওবা করে, ঈমান আনে, সৎকর্ম করে ও সৎপথে অবিচল থাকে। (সূরা ত্বহা : ৮২) না হতো তাহলে এ খওফ যথেষ্ট হয়ে যেত।

এ ক্ষমাকে চারটি শর্তের সঙ্গে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। বান্দা কি এসব শর্তের কোনো একটি পালনে অক্ষম হয়ে যাবে। না তারচে কঠোর আল্লাহ তাআলার এ বাণী

فَاَمَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ.

তবে যে ব্যক্তি তাওবা করেছিল এবং ঈমান এনেছিল ও সৎকর্ম করেছিল, আশা করা যায় সে সাফল্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা কাসাস : ৬৭)

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ.

সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। (সূরা আহযাব : ৮)

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ.

হে মানুষ ও জিন! আমি অচিরেই তোমাদের (হিসাব নেওয়ার) প্রতি মনোনিবেশ করবো। (সূরা আর রহমান : ৩১)

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ

তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারেও নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? (সূরা আরাফ : ৯৯)

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ، اِنَّ اَخْذَهٗ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ.

তোমার প্রতিপালকের শাস্তি এমনই! তিনি তখনই শাস্তি দান করেন জনপদসমূহকে যখন তারা জুলুম করে থাকে। নিশ্চয় তাঁর শাস্তি বেদনাদায়ক, কঠিন। (সূরা হুদ : ১০২)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا. وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا.

(সে দিনকে ভুলো না) যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদের সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদের পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (সূরা মারইয়াম : ৮৫-৮৬)

وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا

এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে। (সূরা মারইয়াম : ৭১)

اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ، اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ.

তোমাদের যা ইচ্ছা কর; তোমরা যা কর তিনি তার সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা হা-মিম সাজদাহ : ৪০)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ.

যে আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই। (সূরা শুআরা : ২০)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ. وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তা-ও দেখবে। (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

وَ قَدِمْنَا اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَاءً مَّنْثُوْرًا.

আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব। (সূরা ফুরকান : ২৩)

وَالْعَصْرِ. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ . اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

কালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়। (সূরা আসর :১-৩) ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভ করার এ চারটি শর্ত অপরিহার্য।

আম্বিয়া (আ)-গণের উপর অজস্র নিয়ামত বর্ষণ হওয়ার পরও তাঁদের ভয়ের কারণ ছিল, তারা আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ.

বস্তুত আল্লাহর পাকড়াও সম্পর্কে শুধু তারাই নিশ্চিন্ত হয়, যারা ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়। (সূরা আরাফ : ৯৯)

তাঁরা জানতেন আল্লাহ তাআলাই আলিমুল গায়েব। অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। আর অদৃশ্যের কোনো বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই। আমি তোমাদের নিরাপত্তা দিয়েছি আল্লাহর এ কথার পরও তারা নিশ্চিত হননি। বরং একে তারা পরীক্ষাস্বরূপ মনে করেছেন। যদি তাদের ভয় স্থির হয়ে যেতো

তাহলে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, তারা শাস্তি হতে নিরাপদ হয়ে গেছেন। আপনার শাস্তির ভয় হতে কে নিরাপদ থাকতে পারে তাঁদের এ উক্তি তখন যথার্থ হতো না।

যেমন, হযরত ইবরাহীম (আ)-কে যখন আগুনে ফেলার জন্য নিচে বসানো হল তখন তিনি বলেছিলেন, حَسْبِيَ اللهُ আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। তখন জিবরাঈল (আ) জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোনো প্রয়োজন আছে? ইবরাহীম (আ) বললেন, আপনার কাছে হলে, না। কোনো প্রয়োজন নেই। 'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট' এ কথার দাবি পূরণার্থে জিবরাঈল (আ) আবেদন তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর দুআ কবুল করে আয়াত নাযিল করেন,

وَ اِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى.

এবং ইবরাহিমের কিতাবে আছে, যিনি তার দায়িত্ব পালন করেছিলেন? (সূরা নাজম : ৩৭) (তাফসীরে তাবারী : ১০ ও ১৭ : ৬০, নাওয়াদিরুল উসূল : ৪)

অনুরূপ মুসা (আ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যখন জাদুকররা ভেল্কিবাজি দেখাচ্ছিল তখন মুসা (আ) ভয় অনুভব করছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

قَالَا رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ اَنْ يَّفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَّطْغٰى. قَالَ لَا تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى.

তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আশঙ্কা করি, সে আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করবে অথবা সীমালংঘন করতে উদ্যত হবে। তিনি বললেন, তোমরা ভয় করো না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমি শুনি ও আমি দেখি। (সূরা ত্বহা : ৪৫-৪৬)

অথচ তিনি আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদবোধ করেননি। জাদুকরদের বিষয়টি তার কাছে ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তাই আল্লাহ তাআলা তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলেন,

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى.

আমি বললাম, ভয় করো না, তুমিই উপরে থাকবে। (সূরা ত্বহা : ৬৮)

বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানদের দুর্বলতা দেখে রাসূলুল্লাহ (স) দুআ করেছিলেন, হে আল্লাহ আপনি যদি এ ক্ষুদ্র দলটিকে ধ্বংস করে দেন তাহলে দুনিয়ার বুকে আপনার ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না। তখন আবু বকর (রা) নবীজি (স)-কে বলেছিলেন, আপনার প্রভু আপনার মিনতি শুনেছেন। আপনাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। (সহিহ মুসলিম : ১৭৬৩)

সুতরাং আবু বকর (রা)-এর স্তর ছিলো আল্লাহর ওয়াদার প্রতি আস্থার স্তর। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্তর ছিলো আল্লাহর শাস্তির প্রতি ভয়ের স্তর। এটি হলো সর্বোচ্চ স্তর। যিনি আল্লাহ তাআলার গোপন বিষয়াবলি সম্পর্কে সর্বাদিক অবগত তিনিই এ স্তরে উন্নীত। কোনো মানুষের পক্ষে আল্লাহ তাআলার গুণাবলির প্রকৃতি জানা সম্ভব নয়।

যে ব্যক্তি মারেফাতের নিগূঢ় তত্ত্ব, প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হয় সে অনুধাবন করতে পারে যে, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানের আলোকে জ্ঞানের বিস্তৃত এ গুপ্তভাণ্ডার আয়ত্ত করা সম্ভব নয়, তখন তার খওফ বা ভয় বিপুল হয়ে যায়। এজন্যই হযরত ঈসা (আ)-কে যখন বলা হলো,

ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَ اُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ، قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ، بِحَقٍّ، اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ، تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ.

আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারইয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ করো? তিনি বললেন, আপনিই পবিত্র! আমার জন্য সমীচীন নয় এমন কথা বলা, যা বলারই অধিকার আমার নেই। যদি আমি তা বলতাম তবে আপনি তো তা জানতেন। আমার অন্তরের কথা তো আপনি অবগত আছেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি অবগত নই। (সূরা মায়েদাহ : ১১৬)

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ.

আপনি যদি তাদের শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা। (সূরা মায়েদাহ : ১১৮) (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩০)

হযরত ঈসা (আ) তাঁর সব কাজ আল্লাহর ইচ্ছার উপর ন্যস্ত করে দিয়েছেন। নিজের আমলকে এর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক রেখেছেন। তিনি জানতেন, কোনো কিছুতেই আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই। যা কিছু হয় তাঁর ইশারাতেই হয়। তিনি উদাসীনতা ও অভ্যাস হতে পবিত্র। তাঁর ব্যাপারে অনুমান, ধারণা এবং হিসাব-নিকাশ চলে না। সুনিশ্চিত এবং ইয়াকিনীভাবে বলার প্রশ্নই আসে না।

এই বিষয়টি আরেফ তথা আল্লাহওয়ালাদের অন্তর ভেঙ্গে খানখান করে দেয়। কেননা, মহাপ্রলয় আল্লাহর ইচ্ছায়ই সংঘটিত হবে। তিনি জগদ্বাসীকে নিশ্চিহ্ন করতে পরওয়া করবেন না। তিনি যাকে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা ধ্বংস করেন। ইতঃপূর্বে বহু জাতিকে তিনি ধ্বংস করেছেন। তিনি জগদ্বাসীকে বিভিন্ন ধরণের দুঃখ কষ্ট, দুর্যোগ ও রোগ ব্যধিতে আক্রান্ত করে শাস্তি দিয়ে থাকেন। এমনকি তিনি মানুষকে আত্মিক ব্যাধি কুফরি-নিফাকিতে আক্রান্ত রেখে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়ে দেন এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী শাস্তির সম্মুখীন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰىهَا وَ لٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّيْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হেদায়াত দিতে পারতাম। কিন্তু আমার এ কথা স্থিরীকৃত যে, আমি নিশ্চয় জিন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সিজদাহ : ১৩)

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ.

আমি জিন ও মানুষ উভয়ের দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবই, আপনার প্রতিপালকের এ কথা পূর্ণ হবেই। (সূরা হুদ : ১১৯)

সুতরাং সে ব্যাপারে অবশ্যই ভয় করা উচিত, অনন্তকালে যার ফায়সালা হয়ে গেছে, তা খণ্ডানোর কোনো সুযোগ নেই। তবে সিদ্ধান্ত যদি তৎক্ষণাৎ হতো কিংবা ভবিষ্যতের উপর স্থির থাকতো তাহলেও হয়তো কোনো কৌশল অবলম্বন করা যেত?! কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত যেহেতু আযাল তথা অনন্তকালে সংঘটিত হয়েছে তাই মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যেসব ক্ষেত্রে শুধু কিছু আলামতের

মাধ্যমে ভাগ্যের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়, যেমন, যে লোকের জন্য অকল্যাণের উপকরণসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে তার মাঝে এবং কল্যাণের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে দুনিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। যেন ভাগ্যের অদৃষ্ট তার সামনে উন্মোচিত হয়েছে। অর্থাৎ, সে দুর্ভাগা হবে এটা তার ভাগ্যে লেখা ছিল। কারণ, যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে সেসব উপকরণ দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। পক্ষান্তরে কাউকে যদি কল্যাণের জন্য প্রস্তুত করা হয়, সে আত্মিকভাবে সম্পূর্ণরূপে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ অবস্থার দাবি হলো তার ভয় কম হবে। তবে শর্ত হলো সর্বদা এ হালতের উপর অটল থাকতে হবে। যদিও তা খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু শেষ পরিণতি এবং অন্তিম মুহূর্তের ভয়াবহতা তার মাঝে ভয়ের আগুন প্রজ্বলিত রাখে। এ আগুন নেভানোর কোনো সুযোগ নেই।

কীরূপে খওফ তথা ভয় মুক্ত থাকা যাবে, অথচ মুমিনের অন্তর রহমানের দুই আঙ্গুলের মধ্যখানে অবস্থিত! আর কলব ভাগ্যচক্রে প্রবলভাবে ঘুরতে থাকে। মুকাল্লিবুল কুলুব, ভাগ্য পরিবর্তনকারী সত্তা বলেন,

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُوْنٍ.

নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের আযাব থেকে নির্ভয় থাকা যায় না। (সূরা মাআরিজ : ২৮)

উপর্যুক্ত আলোচনার পরও যে নিজেকে নির্ভয় ভাববে সে বড় মূর্খ। কেননা আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করে আরেফ তথা আল্লাহওয়ালাদের অন্তরে রজা তথা আশার সঞ্চার না করলে ভয়ের আগুনে তাদের অন্তর পুড়ে যেতো। সুতরাং আশার উপায়সমূহ হলো আল্লাহর বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। আবার গাফলত ও উদাসীনতার উপকরণও সাধারণ মানুষের জন্য একদিক দিয়ে রহমতস্বরূপ। যদি গাফলতি দূর করে প্রকৃত বিষয় তাদের নিকট প্রকাশ করা হয় তাহলে সবাই হার্ট এ্যাটাক করবে। অন্তর পরিবর্তকারী সত্তার ভয়ে সকলের অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩০)

জনৈক আল্লাহওয়ালা বলেন, কেউ যদি পঞ্চাশ বছর যাবৎ আমার সঙ্গে একত্ববাদের বিশ্বাসের ওপর অবস্থান করে এরপর সে আমার থেকে পৃথক হয়ে একটি খামের আড়ালে গিয়ে মারা যায় তাহলে আমি

নিশ্চিতভাবে বলবো না সে তাওহিদের বিশ্বাস নিয়ে মারা গেছে। কারণ আমি জানি না মৃত্যুর সময় তার অন্তরের অবস্থা কীরূপ ছিল। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩২)

এক বুযুর্গ বলেন, আমাকে যদি এ ইচ্ছাধিকার দেওয়া হয় যে, যদি তুমি সদর দরজায় মারা যাও তাহলে শহিদী মৃত্যু লাভ করবে। আর ঘরের দরজায় মারা গেলে ইসলামের ওপর মৃত্যু লাভ করবে। বুযুর্গ বলেন, আমি ঘরের দরজায় মৃত্যু বরণ করা পছন্দ করবো। আমি জানি না, ঘরের দরজা থেকে সদর দরজা পর্যন্ত যেতে যেতে আমার মনে কোনো পরিবর্তন ঘটে যায় কি না। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৩৭)

সাহাল (র) বলেন, অন্তিম মুহূর্তে মন্দ পরিণতির ভয়ে সিদ্দীকিনগণ সদা সন্ত্রস্ত থাকতেন। তাদের আত্মিক অবস্থা বর্ণনা করে মহান আল্লাহ বলেন,

وَ قُلُوْبُهُمْ وَ جِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رٰجِعُوْنَ.

ভীত-কম্পিত হৃদয়ে এ বিশ্বাসে যে, তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবে। (সূরা মুমিনুন : ৬০) (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩২)

সুফিয়ান সাওরি (র)-এর মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তিনি ভয়ে কাঁদতে শুরু করেন। তাকে বলা হলো, হে আবু আবদুল্লাহ! আপনি ভয়ে আল্লাহর নিকট আশা পোষণ করুন। কারণ তাঁর ক্ষমা আপনার গুনাহ হতে বিশালতর। সুফিয়ান সাওরি (র) বললেন, আরে আমি কি আমার গুনাহের জন্য কাঁদছি? যদি জানতে পারতাম, আমার মৃত্যু হবে তাওহিদের বিশ্বাসের উপর তাহলে পাহাড়সম গুনাহ নিয়ে আমি আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে ভয় পেতাম না। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৩)

বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গ তার শিষ্যকে অসিয়ত করে বলেন, আমার মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তুমি আমার শিয়রে বসবে। যদি দেখ তাওহিদের ওপর মৃত্যু হয়েছে তাহলে আমার পুরো সম্পদ দিয়ে আখরোট এবং মিষ্টি কিনে শহরের শিশুদের মাঝে বিলিয়ে দিবে। বলবে, এটা মুক্তি পাওয়া এক ব্যক্তির উৎসবানুষ্ঠান। পক্ষান্তরে তাওহিদের ওপর আমার মৃত্যু না হলে লোকদের জানিয়ে দিবে তারা যেন আমার জানাযায় উপস্থিত হয়ে প্রতারিত না হয়। যারা আমাকে ভালোবাসে তারা যেন জেনে শুনেই জানাযায় উপস্থিত হয়। আমি চাই না মৃত্যুর পর আমার ভেতর

লৌকিকতা প্রবেশ করুক। শিষ্য বললেন, আপনার শেষ অবস্থা আমি কী করে জানব? তখন তিনি কিছু নিদর্শন বলে দেন। সে হিসেবে দেখা যায় তাওহিদের ওপর তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর শিষ্য আখরোট এবং মিষ্টি কিনে শিশুদের মাঝে বিলি করেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৩)

সাহল তস্তরি (র) বলেন, মুরিদ সবসময় গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ার ভয়ে থাকে আর আল্লাহওয়ালা আবেদ কুফুরিতে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে থাকেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৭)

আবু ইয়াযিদ (র) বলতেন, যখন আমি মসজিদের দিকে রওয়ানা হই, আমার মনে হয় আমার কোমরে কোনো বেল্ট বাঁধা আছে। আমার ভয় হয় বেল্ট ধরে টেনে আমাকে কোনো গির্জা কিংবা অগ্নিমণ্ডপে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে মসজিদে প্রবেশ করার পর কোমর থেকে বেল্টটি ছুটে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে গমনের সময় আমার এ অবস্থা থাকে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৭)

বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ) বলেন, হে আমার হাওয়ারীরা, তোমরা গুনাহের ভয় করো, আর আমরা নবীগণ কুফরির ভয় করি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৭)

আখবারে আম্বিয়া নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, একজন নবী কয়েক বছর ধরে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষুধা, উকুন এবং পোশাকের অভিযোগ করে আসছিলেন। তিনি পশমি পোশাক পরিধান করতেন। আল্লাহ তাআলা ওহির মাধ্যমে তাকে বললেন, বান্দা আমার! তুমি আমার নিকট দুনিয়া প্রার্থনা করছো। তুমি কি চাও না, আমি তোমার অন্তর কুফরমুক্ত রাখি? ওই নবী সঙ্গে সঙ্গে এক মুঠ মাটি নিয়ে মাথায় মেখে বললেন, অবশ্যই। আমি চাই আপনি কুফর হতে আমাকে রক্ষা করুন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৭)

আল্লাহওয়ালাগণ মজবুত ঈমান ও খালেস আমল সত্ত্বেও শেষ পরিণতি নিয়ে শঙ্কিত থাকতেন। সেখানে আমাদের মতো দুর্বলদের কেমন ভীত হওয়া দরকার?

কতিপয় কারণে শেষ পরিণতি অশুভ হয়। যেমন বিদআত, নিফাক এবং কবিরা গুনাহে এবং সব ধরণের গর্হিত কর্মকাণ্ড। এ জন্য সাহাবায়ে

কেরাম নিফাককে বড় বেশি ভয় করতেন। হাসান বসরী (র) বলতেন, যদি আমি কোনোদিন জানতে পারতাম আমি নিফাকমুক্ত তাহলে সে দিনটি হতো আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৪; সিফাতুল মুনাফিক : ৭৩)

সাহাবায়ে কেরাম যে নিফাকের ভয় করতেন তা ছিল মৌলিক ঈমানের পরিপন্থি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো ওই নিফাক যা ঈমানের সঙ্গে মিলিত হয়। তখন একজন মুসলিমকে বলা হয় মুনাফিক। এ নিফাকের অনেক নিদর্শন রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ خَالِصٌ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ... فِيهِ شُعْبَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

চারটি বৈশিষ্ট্য এমন আছে যা কারো মাঝে পাওয়া গেলে সে প্রকৃত মুনাফিক হবে। যদিও সে রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান দাবি করে। যদি কারো মাঝে (নিফাকের) কেবল একটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহলে তা পরিত্যাগ করা পর্যন্ত তার মধ্যে এক প্রকার নিফাক থাকবে। বৈশিষ্ট্য চারটি হলো, যখন কেউ কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ওয়াদা ভঙ্গ করে। আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে, বিবাদ হলে গালমন্দ করে।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে—

وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ.

যখন অঙ্গীকার করে বিশ্বাস ভঙ্গ করে। (সহিহ বুখারী : ৩৪ সহিহ মুসলিম : ৫৮)

সাহাবা এবং তাবেয়িগণ নিফাকের এমন এমন ব্যাখ্যা করেছেন। সিদ্দীকগণ ছাড়া যা থেকে বাঁচা অসম্ভব। হাসান বসরী (র) বলেন, গোপন এবং প্রকাশ্যের ভিন্নতা রয়েছে। যবান এবং অন্তরের ভিন্নতা রয়েছে এবং ভেতর ও বাহিরেরও ভিন্নতা রয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৬৭৯২, আস সমতু ওয়াআফাতুল লিসান : ৪৮৩)

কে এই নিফাক হতে মুক্ত!? বরং এসব মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। একে কেউ খারাপ মনে করে না। হাসান বসরী (র) যা বলেছেন তা নববী যুগের সন্নিকটে প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমাদের যুগে এটা ধারণাতীত।

হযরত হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে যে কথা বললে মানুষ মুনাফিক হয়ে যেত সে কথা আমি তোমাদের মুখে দিনে দশবার শুনতে পাই। (মুসনাদে আহমদ : ৫ : ৩৯০)

রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীগণ বলতেন, তোমরা এমন সব কাজ করো যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চেয়েও সূক্ষ্ম। (অর্থাৎ তুচ্ছ) অথচ রাসূলুল্লাহ (স)-এর যামানায় এসব কাজকে আমরা কবিরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করতাম। (মুসনাদে আহমদ : ৩ : ৩)

কেউ কেউ বলেন, নিফাকের আলামত হলো, অন্যের যে কাজ তুমি অপছন্দ করো সে কাজ নিজে করা, এবং অন্যায়কে পছন্দ করা ও হককে অপছন্দ করা। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৪)

কেউ কেউ বলেন, নিজের মাঝে নেই এমন গুণের প্রশংসা শুনে আনন্দিত হওয়াও এক প্রকার নেফাকি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৪)

এক লোক ইবনে ওমর (রা)-কে বলল, আমরা যখন শাসকবর্গের নিকট যাই, তাদের সব কথায় হ্যাঁ বলি। কিন্তু দরবার হতে বের হয়ে তাদের সমালোচনা করি। ইবনে ওমর বললেন, শোনো, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এ কাজকেও আমরা নেফাকি মনে করতাম। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৪, মুসাবিল আখলাক : ৩০২)

বর্ণিত আছে, ইবনে ওমর (রা) একবার এক লোককে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সমালোচনা করতে শুনে বললেন, হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সামনে কি তুমি এ কথা বলতে পারতে? লোকটি বলল, না। তিনি বললেন, নবীজি (স)-এর সময়ে এ জাতীয় কাজকে আমরা নিফাকের মধ্যে গণ্য করতাম। (আত তামহীদ ২৪ : ২৩, সহিহ বুখারী : ৭১৭৮)

বর্ণিত আছে, একদল লোক হযরত হুযাইফা (রা)-এর ঘরের দরজায় বসে তার অপেক্ষা করছিল। তারা তাঁর সম্পর্কে পরস্পর কথা বলছিল। এর মধ্যে তিনি ঘর থেকে বের হলেন। তাঁকে দেখে তারা লজ্জা পেয়ে চুপ হয়ে

যায়। তিনি বললেন, তোমরা যা বলছিলে তা আবার বলো। কিন্তু তারা নীরব থাকল। তখন হুযাইফা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে এ কাজকে আমরা নিফাক মনে করতাম। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৪)

হুযাইফা (রা) ছিলেন নিফাক এবং মুনাফিক সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। তিনি বলতেন, অন্তর জগতে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন অন্তর ঈমানে পরিপূর্ণ থাকে, সুঁইয়ের ছিদ্র পরিমান জায়গাও নিফাকের জন্য খালি থাকে না। কখনো এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন অন্তর নিফাক দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। ঈমানের জন্য সুঁইয়ের ছিদ্র পরিমাণ জায়গাও খালি থাকে না। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৪)

আরেফ তথা যারা আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী তাদের সবসময় জীবনের অন্তিম সময় অশুভ হওয়ার শঙ্কা থাকে। এর কারণ একাধিক, যা অন্তিম মুহূর্তের আগে সংঘটিত হয়। যেমন বিদআত, অহংকার, নিফাক ও নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ। এসব থেকে মানুষ নিরাপদ নয়। নিফাক একটি মারাত্মক পাপ। কেউ যদি নিজেকে মনে করে নিফাকমুক্ত তবে এটিও নিফাক। কেননা প্রসিদ্ধ বাণী রয়েছে, যে নিজেকে নিফাক থেকে নিরাপদ মনে করে সে-ও মুনাফিক। জনৈক মনীষী এক আরেফকে বললেন, আমি নিজের ব্যাপারে নিফাকের আশঙ্কা করি। তখন আরেফ বললেন, তুমি যদি মুনাফিক হতে তাহলে নিফাকের ভয় করতে না। মূলত আরেফের নজর সবসময় অতীত ও অন্তিমমুহূর্তের প্রতি থাকে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

العَبْدُ الْمُؤْمِنَ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ بَيْنَ أَجَلٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي مَا اللهُ صَانِعٌ فِيهِ، وَبَيْنَ أَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا اللهُ قَاضٍ فِيهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ وَلَا بَعْدَ الدُّنْيَا مِنْ دَارٍ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالنَّارُ.

অর্থাৎ, মুমিন বান্দা (জীবন নিয়ে) দুটি ভয়ের মাঝে অবস্থান করে।

১. যে সময় তার গত হয়েছে, আল্লাহ তাতে কী করবেন, তা সে জানে না।

২. আগামী দিনে, তাতে আল্লাহ কী ফায়সালা দেবেন, তা তার জানা নেই। সেই আল্লাহর শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, মৃত্যুর পর সন্তুষ্টি লাভের

কোন উপায় নেই এবং দুনিয়ার পরে জান্নাত অথবা জাহান্নাম ছাড়া কোন ঘর নেই। (কসরুল আমাল, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ১৯০, হাসান থেকে মুরসাল সূত্রে, শুআবুল ঈমান : ১০০৯৭, হাসান এবং কয়েক জন সাহাবী থেকে মারফূ সূত্রে, মুসনাদুল ফিরদাউস : ৪২৬১)

## নিকৃষ্ট অন্তিমকালের বর্ণনা

যারা আরেফ, তারা অন্তিমকাল খারাপ হওয়ার ভয় বেশি করে থাকেন। এখন মন্দ অন্তিম কাল সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন। অন্তিমকাল দুভাবে নিকৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটি অপরটির চেয়ে মারাত্মক। তা এই যে, মৃত্যুযন্ত্রণা প্রকাশ পাওয়ার সময় আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পর্কে সংশয় অথবা অস্বীকৃতি প্রবল হয়ে যাওয়া এবং এ অবস্থায়ই আত্মা নির্গত হওয়া। এ সন্দেহ ও অস্বীকৃতি আল্লাহ তাআলা ও বান্দার মধ্যে দূরত্বের কারণ হয়ে যায়। ফলে সে স্থায়ী দূরত্ব এবং চিরস্থায়ী শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার যা এর চেয়ে হালকা। তা হলো, মৃত্যুর সময় বান্দার মনে কোনো পার্থিব জিনিসের মহব্বত প্রবল হয়ে যাওয়া অথবা কোনো পার্থিব কামনা-বাসনা অন্তরকে এমনভাবে ঢেকে ফেলা, যাতে অন্য কোনো কিছুর অবকাশ না থাকে। এ ঢেকে নেয়ার ফলে বান্দার মুখমণ্ডল ও মস্তক দুনিয়ার দিকে ঘুরানো থাকবে। যখন মুখমণ্ডল আল্লাহর দিক থেকে ফিরে যাবে, তখন দূরত্ব সৃষ্টি হবে এবং শাস্তি নাযিল হবে। কেননা, আল্লাহ তাআলার প্রজ্বলিত অগ্নি শুধু আল্লাহর অন্তরালে অবস্থানকারীদেরকে স্পর্শ করবে। দুনিয়ার মহব্বত থেকে যে ঈমানদারের অন্তর মুক্ত আগুন তাকে বলবে, হে ঈমানদার! সামনে চলো। তোমার নূর আমার আগুনকে নিভিয়ে দিয়েছে। (মারফূ সূত্রে-তাবারানী কাবীর : ২২ : ২৫৮, আল কামেল, ইবনে আদী : ৬ : ২৯৪, তারীখে বাগদাদী : ৯ : ২৩১)

মোটকথা, দুনিয়ার মোহ প্রবল হওয়ার সময় আত্মা বের হলে তা ভয়ের বিষয়। কেননা মানুষ যেভাবে জীবন যাপন করে সে অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর স্বাভাবিক অবস্থার বাইরে আত্মার জন্য ভিন্ন কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। দৈহিক আমলের মাধ্যমে আত্মার পরিবর্তন ঘটে। আর মৃত্যুর মাধ্যমে অঙ্গ-প্রতঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়। ফলে আমলের পথ বন্ধ হয়ে

যায়। নতুন করে আমলের এবং দুনিয়ায় ফিরে এসে ক্ষতিপূরণের কোনো সুযোগ থাকে না। বাকী থাকে শুধু আফসোস ও পরিতাপ। তবে মূল ঈমান ও আল্লাহর ভালোবাসা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এজন্য এই দুঃখজনক অবস্থা স্থায়ী হবে না। যদি তার ঈমানের শক্তি সরিষা পরিমাণও হয়, তাহলে অবশ্যই সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। যদি আরও কম হয়, তাহলে অনেক দিন জাহান্নামে থাকতে হবে। আর যদি ঈমানের শক্তি শষ্য দানা পরিমাণ হয়, তাহলে হাজারো বছর পরে হলেও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার আশা রয়েছে।

কবরের আযাব যারা অস্বীকার করে, তারা বলতে পারে, উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, মৃত্যুর পরেই পাপীকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত এটা কেন দেরি হয়? উত্তর হচ্ছে, যারা কবরের আযাব অস্বীকার করে, তারা বিদআতি এবং তারা আল্লাহর নূর, কুরআনের নূর ও ঈমানের নূর থেকে মাহরূম। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের মতে এটাই বিশুদ্ধ কথা, সহীহ হাদিস থেকেও তাই প্রমাণিত। কবর জাহান্নামের গর্তসমূহের একটি গর্ত অথবা জান্নাতের বাগানসমূহের একটি বাগান। (সুনানে আবু দাউদ : ৪৭৫৩)

অতএব যদি মানুষের অন্তিম মুহূর্ত কল্যাণকর না হয় এবং হতভাগা হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তাহলে আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার সাথে সাথেই সে আযাবের উপযোগী হয়ে যায় এবং কবর থেকেই শাস্তি শুরু হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে তার কবরে জাহান্নামের ৭০টি দরজা খুলে যায়। সময়ভেদে আযাবের প্রকারও বিভিন্ন হয়ে থাকে। যেমন, কবরে রাখার পর মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়, এরপর শাস্তি হয়, তারপর হিসাব-নিকাশের জটিলতা এবং কিয়ামতে সকলের সামনে অপদস্থ হয়। (সহিহ বুখারী : ২৪৪১, সহিহ মুসলিম : ২৭৬৭;)

এরপর পুলসিরাতের ঝুঁকি, জাহান্নামের প্রহরীদের ভীতি রয়েছে, দুর্ভাগারা জাহান্নামের নানান প্রকারের শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে এবং সবধরণের শাস্তি ভোগ করবে। তবে আল্লাহ তাআলা যার উপর করুণা করবেন কেবল সেই রক্ষা পাবে। আর সমাহিত হওয়ার পর মাটি মানুষের অঙ্গ-প্রতঙ্গ খেয়ে ফেলবে এবং বিনষ্ট করে ফেলবে। কেবল ঈমানের জায়গা (কলব) বাকী থাকবে। হাশরের দিন ছিন্নভিন্ন হাড়গোড় একত্র করা হবে এবং

ঈমানের স্থান কলবে রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হবে। মৃত ব্যক্তি সৌভাগ্যবান হলে মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে পুনর্জীবন পর্যন্ত আরশের নিচে সবুজ পাখির আকৃতিতে ঝুলে থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগা হলে এর বিপরীত জাহান্নামে ঝুলতে থাকবে। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন।

প্রকাশ থাকে, জীবনের অন্তিমমুহূর্ত খারাপ হওয়ার কারণ দুটি বিষয়ে সীমিত। প্রথমত, পরিপূর্ণভাবে সংসার নির্লিপ্ততা ও যাবতীয় সৎ কার্যাবলি সম্পাদন করা সত্ত্বেও বিদআতি হওয়া। আর বিদআতের পরিণতি ভয়াবহ। বিদআতের অর্থ কোনো নির্দিষ্ট মাযহাব ও ধর্মমত অনুসরণ করা নয় ; বরং বিদআতের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণ ও কার্যাবলি সম্পর্কে কোনো অবান্তর বিশ্বাস পোষণ করা, নিজের ইচ্ছামতো অনুমান ও বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমে অথবা এমনি ধরনের অন্য কোনো মানুষের অনুসরণের মাধ্যমে। এ ধরনের বিদআতি মানুষের যখন মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হয়, তখন তার সামনে এ সত্য এমনিতেই উদঘাটিত হয়ে যায় যে, তার পূর্ববর্তী বিশ্বাস নিছক অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ছিল। এমতাবস্থায় সে শুধু এই বিশ্বাসটিকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না, বরং অন্যান্য বাস্তব ও বিশুদ্ধ আকীদাসমূহকেও বাতিল মনে করতে থাকে অথবা সেগুলো সম্পর্কে সন্দেহ করতে থাকে। যদি এ অবস্থায় তার আত্মা বের হয়ে যায়, তাহলে তার অন্তিম মুহূর্ত অশুভ হয় এবং সে শিরকের ওপর মৃত্যুবরণ করে। নিম্নে লিখিত আয়াতে এরূপ ব্যক্তিকেই বুঝানো হয়েছে,

وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ.

এবং তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি। (সূরা যুমার : ৪৭)

আল্লাহ এমন মৃত্যু থেকে হেফাযত করুন!

নিম্নের আয়াতদ্বয়ে এরকম ব্যক্তিদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে,

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا. اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

বলুন, আমি কি তোমাদের সংবাদ দেব আমলের ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তলোকদের সম্পর্কে? পার্থিবজীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়। যদিও তারা মনে করে, তারা সৎকর্মই করছে। (সূরা কাহফ : ১০৩-১০৪)

মূলত যারা আল্লাহ তাআলার সত্তা, গুণ ও কর্ম সম্পর্কে নিজের মতামতের মাধ্যমে অথবা অন্যের অনুকরণের মাধ্যমে কোনো অহেতুক বিশ্বাস পোষণ করে, তারা বিদআতি এবং তাদের জন্যে উপরিউক্ত বিপদাশঙ্কা রয়েছে। এই বিপদাশঙ্কা দূর করতে সংসার অনাসক্তি ও সৎ কাজ যথেষ্ট নয়। বরং প্রকৃত সত্য বিশ্বাস ব্যতীত এ থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। সরল মানুষ, যারা আল্লাহ, রাসূল ও পরকালে ঈমান রাখে এবং এর ওপরই দৃঢ় থাকে, কোনোরূপ তর্ক-বিতর্কের কাছে যায় না তারা এই বিপদাশঙ্কা থেকে দূরে রয়েছে। এরূপ লোকদের সম্পর্কেই হাদিসে বলা হয়েছে,

اَكْثَرُ اَهْلِ الْجَنَّةِ الْبُلْهُ.

অর্থাৎ, অধিকাংশ বেহেশতী সরল ও সাদাসিধে। (শরহু মুশকিলি আসার, তাহাবী : ৭ : ৪৩১, আল কামেল ইবনে আদী : ৩ : ৩১৩, মুসনাদুশ শিহাব কাযায়ী : ৯৮৯, বাইহাকী, শুআবুল ঈমান : ১৩০৪)

এ কারণেই সালফে সালেহীন আকাইদ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক ও অনুসন্ধান করতে বারণ করেছেন। একথাই তারা সাধারণ মানুষকে বলতেন যে, আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয় অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং বাহ্যিক শব্দাবলি থেকে যা বুঝে আসে, তাকে সঠিক মনে করতে হবে। কারণ, সিফাত সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত দুষ্কর এবং এ পথ খুবই দুর্গম। তা অনুধাবনে বিবেক বুদ্ধি অচল। আর দুনিয়ার মুহব্বত অন্তরকে আল্লাহর হেদায়েতের নূর হতে অবারিত করে রেখেছে। গবেষকরা যুক্তির আলোকে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে যেসব আলোচনা করেছেন তা সংঘাতপূর্ণ। আর মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি দুনিয়াপ্রীতি, দুনিয়া নির্ভরতা, এবং এর কামনা-বাসনায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাদের চিন্তা-ভাবনা একে ঘিরেই কেন্দ্রিভূত হয়। সুতরাং অবস্থা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে মানুষের জন্য আপন আপন মত অনুযায়ী কথা বলার পথ খুলে দেয়। তাছাড়া মানুষের স্বভাব প্রকৃতি এবং মানসিকতায় রয়েছে ভিন্নতা ও বৈপরিত্য। মূর্খরা নিজেদের দাবিকে পূর্ণ পেতে এবং সত্যকে নিজেদের মত করে পেতে সদা আগ্রহী থাকে। তাই তারা যা ভাবে তা-ই ব্যক্ত করে। যা শুনে তা-ই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। ধীরে ধীরে এই বিশ্বাসের সঙ্গে সখ্যতা হতে হতে এক পর্যায়ে তা মজবুতভাবে মন-মস্তিষ্কে বসে যায়। তখন ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের নাগপাশ হতে মুক্তির দ্বার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে যায়।

অতএব মুমিনদের নিরাপত্তার একমাত্র পথ হলো নিজেকে নেক আমলে ব্যস্ত রাখা এবং নিজের স্বাধ্যের বাইরের বিষয়ে কথা না বলা। আজ সবকিছু লাগামহীন। চারদিকে অনর্থক অর্থহীন ক্রিয়াকলাপের সয়লাব। জাহেল, মূর্খরা যা তাদের মনমতো হয় তাকেই তারা ইলম বলে বিশ্বাস করে। খাঁটি ঈমান মনে করে। যে ধারণা ও কল্পনায় তারা সন্তুষ্ট হয় তাকেই ভাবে ইলমে ইয়াকীন এবং আইনে ইয়াকীন। হায়! কিছুকাল পরেই তারা তাদের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত হবে।

কবি হয়তো এদের সম্পর্কেই বলেছিলেন,

أَحْسَنْتَ ظَنَّكَ بِالْأَيَّامِ إِذَا حَسُنَتْ وَلَمْ تَخَفْ سُوْءَ مَا يَأْتِيْ بِهِ الْقَدَرُ.

وَسَالَمَتْكَ اللَّيَالِيْ فَاغْتَرَرْتَ بِهَا وَعِنْدَ صَفْوِ اللَّيَالِيْ يَحْدُثُ الْكَدَرُ.

আজ তুমি তোমার ভাবনাকে ভালো মনে করছ, অথচ তাকদীরে কী মন্দ পরিণতি রয়েছে তার ভয় করছো না।

রাতকে নিরাপদ ভেবেই তুমি প্রতারিত হয়েছ। অথচ গভীর রাতেই বিপদ ঘটে।

নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুন, যারা আল্লাহ, রাসূল এবং আসমানী গ্রন্থসমূহের উপর খাঁটি ঈমান না এনে আল্লাহর সিফাত নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হয় তারা ভয়াবহ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। তাদের দৃষ্টান্ত হলো ওই ব্যক্তির ন্যায়, উত্তাল সমুদ্রে যার নৌকা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়েছে। আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকার মতো কোনো কিছুই তার কাছে নেই। পাহাড়সম ঢেউ তাকে এদিক সেদিক ছুঁড়ে ফেলছে। এ সময় তীরে পৌঁছা তার জন্য ভাগ্যের ব্যাপার। বরং মারা পড়াই স্বাভাবিক।

সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব ও স্রষ্টার বৈশিষ্টের পেছনে পড়া চরম মূর্খতা। এছাড়া যারা যুক্তিতর্কের আলোকে স্রষ্টার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলে এবং অন্যরা তাদের কথা শোনে আকীদা শেখে। তো শ্রোতাদের দু অবস্থা। হয়তো তারা দলিল প্রমাণের সাথে আকীদা শিখে কিংবা দলিল প্রমাণ ছাড়াই শেখে। যারা দলিল ছাড়া আকীদা শিখে তারা যদি আকীদা বিষয়ে সন্দিহান হয় তাহলে তাদের দীন ফাসেদ হয়ে যাবে। তবে মজবুতির সঙ্গে দলিল আঁকড়ে থাকলে আল্লাহর শাস্তি হতে নিরাপদ থাকবে, কিন্তু অসম্পূর্ণ আকলের কারণে প্রতারিত হবে।

সুতরাং সাধারণ মানুষ জাহান্নামের ভয় এবং আল্লাহর হুকুম পালনে নিজেদের নিরত রাখলে এবং অহেতুক বিতর্কে না জড়ালে তারা এ ভয়াবহ ঝুঁকি হতে নিরাপদ থাকবে।

জীবনের শেষ মুহূর্ত অশুভ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, ঈমানের দুর্বলতা এবং অত্যধিক দুনিয়ার প্রীতি। ঈমান দুর্বল হলে আল্লাহর মহব্বতও দুর্বল হয় এবং দুনিয়াবি মোহ শক্তিশালী হয়। তা এতদূর পৌঁছে যে, অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বতের জন্য কোনো জায়গা বাকি থাকে না, মুহাব্বতের কল্পনা থেকে যায় মাত্র। এমতাবস্থায় মানুষ নফসের অনুসরণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে অন্তর কঠিন ও কালো হয়ে যায়। এরপর অব্যাহত গুনাহের কারণে অন্তরে মরিচা ধরে যায় এবং ক্রমান্বয়ে অন্তরে ঈমানের যে নূর রয়েছে, তা নিভিয়ে দিতে থাকে। এই অবস্থায় মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হলে আল্লাহর ভালোবাসা আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ তখন মনে হতে থাকে, সর্বাধিক প্রিয় জিনিসের বিরহের সময় মনে হয় চলে এসেছে। এই বিরহের কারণে অন্তর নিদারুণভাবে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত মৃত্যুকে অপ্রিয় মনে করে ও অস্বীকার করে। মৃত্যুর আগমন ও প্রিয় জিনিসের বিচ্ছেদের কারণে অন্তরে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। যদি ঘটনাচক্রে এই বিদ্বেষ অবস্থানকালীন রূহ দেহ ছেড়ে চলে যায়, তাহলে জীবনের শেষমুহূর্ত অশুভ হওয়া সুনিশ্চিত। এ থেকে জানা যায়, যে লোক তার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বতের চেয়ে আল্লাহর মহব্বত প্রবল দেখে, সে এই বিপদাশঙ্কা থেকে দূরে থাকে। কিন্তু দুনিয়ার মোহ প্রতিটি গুনাহর মূল। এটাই দূরারোগ্য রোগ। সকল মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। কারণ, তারা আল্লাহকে কম চিনে। যে চিনে সে তাঁকে অবশ্যই মহব্বত করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ِاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ.

আপনি বলুন, তোমাদের পিতৃবর্গ, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভ্রাতাগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের আত্মীয়স্বজন, তোমাদের অর্জিত

সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের পছন্দনীয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। (সূরা তাওবা : ২৪)

সুতরাং স্ত্রী-পুত্র ও ধনসম্পদের মত প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদের কারণে যে লোকের নিকট আল্লাহর দেওয়া মৃত্যু খারাপ মনে হতে থাকে আর এমনি সময়ে তার রূহ বের হয়ে যায়, তখনকার বিষয়টি সেই পলাতক গোলামের মতো যে তার মনিবের প্রতি হিংসাবশত পলায়ন করে। এরপর জোরজবরদস্তি পাকড়াও করে মনিবের সামনে নিয়ে আসা হয়। মনিবের হাতে এই গোলামের যে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অপরদিকে যে ব্যক্তির ইন্তেকাল আল্লাহর ভালোবাসার ওপর হয়, সে সেই অনুগত গোলামের মত আল্লাহর সামনে আসে, যে পরম আগ্রহের সাথে প্রভুর দর্শন লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম ও ভ্রমণের বিপদাপদ সহ্য করে প্রভুর নিকট হাজির হয়। এই গোলাম দরবারে যাওয়া মাত্রই যে আদর-যত্ন ও আপ্যায়ন লাভ করবে, তা কল্পনাতীত।

## অন্তিমমুহূর্তে অশুভ পরিণতির কারণ

এ কারণটি প্রথম কারণ অর্থাৎ, সন্দেহ এবং অস্বীকারের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করার তুলনায় খুবই হালকা, এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়ার কারণ নয়। এ খাতেমার দুটি কারণ। ১. গুনাহের আধিক্য যদিও ঈমান মজবুত হয়। ২. ঈমানের দুর্বলতা যদিও গুনাহ কম হয়।

প্রথম প্রকারের ব্যাখ্যা হলো, মানুষের মাঝে প্রবৃত্তি যখন প্রবল হয় এবং অভ্যাসের কারণে রিপুর বাসনা অন্তরে বসে যায় তখন গুনাহও বেড়ে যায়। মানুষ জীবনভর যে কাজে অভ্যস্ত থাকে মৃত্যুর সময় তাই তার মনে উপস্থিত থাকে। যে গোটা জীবন আল্লাহর অনুগত থাকে মৃত্যুর সময়ও সে আল্লাহমুখী থাকে। তাঁকে স্মরণ করে। তাঁর স্মরণে তৎপর হয়। যার ঝোঁক গুনাহের দিকে ছিল মৃত্যুর সময় তার অন্তরে গুনাহের ঝোঁক প্রবল থাকে। এমনও হতে পারে ওই অবস্থায় তার রূহ কবজ করা হয়।

এভাবে সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যায়। তবে যে ব্যক্তি মাঝে মধ্যে গুনাহ করে সেও ওই পবিত্র সত্তা হতে দূরে সরে যায়। কিন্তু নিষ্পাপ ব্যক্তি

সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ও ঝুঁকি মুক্ত। যার ওপর গুনাহ প্রবল। নেককাজও বেশি করে এবং অধিক নেককাজে আনন্দিত হয় এ ব্যক্তির ক্ষেত্রেও অন্তিম মুহূর্তে অশুভ পরিণতির ঝুঁকি রয়েছে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। এর প্রকৃষ্ট নমুনা হলো স্বপ্নে দেখা বিভিন্ন ঘটনা। সাধারণ স্বপ্নে আমরা তা-ই দেখি, যে পরিবেশ পরিস্থিতির মাঝ দিয়ে আমরা জীবন অতিবাহিত করি। যেমন ফকিহ যিনি সদা ফিকহি মাসআলা সমাধানে ব্যস্ত থাকেন, তিনি স্বপ্নে নিজেকে আলেম ওলামার সঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত দেখেন। ব্যবসায়ী স্বপ্নে নিজেকে লেনদেন ও কারবার করতে। ফকিহের ইলমী আলোচনা ব্যবসায়ী হতে বেশি, ব্যবসায়ী কারবার ফকিহ হতে বেশি দেখবে। কারণ যে কাজে মন সদা ব্যস্ত থাকে ঘুমের মধ্যে মন তাই ভাবতে থাকে। আর মৃত্যু ঘুমের অনুরূপ; বরং তার চেয়ে বড়। তবে মৃত্যু-যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর পূর্বের সংজ্ঞাহীনতা ঘুমের মতই।

সুতরাং ফলাফল এই দাঁড়ালো যে, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা যা করি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নরূপে আমরা তাই অবলোকন করি। তেমনি গোটাজীবন যে কাজে ব্যায় করবো অন্তিমমুহূর্তে তাই আমাদের সামনে চিত্রিত হবে। পাপী বান্দা পাপের কথাই স্মরণ করবে। নেকবান্দা কেন কাজের কথা স্মরণ করবে। তদ্রূপ পাপাচারী ও নেককারদের স্বপ্নের পার্থক্য হয়ে থাকে। মোটকথা যে কাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেশি হয় অন্তরে তার চিত্র অঙ্কিত হয়ে যায় এবং অন্তর সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। এ অবস্থায় রূহ কবজ করা হলে তা হবে অন্তিমমুহূর্তে অশুভ পরিণতির কারণ। যদিও তখন ঈমান বহাল থাকে এবং এর মাধ্যমে মুক্তির আশা থাকে।

উল্লেখ্য, জাগ্রত অবস্থায় আমরা যা মনে করি বা স্মরণ করি তার কোনো না কোনো কারণ থাকে। তেমনি স্বপ্নে যা দেখি তারও অনেক কারণ থাকে। যা আল্লাহর ইলম রয়েছে তার কিছু জানা যায় এবং কিছু জানা যায় না। যেমন আমরা জানি যে, মানুষের ভাবনা ও কল্পনা একটি বস্তু হতে অনুরূপ, বিপরীত কিংবা সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে স্থানান্তরিত হয়। সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার উদাহরণ, একটি সুন্দর মানুষ দেখে আরেকটি সুন্দর মানুষের কথা মনে পড়ে।

বিপরীত হওয়ার উদাহরণ, কেউ একটি ঘোড়াকে তার মালিকের সঙ্গে দেখল। এরপর ঘোড়া দেখে শুধু মালিকের কথা মনে পড়ে।

কখনো কখনো কল্পনা এক বস্তু হতে ভিন্ন বস্তুতে স্থানান্তর হয়। উভয়ের মাঝে কোনো মিল পাওয়া যায় না। কখনো এমন হয় যে, এক চিন্তার সূত্র ধরে অনেক চিন্তা বা কল্পনা আসে। যেমন প্রথম কল্পনা হতে দ্বিতীয় কল্পনা, এরপর তৃতীয় কল্পনা আসে। দ্বিতীয় কল্পনার কথা মনে থাকে না এবং প্রথম ও তৃতীয় কল্পনার মধ্যে কোনো মিলও থাকে না। স্বপ্নে যেসব বিক্ষিপ্ত চিত্র ভেসে ওঠে যার একটির সঙ্গে অপরটির কোনো না কোনো সূত্র থাকে বা থাকে না। যা সে ভাবতো বা কল্পনা করতো তাই সে প্রত্যক্ষ করে। যে ব্যক্তি আপন চিন্তা-চেতনাকে গুনাহ এবং প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রাখতে চায় এবং আত্মাকে রিপুর তাড়না হতে পরিচ্ছন্ন রাখতে চায় তার জন্য গোটা জীবন মেহনত মুজাহাদার বিকল্প কোনো পথ নেই। এটি মানুষের ক্ষমতাধীন। কেউ জীবনভর ভালো কাজ করলে এবং মন-মানসিকতা অকল্যাণ হতে মুক্ত রাখলে জীবনের শেষ মুহূর্তে তা হবে তার জন্য একটি সঞ্চয় ও অনন্ত যাত্রার পাথেয়। কেননা মানুষ যেভাবে জীবনধারণ করে সেভাবেই মৃত্যুবরণ করে। আর যেভাবে মারা যায় হাশরে সেভাবেই পুনরুত্থিত হয়।

বর্ণিত আছে, এক সবজি বিক্রেতাকে মৃত্যুর সময় কালেমায়ে শাহাদাতের তালকীন করা হচ্ছিল। কিন্তু সে বলছিল ৪, ৫, ৬। অর্থাৎ সারাজীবন চার পাঁচ টাকার হিসাবে সে নফসকে ব্যস্ত রেখেছিল তাই মৃত্যুর সময়ও তার মুখ দিয়ে হিসাব বের হচ্ছে।

জনৈক আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ বলেন, আরশ হলো একটি মুক্তা। তাতে নূর ঝলমল করে। বান্দা যে অবস্থায় থাকে ওই অবস্থার চিত্র আরশে অঙ্কিত হয়ে যায়। মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় পর্দা উঠিয়ে নেওয়া হলে আরশের পর্দায় তার কর্মের ছবি দেখতে পায়। কখনো এমন হতে পারে যে সে নিজেকে গুনাহের অবস্থায় দেখবে। তদ্রূপ কেয়ামতের দিন বান্দার সামনে থেকে আরশের পর্দা সরিয়ে দেওয়া হবে। তখন বান্দা আপন কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আপন অপরাধ দেখে লজ্জা এবং ভয় তাকে আঁকড়ে ধরবে। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৩, কিছুটা পরিবর্তিত)

বুযুর্গ যা বলেছেন সত্য বলেছেন। কারণ সত্য স্বপ্ন লওহে মাহফূজ অধ্যয়ন করে ভবিষ্যত অনুধাবন করে। আর সত্য স্বপ্ন হলো নবুওয়াতের ৪৫ ভাগের এক ভাগ। (হযরত আনাস (রা) থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত, সহিহ বুখারী : ২৭৮৩, সহিহ মুসলিম : ২২৬৪)

জানা গেল, শেষ মুহূর্তে অশুভ পরিণতি সাধারণত অন্তরের অবস্থা এবং চিন্তা-চেতনা অনুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু অন্তর পরিবর্তনকারী সত্তা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাই অশুভ খাতেমার জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বান্দার ইচ্ছাধীন নয়, যদিও দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কিছুটা প্রভাব থেকে যায়। এ জন্য আরেফ তথা আল্লাহওয়ালাগণ মন্দ খাতেমাকে ভীষণ ভয় করেন। কেননা কোনো মানুষ যদি ইচ্ছে করে যে, নেককারদের অবস্থা এবং নেক আমল ও ইবাদতের পরিণতি স্বপ্নে দেখবে... তা তার জন্য কঠিন হয়ে যাবে। যদিও নেককাজের আধিক্য এবং চিরাচরিত অভ্যাস স্বপ্নে প্রভাব রাখে। অধিকন্তু বিক্ষিপ্ত ভাবনা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। যদিও স্বপ্নে তা-ই দেখা যায় যেসব কাজ প্রবল হয়ে থাকে বা বেশি বেশি করা ও ভাবা হয়।

এমনকি আমি আমার শায়েখ আবু আলী ফারমিদী (র)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মুরিদের উচিৎ শায়েখের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। মুরশিদের নসিহত তর্কের খেয়ালে অন্তরে কিংবা যবানেও উচ্চারণ না করা। আবু আলী ফারমিদী (র) আরও বলেন, একবার আমি আমার শায়েখ আবুল কাসেম কুরকানী (র)-এর নিকট একটি স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলাম। আমি স্বপ্নে দেখলাম আপনি আমাকে একটি কথা বলেছেন। তখন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেন এ কথা বললেন? ফারমিদী বলেন, আমার কথা শুনে শায়েখ আমার সঙ্গে একমাস যাবত কথা বলেননি। তিনি আমাকে বললেন, আমার কথা তুমি মনে মনে অস্বীকার করেছিলে তাই ঘুমে তোমার মুখে সেই প্রশ্ন চলে এসেছে।

শায়েখ সত্য বলেছেন, কারণ জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যে কাজ বেশি করে স্বপ্নে তা-ই দেখে থাকে।

দীর্ঘ আলোচনার পর বোঝা গেলো ঈমানের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস বের না হলে গোটা জীবনের আমল বরবাদ। গুনাহের অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেয়ে ঈমান নিরাপদ রাখা বড় চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার। এ জন্য মুতাররিফ বিন আবদুল্লাহ বলেন, যারা ধ্বংস হয়েছে, কীভাবে ধ্বংস হয়েছে সেটা ভেবে আমি চিন্তিত হই না বরং যারা নাজাত পেয়েছে তারা কীভাবে নাজাত পেলো তা ভেবে চিন্তিত হই? (কূতুল কুলূব, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৪১, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ৭১)

হামেদ আল লাফফাফ বলেন, কোনো মুমিন বান্দা দীন ইসলামের উপর ইন্তেকাল করার পর ফেরেশতারা যখন তার রূহ নিয়ে উর্ধ্বাকাশে গমন করে তখন অন্যান্য ফেরেশতারা অবাক হয়ে বলে, এই লোক দুনিয়া থেকে কীভাবে নাজাত পেল, যেখানে আমাদের নিষ্পাপ ফেরেশতারা ফেঁসে গেছে? (এখানে হারুত ও মারুত ফেরেশতা উদ্দেশ্য।) (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৪১)

সুফিয়ান সাওরি (র) একদিন কাঁদছিলেন। তাঁকে বলা হলো, কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, এতদিন গুনাহের জন্য কেঁদেছি। এখন কাঁদছি ইসলামের জন্য। অর্থাৎ জানি না ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করতে পারবো কি না?

মোটকথা, ঝড়ো হাওয়ায় তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ উত্তাল সমুদ্রে যে জাহাজ রয়েছে, ঝড়ের কবল থেকে মুক্ত হয়ে তীরে ফিরে আসা তার জন্য কঠিন ও দুঃসাধ্য। তদ্রূপ মুমিনের অন্তর জাহাজের চেয়েও বেশি দোদুল্যমান। মনের কল্পনার ঢেউ সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ হতে বড় বেশি উত্তাল। মৃত্যুর সময় ভয়ের কারণ হলো, অন্তরের হাল পরিবর্তন হয়ে যাওয়া। এ সম্পর্কে নবীজি (স) বলেন, মানুষ পঞ্চাশ বছর জান্নাতবাসীর আমল করে। ফলে তার মাঝে এবং জান্নাতের মাঝে সামান্য দূরত্ব থাকে। কিন্তু তাকদীরে যা লেখা ছিল সে অবস্থার উপরই তার খাতেমা বা মৃত্যু হয়। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৬, সহিহ মুসলিম : ২৬৫১, আওসাতে তাবরানী : ২৪৬৯, অনুরূপ হযরত আবু হুরাইরা হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত আছে)

সাহল তস্তরী (র) বলেন, আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। আমার সঙ্গে তিনশতজন নবীর সাক্ষাৎ হয়েছে। তাঁদের আমি জিজ্ঞেস করেছি, দুনিয়াতে আপনারা যেসব বিষয়ের ভয় করতেন তার মধ্যে ভয়ংকর ছিল কোনটি? তাঁরা বলেছেন, অন্তিম মুহূর্তে অশুভ পরিণতি। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৯)

এই বিরাট ঝুঁকির কারণে শহিদী মৃত্যু ঈর্ষণীয়; হঠাৎ মৃত্যু অপছন্দনীয়।

হঠাৎ মৃত্যু অপছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল, মন মস্তিষ্ক গুনাহে আচ্ছন্ন, এমতাবস্থায় মৃত্যু এসে পড়ার অর্থ হল মন্দ খাতেমা বরণ করা।

আর শাহাদাত পছন্দনীয় হওয়ার কারণ হল, এমন সময় রূহ কবজ করা হয় যখন রূহ একমাত্র আল্লাহর মুহাব্বতে ভরপুর থাকে। দুনিয়া, স্বজন

পরিজন এবং সম্পদের মোহ হতে অন্তর সম্পূর্ণ পরিচ্ছন্ন থাকে। মুজাহিদ শত্রুর সামনে অবতীর্ণ হয়ে বুকভরা আল্লাহর ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টির প্রত্যাশা এবং প্রাণের বিনিময়ে জান্নাতের লেনদেন করে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন; বিনিময়ে তাদের জন্য আছে জান্নাত। (সূরা তাওবাহ : ১১১)

বিক্রেতা সর্বদা বিনিময়ের প্রত্যাশী থাকে। পণ্যের ভালোবাসা বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে বের হয়ে যায় এবং বিনিময়ের ভালোবাসা সেখানে স্থান দখল করে নেয়। অনেক সময় শহিদী তামান্না অন্তরে প্রবল হয় কিন্তু তা প্রাণ বিসর্জনের কারণ হয় না। কিন্তু জিহাদের ময়দান সরাসরি প্রাণ বিসর্জনের কারণ হয়। তবে এই ফযিলত কেবল তার জন্য যার মাঝে বীরত্ব, খ্যাতির মোহ, গনিমতের লোভ থাকবে না। অন্যথায় শহিদ হয়েও সে এ ফযিলত লাভ না করে শাস্তি ভোগ করবে। এমনটা হাদিসেই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আবু মুসা আশআরী (র) হতে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবীজি (স)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, একজন লড়াই করে গণিমতের জন্য, একজন লড়াই করে খ্যাতির জন্য এবং একজন মর্যাদা লাভের জন্য, তাহলে কে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা উঁচু করার জন্য লড়াই করে সেই আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে। (সহিহ বুখারি : ২৮১০, সহিহ মুসলিম : ১৯০৪)

মন্দ পরিণতির অর্থ এবং তার ভয়াবহতা যদি আপনি উপলব্ধি করে থাকেন তাহলে তা থেকে বাঁচার জন্য প্রস্তুতি নিন। আল্লাহ তাআলার যিকিরে মনোনিবেশ করুন। মন থেকে দুনিয়ার ভালোবাসা বের করে দিন। অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে আর নিজের অন্তরকে গুনাহের চিন্তা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

এমনটা ভাববেন না যে মৃত্যু এলেই প্রস্তুতি নিবেন। কারণ প্রতিটি শ্বাসই আপনার শেষ শ্বাস। যে কোনো সময় আপনার শ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। হয়তো দেখা গেল আপনি এক মুহূর্তের জন্য উদাসীন হলেন সেসময়ই আপনার মৃত্যু এসে গেল।

ঘুমানোর সময় পবিত্রতার সঙ্গে ঘুমাবেন। ঘুমের মধ্যেও মনে যেন আল্লাহর যিকির চালু থাকে সেদিকে লক্ষ রাখুন। মনে রাখবেন, ঘুমের আগে মনে যা থাকে ঘুমের মধ্যে তাই মনে থাকে। আবার ঘুমে যা মনে থাকে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তা-ই মনে থাকে। মৃত্যু আর পুনরুত্থান হলো ঘুম আর সজাগ হওয়ার মতোই। মৃত্যু আর মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান তেমনই হবে যেমনটা ঘুম আর ঘুম থেকে সজাগ হওয়ার পর হয়ে থাকে।

ঘুম আর মৃত্যুর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, এক মুহূর্তের জন্যও উদাসীন হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যদি হয়ে থাকেন তবে আপনার জন্য ভীষণ বিপদ অপেক্ষা করছে। কারণ জ্ঞানীরা ছাড়া সাধারণ মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত। আবার জ্ঞানীদের মধ্যে তারাই বেঁচে যাবে যারা আমল করে। আবার যারা আমল করে তাদের মধ্যে কেবল একনিষ্ঠভাবে আমলকারীরাই বেঁচে যাবে। আর একনিষ্ঠভাবে আমলকারীরা ভয়াবহ বিপদে আছে।

মনে রাখবেন, দুনিয়ায় আপনার যতটুকু প্রয়োজন এর উপর তুষ্ট না হলে মুজাহাদা আপনার জন্য সহজতর হবে না। আপনার প্রয়োজন হলো, খাবার, পোশাক এবং আবাস, এছাড়া সব অতিরিক্ত।

## প্রয়োজনমাফিক খাবার

সাধনার জন্য এতটুকু খাবারই যথেষ্ট যা কোমর সোজা রাখবে এবং নিঃশ্বাস বাকি রাখবে। সাধকের খাবার হবে নিরুপায় ব্যক্তির খাবারের মতো। ফলে প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের প্রয়োজন কম হবে। খাদ্যগ্রহণ এবং প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্য হলো ইবাদতে শক্তি অর্জন করা। আর খাদ্যগ্রহণে তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখার দ্বারা এ উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হবে।

১. সময়, ২. পরিমাণ, এবং ৩. প্রকার।

**সময় :** দিন রাতে ন্যূনতম একবেলা আহারগ্রহণ যথেষ্ট। অধিকাংশ সময় রোযার পাবন্দি করবেন।

**পরিমাণ :** তিন পেটের এক পেটের বেশি খাবেন না। অর্থাৎ, একভাগ খাবার, একভাগ পানি, একভাগ নিঃশ্বাস গ্রহণের জন্য খালি রাখবেন।

**প্রকার :** কখনোই সুস্বাদু খাবার খুঁজবেন না; বরং যা সামনে আসবে তাই গ্রহণ করবেন।

এই তিনটি বিষয়ে যত্নবান হলে রিপু থেকে আপনি মুক্ত থাকবেন এবং সন্দেহপূর্ণ খাদ্য বর্জনে এবং হালাল খাদ্যগ্রহণে সক্ষম হবেন। আর হালাল খাদ্য মানুষকে সম্মানিত করে এবং প্রবৃত্তিকে ধ্বংস করে।

## পোশাকের প্রয়োজন

পোশাকের উদ্দেশ্য হলো শীত-গরম হতে বাঁচা এবং সতর ঢেকে রাখা। এরচেয়ে বেশি হলে তা হবে প্রয়োজনাতিরিক্ত। অন্যথায় বাড়তি উপার্জনের পেছনে কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায়। হারাম ও সন্দেহপূর্ণ অর্থের প্রতি লিপ্সা তৈরি হয়। চাহিদা বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, মাটি ছাড়া পেট ভরে না।

## আবাসের প্রয়োজন

বসবাসের উদ্দেশ্য যদি আপনার জানা থাকে তাহলে আকাশ আপনার ছাদ, জমিন আপনার বিছানা হতে পারে। গরম কিংবা শীত অনুভব করলে আল্লাহর ঘর মসজিদ তো আছেই। তবে আপনি নিজের জন্য কোনো ঘরের প্রয়োজন মনে করলে এ জন্য দীর্ঘ সময় দরকার। আপনার জীবনের সিংহভাগ এর পেছনে চলে যাবে।

এভাবে আপনার প্রতিটি প্রয়োজন দাবিয়ে রাখতে পারলে আল্লাহর জন্য নিজেকে উজাড় করতে পারবেন, আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন এবং শেষযাত্রার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন। কিন্তু প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করলে আপনি আকাঙ্ক্ষার পাহাড়ে চড়ে বসবেন। দুঃখ দুর্দশা, দুশ্চিন্তা আপনাকে ঘিরে ধরবে। আপনি ধ্বংস হয়ে গেলেও আল্লাহ তাআলা পরওয়া করবেন না।

সুতরাং এই সমস্ত উপদেশ মেনে চলুন। আপনাকে উপদেশ দিচ্ছি তবে এই উপদেশ আমারই অধিক প্রয়োজন। এই সংক্ষিপ্ত জীবনে কাজ করতে হয় অনেক। সতর্ক থাকতে হয় অনেক বেশি। এক দুদিন আপনি তা

প্রতিহত করলেন কিন্তু আপনার উদাসিনতা একদিন হুট করেই সুযোগ পেয়ে যাবে। যার আপসোস আর আক্ষেপ কখনো শেষ হবে না।

পূর্বোল্লেখিত নির্দেশনা যদি ভয়ের দুর্বলতার কারণে মান্য করা আপনার পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে শেষ পরিণতির ভয়াবহতাই আপনার জন্য যথেষ্ট। আমরা আপনার সামনে খওফকারীদের অবস্থা আলোচনা করছি। আশা করা যায় এর মাধ্যমে আপনার অন্তরের কঠোরতা দূর হবে। ক্ষীণ অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই আপনি সেসব নিয়ে চিন্তা করে দেখুন। কেন তাঁরা এতোটা খওফ অবলম্বন করতেন। কেউ কেউ মূর্ছা যেতেন। কেউ কান্না জুড়ে দিতেন। কেউ স্থির হয়ে যেতেন। আবার কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তেন।

এসব ঘটনায় আপনার অন্তরে প্রভাব না-ও পড়তে পারে। কারণ গাফেলদের অন্তর তো পাপথরের মতো কিংবা এর চেয়েও বেশি কঠোর। অথচ কোনো কনো পাথর থেকে নদী উৎসারিত হয়। আর কোনো পাথর আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যায় তখন তা থেকে পানি বের হয়। আর কিছু পাথর তো আল্লাহর ভয়ে গড়িয়ে পড়ে যায়। আর আল্লাহ গাফেলদের সম্পর্কে বেখবর নন।

## নবী-রাসূল ও ফেরেশতাগণের ভয়ের বর্ণনা

হযরত আয়েশা (রা) রেওয়ায়েত করেন, যখন প্রবল বেগে তুফান বইতে থাকত, রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেহারা মুবারক তখন বিবর্ণ হয়ে যেত। তিনি পায়চারী করতে থাকতেন এবং ভেতরে ও বাইরে আসা-যাওয়া করতেন। এসব কিছুই তিনি আল্লাহ তাআলার ভয়ে করতেন। (সহিহ বুখারী : ৪৮২৯, সহিহ মুসলিম : ৮৯৯)

একবার সূরা হাক্কাহ-এর একটি আয়াত পাঠ করে তিনি বেহুঁশ হয়ে যান। (কূতুল কুলূব : ১ : ২৩৮, আল কামেল : ২ : ৪৩৬, যুহদ, হান্নাদ : ২৬৭)

আরেকবার আবতাহ নামক স্থানে হযরত জিবরাঈলের আকৃতি দেখার পর তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। (মুসনাদে আহমদ : ১ : ৩২২, মুসনাদে বাযযার : ৪৭১৮, তাবারানী কাবীর : ১১ : ৫৭)

বর্ণিত আছে, তিনি যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাঁর বক্ষে ডেকচির স্ফুটনের মত শব্দ শুনা যেত। (সুনানে আবু দাউদ : ৯০৪, সুনানে নাসায়ী : ৩ : ১৩)

নবী করীম (স) ইরশাদ করেন, জিবরাঈল যখনই আমার নিকট আসতেন, মহা প্রতাপশালী আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকতেন। (অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, মুসনাদুল ফিরদাউস : ৮৩৫৭, আল উজমা-আবু শায়েখ, ৩৬৩, বায়হাকী শুআবুল ঈমান : ৮৮৭)

বর্ণিত আছে, যখন শয়তান বিতাড়িত হল, তখন জিবরাঈল ও মিকাঈল ফেরেশতাদ্বয় কাঁদতে থাকেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমরা কেন কান্নাকাটি করছ ? তারা বললেন, হে রব! আমরা আপনার গ্রেপ্তার থেকে শঙ্কামুক্ত নই। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তোমরা এভাবেই থাকো। আমার গ্রেপ্তার থেকে শঙ্কামুক্ত থেকো না। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪০, আল উজমা : ৩৮৩, এতে ইবলিসের আলোচনা নেই।')

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (র) বর্ণনা করেন, যখন জাহান্নাম সৃষ্টি হলো, তখন ভয়ে ফেরেশতাদের মন অস্থির হয়ে উঠল। কিন্তু আদম সন্তান সৃষ্টি হলে তাদের মন স্থির হল। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪ : ৫, তাউস বিন কাইসানের উক্তি)

হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, নবী করিম (স) হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন, "مَا لِي لَا أَرَى مِيكَائِيلَ يَضْحَكُ؟ ব্যাপার কী, আমি মিকাঈলকে কখনো হাসতে দেখি না কেন ? তিনি বললেন, জাহান্নাম সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে মিকাঈল হাসেন না। (মুসনাদে আহমদ : ৩ : ২২৪, শুআবুল ঈমান : ৮৮৫)

অন্যত্র বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলার কিছুসংখ্যক ফেরেশতা আগুন সৃষ্টি হওয়ার পর হতে এই ভয়ে হাসেন না যে, না জানি আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হয়ে আগুন দ্বারা তাদেরকে শাস্তি দেন। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ৮৮৬)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (স) এর সঙ্গে বাইরে বের হলে তিনি এক আনসারীর বাগানে প্রবেশ করলেন এবং খোরমা খেতে লাগলেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি খাচ্ছ না কেন? আমি বললাম, আমার খোরমা খাওয়ার চাহিদা নেই। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কিন্তু আমার ক্ষুধা আছে। আমার খাবার গ্রহণ না করার আজ চতুর্থ দিন। এ কয়দিন আমি খাবার পাইনি। আমি আমার রবের

নিকট চাইলে তিনি আমাকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য দিয়ে দিতেন। ইবনে উমর! যখন তুমি এমন লোকদের মধ্যে থাকবে যারা বছরের খোরাক জমা করে রাখবে, তখন তোমার কী অবস্থা হবে? তাদের ইয়াকীন (বিশ্বাস) খুব দুর্বল হবে। ইবনে উমর (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমরা বাগানেই ছিলাম, এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হলো,

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَ اِيَّاكُمْ، وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

এমন অনেক জীবজন্তু আছে, যারা নিজেদের খাদ্য মজুদ রাখে না। আল্লাহই রিজিক দান করেন তাদেরকে এবং তোমাদেরকেও এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (সূরা আনকাবুত : ৬০)

এরপর রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ধনসম্পদ জমা করার এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করার আদেশ করেননি। যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী জীবনের উদ্দেশ্যে দিনার জমা রাখে, তার জীবন আল্লাহর হাতেই। সাবধান! আমি দিনার ও দিরহাম সঞ্চয় করি না এবং আগামীকালের জন্য জীবনোপকরণ জমা করি না। (আখলাকে নবী, আবু শয়েখ : ৮৩১, তারিখে দিমাশক : ৪ : ১২৭)

হযরত আবু দারদা (রা) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন আল্লাহর ভয়ে তাঁর অন্তরে স্ফুটনের আওয়াজ এক মাইল দূর থেকে শোনা যেতো। (তারিখে দিমাশক : ৬ : ২১৮)

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, হযরত দাউদ (আ) চল্লিশদিন যাবত সিজদায় পড়ে কাঁদলেন এবং মাথা তুললেন না। ফলে তার চোখের পানিতে সবুজ ঘাস জন্মালো এবং তাতে তার মাথা ঢেকে গেল। এমন সময় গায়েবী আওয়াজ হল, হে দাউদ! তুমি ক্ষুধার্ত হলে খাবার পাবে। পিপাসার্ত হলে পানি পান করানো হবে। বস্ত্রহীন হলে বস্ত্রপ্রাপ্ত হবে। হযরত দাউদ জোরে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর ভয়ের তাপে কাঠ জ্বলে গেল। এরপর আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য তাওবা ও মাগফিরাত অবতীর্ণ করলেন। তিনি বললেন, হে রব! আমার গুনাহ আমার হাতে সমর্পণ করো। তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের তালুতে তাঁর গুনাহ লিখে দেওয়া হলো। তিনি যখন পানাহার করতেন কিংবা কোনো উদ্দেশ্যে হাত প্রসারিত করতেন, তখন এ গুনাহ দেখে ক্রন্দন করতেন। রাবী বলেন, তার সম্মুখে পানির পেয়ালা এক-তৃতীয়াংশ

খালি করে পেশ করা হত। তিনি যখন গুনাহ দেখতেন, তখন পেয়ালা ঠোঁটের সাথে মিলানো পর্যন্ত তাঁর চোখের পানিতে তা ভরে যেত। (যুহুদ, ইবনে মোবারক : ৪৭৫)

বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ) আল্লাহকে লজ্জা করে মৃত্যু পর্যন্ত আসমানের দিকে মাথা তুলে তাকাননি। (যুহদ, ইবনে মুবারক : ৪৭৫)

তিনি মুনাজাতে বলতেন, হে আল্লাহ! যদি আমার অপরাধের কথা মনে করি জমিন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে সংকীর্ণ হয়ে আসে। আর আপনার রহমতের কথা স্মরণ করলে আমার আত্মা আমার কাছে ফিরে আসে। হে আল্লাহ! আমি আপনার চিকিৎসক বান্দাদের কাছে গিয়েছি যেন তারা আমার ভুলের চিকিৎসা করে। কিন্তু সকলে আপনার দিকে পর্থনির্দেশ করেছে। আপনার রহমত হতে নিরাশদের জন্য দুর্ভোগ। (উসমান বিন আতেকা হতে বর্ণিত, আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৫২)

ফুযাইল (র) বলেন, দাউদ (আ) একদিন গুনাহের কথা স্মরণ করেন। তখন তিনি মাথায় হাত রেখে চিৎকার করতে করতে পাহাড়ে আশ্রয় নেন। বনের হিংস্রপ্রাণীরা তার কাছে সমবেত হয়। তিনি তাদের বলেন, তোমরা চলে যাও। তোমাদের আমার প্রয়োজন নেই। আমি চাই আপন গুনাহে অনুতপ্ত ক্রন্দনকারীদের যারা কেঁদে কেঁদে আমাকে স্বাগত জানাবে। যারা নিষ্পাপ, তারা গুনাহগার দাউদকে দিয়ে কী করবে। (কিতাবুল খায়িফীন-ইবনে আবিদ দুনিয়া, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৪৭)

অধিক ক্রন্দনের কারণে তাঁকে কিছু বলা হলে তিনি বলতেন, কান্নার দিন আসার আগেই আমাকে কাঁদতে দাও। সেদিন হাড়গোড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। নাড়িভূঁড়ি জ্বলে ভস্ম হবে। আমার ব্যাপারে ওই ফেরেশতাদের আদেশ করার পূর্বে যারা রূঢ়, কঠোর, যারা আল্লাহর আদেশের লঙ্ঘন করে না বরং যা আদেশ করা হয় তাই পালন করে। (যুহদ, ইবনুল মুবারক : ৪৮৩)

আবদুল আযীয বিন উমাইর বলেন, দাউদ (আ) ভুল করার পর তার স্বর ক্ষীণ হয়ে যায়। তিনি বলেন, হে আল্লাহ! সত্যবাদীদের নির্মল স্বরের মাঝে আমার স্বর কর্কশ হয়ে গেছে। (আর রিবকাতু ওয়াল বুকা, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ৩৯৪)

বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আ) দীর্ঘদিন কাঁদার পর যখন দেখলেন কোনো ফায়দা হচ্ছে না তখন তাঁর ভয় ধরে গেল এবং তিনি মুষড়ে পড়লেন। তিনি বললেন, হে আমার রব! আমার কান্না দেখে কি আপনার দয়া হয় না। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাআলা ওহি নাযিল করলেন, হে দাউদ! তুমি তোমার অপরাধের কথা ভুলে গিয়ে কেবল কান্নার কথাই মনে করলে? দাউদ বললেন, হে আল্লাহ! আমার মনিব! কী করে আমি আমার পাপের কথা ভুলে যাবো, অথচ আমি আমার ইবাদতগাহে একাকিত্ব অনুভব করি! ইলাহী! আমার মনিব! আমার ও আপনার মাঝে এ দূরত্ব কীসের? আল্লাহ তাআলা ওহি নাযিল করলেন, হে দাউদ! পূর্বে ছিল আনুগত্যের নৈকট্য। এখন গুনাহের দূরত্ব। হে দাউদ! আদম আমার একটি সৃষ্টি। তাকে আমি নিজ হাতে সৃজন করেছি। তার মাঝে রূহ ফুঁকে দিয়েছি। ফেরেশতাদের তাকে সিজদা করতে নির্দেশ দিয়েছি। আমার মাহাত্ম্যের পোশাক তাকে পরিয়েছি। আমার গাম্ভির্যের মুকুট তার মাথায় রেখেছি। সে আমার নিকট একাকিত্বের অভিযোগ করেছিল। আমি তার সঙ্গে হাওয়াকে বিয়ে দিয়েছি। তাদের জান্নাতে আবাস দান করেছি। এরপর সে আমার আদেশ লঙ্ঘন করল। আমি তাকে আমার নৈকট্য হতে বিবস্ত্র ও লাঞ্ছিতরূপে তাকে দূরে সরিয়ে দিলাম। হে দাউদ! আমার কথা শোনো, আমি সত্য বলছি। তুমি আমার কথা শুনেছো, আমিও তোমার কথা শুনেছি। তুমি আমার কাছে চেয়েছো, আমি তোমাকে দান করেছি। তুমি আমার কথা শোনেননি, কিন্তু আমি তোমাকে সুযোগ দিয়েছি। এতসব অপরাধ সত্তেও যদি তুমি আমার কাছে ফিরে আসো আমি তোমাকে বরণ করে নিবো। (কিতাবুল খায়েফিন ও ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৪৭)

ইয়াহইয়া ইবনে কাছির বলেন, বর্ণিত আছে, দাউদ (আ) যখন রোনাজারির ইচ্ছা করলেন এক সপ্তাহ আগ থেকে পানাহার এবং স্ত্রীর সান্নিধ্য পরিহার করলেন। ষষ্ঠদিনে মরুভূমিতে তার মিম্বর রাখা হলো। সুলাইমান (আ)-কে দেশেদেশে পাড়ায়-মহল্লায় এবং বন-বনানী, পাহাড়াঞ্চল, মরুভূমি ও গির্জাসমূহে ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

সুলাইমান (আ) ঘোষণা করেন, শুনে রাখো, যারা দাউদ (আ)-এর রোনাজারি ও কান্নাকাটি শুনতে চাও তারা উপস্থিত হও।

বর্ণনাকারী বলেন, মরুভূমি এবং পাহাড়ের চূড়া হতে বন্যপ্রাণীরা, গুহা থেকে হিংস্রপ্রাণীরা, পর্বতরাজি থেকে কীট-প্রতঙ্গ, নীড় হতে পক্ষিকুল। অন্তপুর থেকে কুমারী নারী এবং লোকজন সেদিন দলে দলে সমবেত হতো। দাউদ (আ) মিম্বরে আরোহণ করেন আর বনী ইসরাঈলের লোকজন চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। প্রাণীকুলও তাদের অবস্থান থেকে ঘিরে রাখে। সুলাইমান (আ) তার পাশে দণ্ডায়মান হতেন।

দাউদ (আ) প্রথমে গুণকীর্তন করতেন এরপর চিৎকার করে কান্না শুরু করেন। জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করলেন। তখন একদল কীট-প্রতঙ্গ, বন্যপ্রাণী এবং মানুষ মারা যায়। অতঃপর তিনি কিয়ামতের ভয়াবহতা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বিলাপ করতে থাকলেন। তখন আরেকদল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সুলাইমান (আ) মৃতের আধিক্য দেখে দাউদ (আ)-এর কাছে নিবেদন করলেন, আব্বাজি! আপনি শ্রোতাদের ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছেন। বনী ইসরাঈলের লোকজন ও প্রাণীকুল দলে দলে মারা পড়ছে। কিন্তু তিনি দুআ করে যেতে থাকলেন আর মৃতের সংখ্যাও বাড়তে থাকল। এক পর্যায়ে বনী ইসরাঈলের কতিপয় আবেদ চিৎকার করে বলে উঠলেন, হে দাউদ! আপনি আপনার প্রভুর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের জন্য বড় তাড়াহুড়া করছেন। এ কথা শুনে দাউদ (আ) বেহুঁশ হয়ে যান। সুলাইমান (আ) তাঁর অবস্থা দেখে স্ট্রেচার আনার নির্দেশ দেন। তাতে দাউদ (আ)-কে উঠিয়ে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। জান্নাত জাহান্নামের আলোচনা অনেকেরই মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দাউদ (আ)-এর হুঁশ ফিরে আসার পর তিনি মাথায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইবাদতখানায় প্রবেশ করলেন। তিনি দুআ করেন, ইয়া রব! আপনি কি দাউদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন? তিনি অনবরত মুনাজাত করতে থাকেন। সুলাইমান (আ) দরজায় দাঁড়িয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি ভেতরে প্রবেশ করে দাউদ (আ)-এর সামনে যবের রুটি রেখে বললেন, আব্বাজি, এই রুটিটা খেয়ে আপনি শক্তি সঞ্চয় করুন। দাউদ (আ) আহার গ্রহণ করে বনী ইসরাঈলের সামনে বের হয়ে আসেন। (কিতাবুল খায়িফীন, ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৪৮, মাসারিউল উশশাক : ১ : ২৭২)

ইয়াযীদ রাক্কাশী বলেন, দাউদ (আ) একদিন ৪০ হাজার লোকের সামনে ওয়াজ-নসিহত করেন এবং জান্নাত-জাহান্নামের ভয় দেখান। তখন ৩০ হাজার লোক মারা যায় এবং দশ হাজার লোক বাড়ি ফিরে যায়। তিনি আরও বলেন, দাউদ (আ)-এর মাঝে যখন ভয় কাজ করতো তিনি পড়ে গিয়ে নিথর হয়ে যেতেন। তখন দুজন বাঁদি তাকে ধরে বসাতো। তারা শঙ্কা করত, ভয়ের কারণে তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে এবং তিনি মারা পড়বেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা : ৩৫৩৯৯)

ইবনে ওমর (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আ) বাইতুল মাকদিসে প্রবেশ করেন। তখন তিনি আট বছরের বালক। তিনি দেখলেন, বাইতুল মাকদিসের সাধকগণ পশমি পোশাক পরিধান করেন। তারা মসজিদের খুঁটির সঙ্গে নিজেদের বেড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে সাধনা করছেন। এ দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। বাড়ি ফেরার পথে শিশুরা তাঁকে খেলার জন্য ডাকে, ইয়াহইয়া! আসো, আমরা এক সঙ্গে খেলবো। কিন্তু তিনি শিশুদের বিস্ময়কর জবাব দেন। তিনি বলেন, আমাকে খেলার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। বাড়ি ফিরে তিনি পিতামাতাকে বললেন, আমাকে পশমি পোশাক দিন। তিনি পশমি পোশাক পরে বাইতুল মাকদিসে চলে আসেন। তিনি দিনে মসজিদের খেদমত করতেন। রাতে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। এভাবে তিনি ১৫ বছর বয়সে পদার্পণ করেন। তখন থেকে বন-বাদাড়ে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। একদিন তাঁর পিতা যাকারিয়া (আ) তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন তিনি জর্ডানের একটি হ্রদে পা ডুবিয়ে বসে আছেন। পিপাসায় তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত।

তিনি বলছেন, প্রভু! আপনার সম্মান ও প্রতাপের শপথ, আপনার নিকট আমার অবস্থান কোথায় তা না জানা পর্যন্ত আমি ঠান্ডা পানির স্বাদ চাখবো না। এরপর তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে থাকা যবের রুটি দিয়ে রোজা ভঙ্গ করেন। পানি পান করেন এবং শপথভঙ্গের কাফফারা আদায় করেন। এরপর যাকারিয়া (আ) তাকে বাইতুল মাকদিসে নিয়ে আসেন। তিনি নামাজে দাঁড়ালে প্রচুর কাঁদতেন। বৃক্ষ-তরুলতা সবকিছু তাঁর সঙ্গে কাঁদতো। তাঁর কান্না দেখে যাকারিয়া (আ) কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। অনবরত কান্নার কারণে ইয়াহইয়া (আ)-এর গালের চামড়া পুড়ে

মাড়ির দাঁত বের হয়ে গিয়েছিল। তাঁর অনুমতি ক্রমে তাঁর মা গালে দুটি আঁটুনি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তিঁনি নামাজে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেই আঁটুনি দুটি ভিজে যেতো। তখন তাঁর মা সে দুটি চিপে গালে বসিয়ে দিতেন। একদিন তিনি দেখলেন, তাঁর চোখের পানি মায়ের হাতে পড়ছে। তিনি দুআ করলেন, হে আল্লাহ! এটা আমার চোখের পানি। ইনি আমার মা। আমি আপনার বান্দা। আপনি দয়ালুদের শ্রেষ্ঠ দয়ালু।

একদিন যাকারিয়া (আ) তাকে বললেন, প্রিয় পুত্র, আমি আমার রবের কাছে চক্ষু শীতলকারী সন্তান চেয়েছিলাম। তিনি তোমার দ্বারা আমার চক্ষু শীতল করেছেন। তখন ইয়াহইয়া (আ) বললেন, আব্বাজি! জিবরাঈল (আ) আমাকে বলেছেন, জান্নাত জাহান্নামের মাঝে একটি শূন্যস্থান রয়েছে, ক্রন্দনকারীগণই কেবল তা অতিক্রম করতে পারবে।

যাকারিয়া (আ) বললেন, পুত্র তুমি কাঁদো। (ইবনে কুতাইবা হতে বর্ণিত, উয়ূনুল আখবার : ২ : ২৯৪, ইয়াযিদ ইবনে আবু মানসুর হতে বর্ণিত, তারীখে দিমাশক : ১৯ : ৫৩)

ঈসা (আ) হাওয়ারিদের বলতেন, হে আমার অনুসারীগণ, আল্লাহর ভয় এবং জান্নাতুল ফিরদাউসের ভালোবাসার পরিত্যাজ্য সম্পদ হলো কষ্টের উপর ধৈর্য ধরা। দুনিয়া হতে দূরে থাকা। আমি তোমাদের যথাযথ বলছি, যব খেয়ে কুকুরের সঙ্গে একই কম্বলে ঘুমিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসের প্রত্যাশী খুব কম সংখ্যক লোক। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ২ : ৩৬৯, তারীখে দিমাশক : ৪৭ : ৪২২)

বর্ণিত আছে, ইবরাহিম (আ) আপন ভুলের কথা স্মরণ করলে বেহুঁশ হয়ে যেতেন। অনেক দূর থেকে তার হৃদকম্পন শোনা যেত। জিবরাঈল (আ) তাকে বললেন, মহাপ্রতাপশালী সত্তা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, কোনো বন্ধু কি তাঁর বন্ধুকে ভয় পায়? ইবরাহীম (আ) বললেন, যখন আমার ভুলের কথা মনে পড়ে তখন আমি বন্ধুর কথা ভুলে যাই। (কিতাবুল খায়িফীন, ইতহাফুস সাদাতুল মুত্তাকিন : ৯ : ২৪৯)

পাঠক! নবীগণের ভয়ের অবস্থা এমন হলে অন্যদের কেমন হওয়া উচিত! ভেবে দেখুন! আল্লাহ তাআলার নৈকট্যশীল বান্দাদের অবস্থাও এরূপ। উত্তম কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

## সাহাবী, তাবিয়ী ও সালাফে সালেহীনের মধ্যে ভয়ের প্রাবল্য

বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) একদিন একটি পাখিকে লক্ষ্য করে বললেন, হায়, আমিও যদি তোমার মতো পাখি হতাম, মানুষ না হতাম ! (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান : ৭৬৯)

হযরত আবু যর (রা) বলেন, হায়! আমি যদি গাছ হতাম এবং কেউ তা কেটে ফেলত! (জামে তিরমিযি : ২৩১)

হযরত তালহা (রা)-ও এমনটি বলেছেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৮)

হযরত উসমান (রা) বলেন, মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত না হওয়া আমার নিকট খুব ভালো মনে হয়। (কূতুল কুলূব : ১ : ২২৮)

হযরত আয়েশা (রা) বলেন, সম্পূর্ণ বিস্মৃত-বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আমার নিকট ভালো মনে হয়। (সহিহ বুখারী : ৪৭৫৩)

এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত ওমর (রা) কুরআনের কোনো আয়াত শুনলে, তখন ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেন। এরপর কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁকে দেখার জন্য লোকেরা আসা-যাওয়া করতো। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ৫১)

একদিন তিনি মাটি থেকে একটি খড় হাতে তুলে বললেন, হায়! যদি আমি খড় হতাম এবং কোনো উল্লেখযোগ্য বস্তু না হতাম। হায়! আমি যদি বিস্মৃত হয়ে যেতাম। হায়! আমার মা যদি আমাকে প্রসব না করতো। (যুহদ : ইবনুল মুবারক : ২৩৪)

তাঁর চেহারাতে অশ্রুর কারণে দৃষ্ট দুটি কালো দাগ ছিল। (ফাযায়িলুস সাহাবা, আহমদ : ৩১৮)

তিনি বলতেন, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, সে যেন নিজের ক্ষোভ চরিতার্থ না করে। যে তাকওয়া অবলম্বন করে, সে ইচ্ছানুযায়ী কাজ করে না। কিয়ামাত না হলে আমরা অন্য কিছুর লক্ষণ দেখতাম। (আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলমি : ৪০৫, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ৫৮)

একবার তিনি কুরআনের إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ শুরু করে وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ পর্যন্ত পৌঁছে, বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান। (আর রিয়াযুন নাযরাতু : ২ : ৩৭৫)

একদিন তিনি এক লোকের ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে লোক নামাযে সূরা তূর পাঠ করছিল। তিনি দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন। যখন সে إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। (সূরা তুর : ৭) তিলাওয়াত করল, তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে দেওয়ালে হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করলেন। এরপর বাড়ি চলে এলেন এবং এক মাস বিছানায় পড়ে রইলেন। লোকজন তাকে দেখতে আসত কিন্তু কেউ বুঝতে পারতো না, তার রোগটা কী ? (তারিখে দিমাশক : ৪৪ : ৩০৮)

একদিন হযরত আলী (রা) ফজরের নামাযের পর বিষণ্ন মনে বললেন, 'আমি মুহাম্মদ (স)-এর সাহাবীগণকে দেখেছি। কিন্তু আজ তাদের ন্যায় কোনো কিছু দেখি না। এলোমেলো চুল ও ধূলিমলিন থাকাই তাদের রীতি ছিল। তাদের দু'চোখের মাঝেখানে সিজদার চিহ্ন পড়ে গিয়েছিল। তারা রাতের বেলায় সিজদা করতেন। নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং ইবাদতে কপাল ও পায়ের উপর পালাক্রমে ভর দিতেন। যখন ভোর হতো তখন প্রবল বাতাসে যেমন বৃক্ষ আন্দোলিত হয়, তেমনি তারা আন্দোলিত হতেন। অশ্রুতে তাদের পরিধানের কাপড় ভিজে যেত। কিন্তু আজকাল আমি এমন লোকদের মধ্যে বসবাস করছি, যারা রাতের বেলায় গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে।' তারপর আলী (রা) উঠে গেলেন। ইবনে মুলজিম তাকে আঘাত করার আগ পর্যন্ত তাকে হাসতে দেখা যায়নি। (তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল, ইবনে আবিদ দুনিয়া : ২০৫, আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৪০৫, হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ৭৬)

হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (র) বলেন, ছাই হয়ে বাতাসে বিক্ষিপ্তভাবে উড়ে যাওয়া আমি ভালো মনে করি। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১১ : ৩০৭, শুআবুল ঈমান : ৭৭০)

হযরত আবু উবায়দা ইবনে জাররাহ (র) বলেন, আমি যদি ভেড়া হতাম এবং আমার পরিবারের লোকেরা যদি আমাকে জবাই করে খেয়ে ফেলত, তাহলে কতই না উত্তম ছিল। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ১১ : ৩০৭, শুআবুল ঈমান : ৭৭০)

হযরত ইমাম যাইনুল আবিদীন (র) যখন অযু করতেন তখন তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। পরিবারের লোকজন জিজ্ঞেস করতো, অযু করার সময় আপনার এ অবস্থা হয় কেন ? তিনি বলতেন, তোমরা কি জানো আমি কার সামনে দাঁড়াতে যাচ্ছি? (যুহুদ, আহমদ : ২১৩৮, রিক্বাতু ওয়াল বুকাউ : ১৪৮)

হযরত মূসা ইবনে মাসউদ (র) বলেন, আমরা যখন সুফিয়ান সাওরীর কাছে বসতাম তখন তাঁর ভয় দেখে মনে হত, আগুন যেন চতুর্দিক থেকে আমাদের ঘিরে রেখেছে। (আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলমি : ১৪০)

কারী মুদার (র) যখন هٰذَا كِتٰبُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ এ আমার লিপি, যা তোমাদের বিরুদ্ধে সত্যভাবে সাক্ষ্য দেবে। (সূরা জাসিয়া : ২৯)

আয়াতটি পাঠ করলেন তখন আবদুল ওয়াহেদ ইবনে যায়েদ (র) ভয়ে ক্রন্দন করতে করতে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। অতঃপর চৈতন্য ফিরে এলে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনার ইজ্জতের কসম! আর কখনো আপনার নাফরমানি করব না। সুতরাং আপনার আনুগত্যে তাওফিকের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করুন। (তারিখে দিমাশক : ৩৭ : ২৩০)

মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (র) ভয়ের কারণে কুরআন পাক শুনতে পারতেন না। কেউ এক হরফ অথবা এক আয়াত তিলাওয়াত করলে তিনি চিৎকার করে উঠতেন এবং কয়েক দিন অজ্ঞান থাকতেন। একদিন খাসআম গোত্রের এক লোক তাঁর নিকট এসে নিম্নের আয়াত তিলাওয়াত করল,

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا. وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا.

(সে দিনকে ভুলো না) যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদের সম্মানিত মেহমানরূপে সমবেত করব এবং অপরাধীদের পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো। (সূরা : মারইয়াম : ৮৫-৮৬)

আয়াতটি শুনে মিসওয়ার (রা) বললেন, আমি তো পাপাচারীদের একজন; মুত্তাকী নই। কারী সাহেব! আয়াতটি পুনরায় পড়ুন। পুনরায় পাঠ করা হলে তিনি জোরে চিৎকার দিয়ে পরকালের যাত্রী হয়ে গেলেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৫২)

ক্রন্দনকারী ইয়াহ্ইয়ার সামনে কেউ এ আয়াতটি পাঠ করল,

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ.

আপনি যদি দেখতে পেতেন তাদেরকে, যখন তাদের প্রতিপালকের সামনে দাঁড় করানো হবে। (সূরা আনআম : ৩০)

আয়াতটি পড়ার পর তিনি একটি চিৎকার দিলেন। যার ফলে একাধারে চারমাস যাবত অসুস্থ ছিলেন। বসরার আশপাশ থেকেও লোকেরা এসে তাঁকে দেখে যেতো। (আল মুজালাসাতু ওয়া জাওয়াহিরুল ইলমি : ২১৩)

মালেক ইবনে দিনার (র) বলেন, আমি কাবাঘর তাওয়াফ করছিলাম, এমন সময় দেখি এক আবেদ যুবতী কাবার গিলাফ ধরে বলে যাচ্ছে, হে প্রভু! অনেক কামনার আনন্দ বিলীন হয়ে গেছে; তবে আযাব বাকি রয়ে গেছে। হে প্রভু! আপনার কাছে জাহান্নাম ছাড়া কি অন্য কোনো শাস্তি নেই? মহিলাটি এ কথা বলে কাঁদতে কাঁদতে সকাল হয়ে গেল। আমি এ অবস্থা দেখে নিজের কথা ভেবে চিৎকার দিয়ে উঠলাম। (আখবারে মক্কা : ১ : ৩১৯, তারিখে দিমাশক : ৫৬ : ৪৩১)

বর্ণিত আছে, ফুযাইল (র)-কে আরাফার দিন মানুষের মাঝে সন্তানহারা মায়ের মতো বিলাপ করে কাঁদতে দেখা গেল। সূর্যাস্তের সময় তিনি স্বীয় দাড়ি হাতের মুঠিতে নিয়ে আসমানের দিকে মাথা তুলে বললেন, আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেও দেন তবুও আমি আপনার সামনে লজ্জিত।' তারপর মানুষের সঙ্গে আরাফা থেকে ফিরে গেলেন। (শুআবুল ঈমান : ৩৮৯৭; ইবনে আসাকির, তারীখে দিমাশক : ৪৮ : ৪২০)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে খওফকারীর অবস্থা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, যার অন্তর ভয়ে উদ্বিগ্ন এবং কান্নায় চোখের পানি অবারিত সে-ই খওফকারী। লোকেরা বলল, আমরা কীরূপে আনন্দিত হবো, অথচ মৃত্যু আমাদের পেছনে, কবর আমাদের সামনে, কেয়ামত সুনিশ্চিত, জাহান্নামের উপর আমাদের পথ, রবের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে? (ইবনে আবদে রব্বিহী, আল ইকদুল ফারীদ : ১৭৭)

হযরত হাসান বসরী (র) হাসাহাসিতে মত্ত এক যুবকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে বললেন, তুমি পুলসিরাত অতিক্রম করেছ? যুবক বলল, না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি জান্নাতে যাবে, না জাহান্নামে, এটা

কি তোমার জানা আছে কি? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহলে এত হাসছো কেন? রাবী বলেন, এরপর হতে এ যুবককে হাসতে দেখা যায়নি। (কূতূল কুলূব)

হাম্মাদ ইবনে আবদে রাব্বিহী (র) যখনই বসতেন, অর্ধেক দাঁড়ানোর মতো বসতেন। কেউ তাকে স্থিরভাবে বসতে বললে তিনি বললেন, ভয়শূন্য ব্যক্তি আরাম করে বসে; আমি ভয়শূন্য নই। কেননা আমি আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করেছি।

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলতেন, আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে যে গাফলত দান করেছেন এটাও একটি রহমত। নয়তো আল্লাহর ভয়ে সবাই মারা যেত। (ইতাহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৫৩)

মালিক ইবনে দিনার (র) বলেন, আমি মনে মনে ভাবছি মৃত্যুর সময় মানুষকে বলব, তোমরা আমাকে বেড়ি লাগিয়ে শৃঙ্খলিত অবস্থায় আল্লাহর নিকট নিয়ে যাবে, যেমন পলাতক গোলামকে তার প্রভুর সম্মুখে নিয়ে যাওয়া হয়। (যুহদ, আহমদ : ১৮৮০)

হাতিম আসাম (র) বলেন, কোনো সুরম্য ঘরের জন্য পেরেশান হয়ো না। কারণ, জান্নাতের চেয়ে অধিক মনোরম কোনো স্থান নেই। কিন্তু আদম (আ)-এর অবস্থা তাতে যা হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অধিক ইবাদতের ব্যাপারে ধোঁকা খেয়ো না। কেননা, অধিক ইবাদতের পরও শয়তানের অবস্থা সকলেরই জানা। অধিক জ্ঞানের জন্য দম্ভ করো না। কারণ, বালআমও ইসমে আযমের বিদ্যা জানতো। কিন্তু দেখো তার পরিণতি কী হয়েছে! সৎ-কর্মপায়ণদের সাথে সাক্ষাতের জন্যও অধীর হয়ো না। কেননা, রাসূলুল্লাহ (স) এর চেয়ে বেশি সৎকর্মপরায়ণ কেউ ছিলেন না। তার শত্রু এবং অনেক আত্মীয় তাঁকে দেখেছে কিন্তু উপকৃত হয়নি। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪১)

হযরত সুররী (র) বলেন, প্রতিদিন আমি আমার নাকের দিকে কয়েকবার করে তাকাই, এই ভয়ে যে, আমার চেহারা হয়তো কালো হয়ে গেছে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ১১৬)

হযরত আবু হাফস (র) বলেন, চল্লিশ বছর যাবত আমার এই ধারণা যে, আল্লাহ আমার প্রতি রাগের দৃষ্টি দেন। আর আমার আমল এ কথা প্রমাণ

করে। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪০ ইনি আবু হাফস বিন আমর বিন সালামা আল হাদ্দাদি।)

ইবনে মোবারক (র) একদিন সঙ্গীসাথিদের বললেন, কাল রাতে আমি আল্লাহর কাছে এক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে ফেলেছি। তাঁর কাছে জান্নাত চেয়েছি। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪১)

মুহাম্মদ ইবনে কাব কুরযীর মা তাকে বললেন, আমি তোমাকে জানি। তুমি শিশু অবস্থায় পূতপবিত্র ছিলে এবং বড় হয়েও ভালোই আছ। কিন্তু তুমি দিন-রাত শুধু ইবাদতই করে যাচ্ছ। এ কাজটি তোমার স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর হতে পারে। এত পরিশ্রম করার তোমার কী প্রয়োজন? তিনি বললেন, মা! যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে কোনো পাপ করতে দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে বলে ফেলেন, আমি তোমাকে মার্জনা করব না। তবে এ রকম আশঙ্কা থেকে নির্ভয় হওয়ার কি কোনো কারণ আছে? (তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল : ৯০, হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ২১৪)

হযরত ফুযাইল (র) বলেন, কোনো প্রেরিত নবী, নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং মুত্তাকির প্রতি আমার কোনো হিংসা নেই। কারণ, কেয়ামাতের দিন তাদের কোনো আযাব হবে না। আমার হিংসা শুধু সে লোকের জন্য যে জন্মগ্রহণই করেনি। (হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ৯)

বর্ণিত আছে, এক আনসারী যুবক জাহান্নামের ভয়ে সারাক্ষণ কান্নাকাটি করত। এমনকি কান্নার কারণে সে ঘরেই বসে থাকতো; বের হত না। নবী করীম (স) একদিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে গলার সাথে জড়িয়ে ধরলেন। আনসারী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করল। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন,

جَهِّزُوْا صَاحِبَكُمْ فَإِنَّ الْفَرَقَ مِنَ النَّارِ فَتَّتْ كَبِدَهُ.

তোমরা তাঁর কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করো। জাহান্নামের ভয় তাঁর কলিজাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিয়েছে। (যুহদ : ইবনুল মুবারক : ৩২০)

বর্ণিত আছে, ইবনে আবী মাইসারা (র) নিদ্রায় যাওয়ার আগে বলতেন, হায়, আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন! তার মা একদিন বললেন, হে মাইসারা! আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে তুমি মুসলমান। সুতরাং এত ভয় করছ কেন? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, আমরা সবাই জাহান্নামে

যাব। জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার কথা তিনি বলেননি। এটাই ভয়ের কারণ। (নাসায়ী কুবরা : ১১৮৩৭, যুহদ : ইবনুল মুবারক : ৩১২)

বর্ণিত আছে, আস সাবখী (র)-কে বলা হলো, আপনার জানা বনী ইসরাঈলের আশ্চর্যজনক কোনো ঘটনা আমাদের শোনান। তিনি বললেন, একবার বাইতুল মাকদিসে পাঁচশতজন কুমারী নারী প্রবেশ করল। তারা সকলে পশমি পোশাক পরিহিত ছিল। আল্লাহ তাআলার সাওয়াব এবং শাস্তি সম্পর্কে সবাই আলোচনা করল। এরপর একদিনে সবাই ইন্তেকাল করল। (আল মুদহিশ, ইবনুল জাওযী : ২ : ৬১৩)

খোদাভীরুদের অন্যতম ছিলেন হযরত আতা সালমী (র)। তিনি আল্লাহর নিকট কখনো জান্নাতের আবেদন করতেন না; শুধু ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ২১৭)

রুগ্নাবস্থায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার মন কী চায়? তিনি বললেন, জাহান্নামের ভয় আমার মনে কোনো কিছু চাওয়ার জায়গা রাখেনি। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ২১৯)

বর্ণিত আছে, তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত কখনো আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকাননি এবং কখনো হাসেননি। একদিন আকাশের দিকে মাথা তুললে ভয়ে পড়ে গেলেন না-জানি আমার নাড়িভূঁড়ি ফেটে যায়। তিনি রাতের বেলায় নিয়মিত নিজ দেহে হাত বুলিয়ে দেখে নিতেন এই ভয়ে যে, কোথাও বিকৃত হয়ে যায়নি তো? যখন ধূলিঝড় শুরু হত কিংবা বজ্রপাত হত অথবা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেড়ে যেত তখন বলতেন, এসব বিপদাপদ আমারই কারণে এসেছে। আমি মরে গেলে মানুষ সুখ পাবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ২২১)

তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, একদিন আমরা উতবা নামক গোলামের সাথে ছিলাম। আমাদের মধ্যে এমন যুবক ও বৃদ্ধ ছিল, যারা ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়তো। অধিক নামায আদায়ের কারণে তাদের পা ফুলে গিয়েছিল, চোখ ছিল কোটরাগত এবং চামড়া হাড়ের সাথে লেগে গিয়েছিল। তাদেরকে দেখলে মনে হত যেন কবর থেকে উঠে এসেছে। তারা বলত, আল্লাহ তাআলা ইবাদতকারীদেরকে মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং নাফরমানদের অপমানিত করেছেন। তারা এসব কথা বলাবলি করতে করতে সামনে যাচ্ছিল, এমন সময় এক জায়গায় পৌঁছে হঠাৎ তাদের একজন

অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গী-সাথীরা তার চারপাশে বসে কান্নাকাটি করতে লাগল। তখন প্রচণ্ড শীত ছিল। কিন্তু তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরছিল। চোখে-মুখে পানির ছিটা দেওয়া হলে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। সাথীরা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, আমি এখানে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করেছিলাম। এখানে এলেই সে কথা মনে পড়ে যায়। সেজন্য আমি ভয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ২২৮)

সালিহ মুররী (র) বলেন, আমি এক বুযুর্গের সামনে এ আয়াত পাঠ করি,

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَا.

যেদিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলট-পালট করা হবে সেদিন তারা বলবে, 'হায়, আমরা যদি আল্লাহকে মানতাম ও রাসূলকে মানতাম।' (সূরা আহযাব : ৬৬)

এ আয়াতটি শুনেই সে বেহুঁশ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর বুযুর্গের হুঁশ ফিরে এলে সে বলল, সালেহ! আরও কিছু তেলাওয়াত করো। আমি কষ্ট অনুভব করছি। আমি পড়লাম,

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا.

এবং যারা অবাধ্যতা করেছে তাদের বাসস্থান হবে জাহান্নাম। যখনই তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। (সূরা সিজদাহ : ২০)

এ আয়াতটি শুনে তার রূহ বেরিয়ে গেল এবং সে মাটিতে পড়ে গেল।

বর্ণিত আছে, যুরারা ইবনে আবী আওফা (র) ফজরের নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। তিনি যখন فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ যেদিন শিঙায় ফুঁক দেওয়া হবে। (সূরা মুদ্দাসসির : ৮) তিলাওয়াত করলেন, তখন সাথে সাথে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গিয়ে ইন্তিকাল করলেন। (জামে তিরমিযী : ৪৪৫)

একবার হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের নিকট ইয়াযীদ রাককাশী গেলে তিনি বললেন, ইয়াযীদ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনি প্রথম খলিফা নন, আপনার পূর্বে অনেক খলিফা মৃত্যুবরণ করেছেন। এ কথা শুনে খলিফা কেঁদে বললেন, আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার ও হযরত আদম (আ)

এর মধ্যখানে এমন কোনো মহৎব্যক্তি নেই, যিনি ইন্তিকাল করেননি। খলিফা কেঁদে কেঁদে বললেন, আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে কোনো মানযিল নেই। একথা শুনে খলিফা বেহুঁশ হয়ে গেলেন। (যুহদুল কাবীর, বায়হাকী : ৫৫১)

মাইমুন ইবনে মিহরান (র) বলেন,

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِيْنَ.

নিশ্চয় জাহান্নাম তাদের (ইবলিসের অনুসারীদের) সবার প্রতিশ্রুত স্থান। (সূরা হিজর : ৪৩) আয়াতটি নাযিল হলে হযরত সালমান ফারসি (রা) চিৎকার করে মাথায় হাত রেখে বাইরে বেরিয়ে যান। এরপর তিনদিন যাবত তাঁর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন : ৯ : ২৫৫) হাফেজ ইরাকী (র) বলেছেন, আমি এই ঘটনার আসল পাইনি।

দাউদ তায়ী (র) এক মহিলাকে দেখলেন সে তার ছেলের কবরে বসে কেঁদে কেঁদে বলছিল, বাবা! জানি না তোমার কোন গাল সর্বপ্রথম পোকায় খেয়েছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি সেই স্থানে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। (যুহদুল কাবীর, বায়হাকী : ৫২৪, আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ৫৯)

সুফিয়ান সাওরী (র) অসুস্থ হয়ে পড়লে এক অমুসলিম চিকিৎসককে তার পেশাব দেখানো হলো। তখন সে বললো, এই লোকের কলিজা খওফের অধিক্যের কারণে ফেটে গিয়েছে। তারপর সে সুফিয়ান সাওরী (র)-এর তাপমাত্রা মেপে বললো, ইসলাম ধর্মে এমন কেউ আছে বলে আমার জানা ছিলো না। (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়্যাহ : ২৪১)

আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, একবার আল্লাহর কাছে আমি দুআ করলাম তিনি যেন আমার সামনে তাঁর ভয়ের একটি দুয়ার খুলে দেন। আল্লাহ তাআলা খুলে দিলো। এরপর আমি এতো ভয় পেলাম যে, আমার স্মৃতিভ্রম হওয়ার উপক্রম। আমি বললাম, হে আল্লাহ! সহ্য করার ক্ষমতা দিন। তখন আমার স্থিরতা ফিরে আসে। (মুসতাদরকে হাকেম : ৪ : ৫৭৮)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলতেন, তোমরা কাঁদো, কান্না না এলে কান্নার ভান করো। আল্লাহর কসম, তোমাদের কেউ প্রকৃত অবস্থা জানতে পারলে চিৎকার করতে করতে গলা ভেঙে ফেলত। আর নামায পড়তে পড়তে কোমর ভেঙে ফেলত (মুস্তাদরাকে হাকিম : ৪ : ৫৭৮)

হযরত আম্বরী (র) বলেন, একবার হাদিসবিদগণ হযরত ফুযাইল ইবনে আয়াজের দরজায় এসে জড়ো হলেন। তিনি জানালা দিয়ে তাদের দিকে মাথা বের করলেন। এ সময় ক্রন্দনের ফলে তাঁর দাড়ি কাঁপছিল। তিনি বললেন, হে লোকসকল! কুরআনের ওপর সর্বক্ষণ আমল করো এবং যথারীতি নামায কায়েম করো। এটা হাদিসের জ্ঞান নেওয়ার সময় নয়; বরং এটা ক্রন্দন, কাকুতিমিনতি, অসহায়ত্ব প্রকাশ ও ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় দুআ করার সময়। এ যুগে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে জিহ্বার হিফাযত করা, নিজের গোপনীয়তা প্রকাশ না করা এবং অন্তরের চিকিৎসা করা। জানা বিষয় গ্রহণ করবে এবং অজানা বিষয় বর্জন করবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ৯৪)

একবার তিনি আল্লাহর ভয়ে উদ্ভ্রান্ত অবস্থায় চলে যাচ্ছিলেন। কেউ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন জানি না। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৫৬)

যুর ইবনে উমর (র) তার পিতা উমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, অন্যরা কিছু বললে কেউ কাঁদে না। কিন্তু আপনি যখন কথা বলেন, তখন চতুর্দিক থেকে কান্নার আওয়াজ শুনি? উমর (রা) বললেন, যে মহিলার সন্তান মারা যায়, তার কান্না এবং যে মহিলা পারিশ্রমিক নিয়ে কাঁদে উভয়ের কান্নায় ব্যবধান অবশ্যই হবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ১১০) অর্থাৎ, খওফের কান্না অন্তরে অধিক প্রভাব বিস্তার করে।

বর্ণিত আছে, একদল লোক একজন আবেদকে অঝোরে কাঁদতে দেখে কারণ জানতে চাইল। তিনি বললেন, খওফকারীরা যা অন্তরে অনুভব করে সে কারণে কাঁদছি। লোকেরা বললো। তা কীসের খওফ? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়ার আহ্বানের ভয়।

খাওয়াস (র) মুনাজাতে কেঁদে কেঁদে বলতেন, আমার বয়স হয়েছে, শরীর দুর্বল হয়ে পড়েছে, এখন আর আপনার সেবা করতে পারি না। সুতরাং আমাকে আযাদ করে দিন। (আর রিক্কাতু ওয়াল বুকা : ২৮২)

বিশিষ্ট বুযুর্গ সালিহ মুররী (র) বলেন, একবার ইবনুস সাম্মাক আমার কাছে এসে বললেন, আমাকে আপনার সম্প্রদায়ের আবিদদের বিস্ময়কর কিছু হালত দেখান। আমি তাকে এক মহল্লায় কুঁড়েঘরে বসবাসকারী জনৈক ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেলাম। আমরা অনুমতি চেয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম, সে মাদুর তৈরিতে ব্যস্ত। আমি তার সামনে এ আয়াতটি পাঠ করলাম,

إِذِ الْأَغْلٰلُ فِيْ أَعْنَاقِهِمْ وَ السَّلٰسِلُ، يُسْحَبُوْنَ. فِي الْحَمِيْمِ، ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُوْنَ.

যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃঙ্খল থাকবে, তাদের টেনে নিয়ে যাওয়া হবে ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর তাদের দগ্ধ করা হবে আগুনে। (সূরা মুমিন : ৭১-৭২)

এ আয়াতটি শুনে লোকটি চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। আমরা তাকে সেই হালতে রেখে চলে এলাম। এরপর আমরা দ্বিতীয় এক ব্যক্তির বাড়িতে গেলাম এবং তার সামনে একই আয়াত পাঠ করলাম। সে-ও চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল। সেখান থেকে আমরা তৃতীয় ব্যক্তির কাছে গেলাম। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে সে বলল, চলে আসুন কিন্তু আমাকে আমার প্রভুর ধ্যান থেকে ফিরাতে পারবেন না। আমি পাঠ করলাম,

ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ.

এ ঘোষণা শুধু তাদের জন্য, যারা আমার সামনে উপস্থিত হতে এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে। (সূরা ইবরাহীম : ১৪)

তখন সে এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠল যে, তার নাক দিয়ে রক্ত বের হতে লাগল। এ রক্তের মধ্যেই সে ছটফট করছিল। অবশেষে রক্ত শুকিয়ে গেল। আমরা তাকেও একই হালতে রেখে চলে এলাম।

এভাবে আমরা ছয় ব্যক্তির নিকট থেকে ঘুরে আসলাম এবং প্রত্যেককেই বেহুঁশ অবস্থায় রেখে চলে এলাম। এরপর আমি তাকে সপ্তম ব্যক্তির নিকট নিয়ে গেলাম। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে কুঁড়েঘরের ভেতর থেকে সে অনুমতি দিল। আমরা দেখলাম এক অতিশয় বৃদ্ধ জায়নামাযে বসে আছে। আমরা সালাম দিলে সে টের পেলো না। আমি উচ্চ আওয়াজে বললাম, খবরদার! আগামীকাল মানুষকে দাঁড়াতে হবে। বৃদ্ধ বলল, কার সামনে দাঁড়াতে হবে? এ কথা বলার পর সে হতভম্ব হয়ে রইল। তার মুখ ছিল খোলা আর দৃষ্টি উপরের দিকে নিবদ্ধ। সে নিচু স্বরে উহ্ উহ্ শব্দ করছিল। এক পর্যায়ে সেই শব্দ থেমে গেল। তখন তার স্ত্রী বলল, এখন আপনারা তার নিকট থেকে চলে যান। কারণ, এখন তার নিকট থেকে কোনো উপকার পাওয়া যাবে না। তার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেছে। কয়েকদিন পর আমি সেখানকার লোকদের নিকট এ সাত ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, তাদের তিনজন সুস্থ হয়ে গেছে

এবং তিনজন মারা গেছে। আর বৃদ্ধ তিনদিন যাবত তেমনি হতভম্ব ও দিশেহারা হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় সে ফরয নামাযও পড়তো না। তিন দিন পর সে জ্ঞান ফিরে পেল। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৬ : ১৬৯)

বর্ণিত আছে, ইয়াযীদ ইবনে আসওয়াদকে মানুষ আবদালের মধ্যে গণ্য করত। তিনি এ মর্মে কসম করেন যে, জীবনে কখনও হাসবেন না এবং কখনো বিছানায় শুয়ে ঘুমাবেন না। কখনও ঘিয়ে পাকানো খাদ্য খাবেন না। তিনি আমৃত্যু এ কসম পূর্ণ করেন। (তারিখে দিমাশক : ৬৫ : ১১১)

একবার হাজ্জাজ সাঈদ ইবনে জুবায়েরকে প্রশ্ন করলেন, আমি শুনেছি আপনি কখনো হাসেন না। তিনি বললেন, দোযখ জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। বেড়ি তৈরি আছে এবং দোযখের ফেরেশতারাও তৎপর রয়েছে। এমতাবস্থায় হাসার কোনো উপায় আছে কি? (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৪ : ২৯১)

হযরত হাসান বসরীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আবু সাঈদ! আপনার সকালটা কেমন কেটেছে? তিনি বললেন, ভালো। লোকটি বলল, আপনার অবস্থা কী? তিনি মুচকি হেসে বললেন, তুমি আমার অবস্থা জানতে চাও? আচ্ছা মনে করো, যদি কিছু মানুষ নৌকায় চড়ে সমুদ্রের মাঝখানে চলে যায়। এরপর নৌকা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং যাত্রীদের প্রত্যেকেই এক একটি তক্তা জড়িয়ে ধরে ভাসতে থাকে, তাহলে তোমার নিকট তাদের অবস্থা কেমন মনে হবে? লোকটি বলল, তাদের অবস্থা তো সংকটাপন্ন। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তাদের চেয়েও মারাত্মক। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৫৮)

একবার হযরত উমর ইবনে আবদুল আযিয (র)-এর এক বাঁদি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে সালাম করল। এরপর ঘর সংলগ্ন মসজিদে দু'রাকআত নামায পড়ে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল। স্বপ্নে সে কান্নাকাটি করল। ঘুম ভাঙার পর সে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আমি স্বপ্নে এক আশ্চর্য বিষয় দেখেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী দেখেছ? বাঁদি বলল, আমীরুল মুমিমীন! আমি দেখলাম, জাহান্নাম জাহান্নামীদের জন্য দাউ দাউ করে জ্বলছে। এরপর পুলসিরাত এনে তার পৃষ্ঠে স্থাপন করা হলো। খলিফা বললেন, এরপর কী হলো? সে বলল, এরপর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানকে এনে পুলসিরাতের উপর ছেড়ে দেওয়া হলো, সে কিছুদূর অগ্রসর হতেই পুলসিরাত উল্টে গেল এবং সে

জাহান্নামে পতিত হলো। খলিফা বললেন, এরপর কী হলো? বাঁদি বলল, এরপর আবদুল মালেকের পুত্র ওয়ালীদকে এনে পুলসিরাতের উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। সে-ও কিছুদূর অগ্রসর হতেই পুলসিরাত কাত হয়ে জাহান্নামে পতিত হলো। খলিফা বললেন, এরপর কী হলো? সে বলল, ওয়ালীদের পর সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিককে এনে পুলসিরাতের উপর ছেড়ে দেওয়া হলো। সেও কিছুদূর এগুতেই পুল বাঁকা হয়ে গেল এবং সে জাহান্নামে পড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কী দেখলে? বাঁদি বলল, এরপর আপনাকে আনা হলো। এতটুকু বলতেই খলিফা সজোরে এক চিৎকার দিয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তখন বাঁদি উঠে গিয়ে তাঁর কানে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, আমীরুল মুমিমীন! আল্লাহর কসম, আমি দেখেছি আপনি বেঁচে গেছেন। বাঁদি তাঁর কানে যতই বলে যাচ্ছিল, কিন্তু তিনি বরাবর চিৎকার করছিলেন এবং পা আছড়াচ্ছিলেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৯ : ২৫৮)

বর্ণিত আছে, হযরত উয়াইস করনী (র) হযরত কাস (র)-এর নিকট হাজির হতেন। কাস (র) দোযখের আলোচনা করলে তিনি চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতেন। তখন লোকেরা তাকে পাগল বলে সম্বোধন করতো।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, মুমিনের ভয় ততক্ষণ দূর হয় না যতক্ষণ সে জাহান্নামের পুল অতিক্রম না করে। (তাফসীরে আবু হাতেম : ১৯২৭০, হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ৩১)

হযরত তাউস (র)-এর জন্য বিছানা করা হলে তিনি তাতে উত্তপ্ত কড়াইয়ে দানার ন্যায় এদিক-ওদিক গড়াগড়ি করতেন। এরপর লাফিয়ে উঠে তাকে জড়িয়ে ধরতেন এবং সকাল পর্যন্ত কিবলার দিকে মুখ করে থাকতেন। তিনি বলতেন, জাহান্নামের বর্ণনা খওফকারীদের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। (তাহাজ্জুদ ওয়া কিয়ামুল লাইল : ৯১)

হাসান বসরী (র) বলেন, জাহান্নাম থেকে এক ব্যক্তি এক হাজার বছর পরে মুক্তি পাবে। হায়! আমিই যদি সে ব্যক্তি হতাম! (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫০)

তিনি অনন্তকাল জাহান্নামবাসের এবং অন্তিমমুহূর্ত মন্দ হওয়ার ভয়ে এমন কথা বলতেন। বর্ণিত আছে, তিনি চল্লিশ বছর পর্যন্ত হাসেননি। রাবী বলেন, আমি যখন তাকে বসা অবস্থায় দেখতাম, তখন মনে হত যেন

তিনি বন্দি এবং ঘাড় মটকে দেওয়ার জন্য ধরা পড়েছেন। তিনি ওয়ায-নসীহত করলে মনে হত যেন পরকালকে সামনে দেখতে পাচ্ছেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় তার অবস্থা বর্ণনা করে যাচ্ছেন। আর যখন চুপ হয়ে যেতেন, তখন মনে হতো তিনি যেন দোযখের উত্তপ্ত আগুন দেখছেন। (কূতুল কুলূব : ১ : ২১৮)

ইবনে সাম্মাক (র) বলেন, এক মজলিসে আমি ওয়াজ করলাম। শ্রোতাদের মধ্য থেকে এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল, হে আবুল আব্বাস! আজ আপনি ওয়াজে একটি কথা বলেছেন, যার পর অন্য কিছু না শুনলেও আমাদের পরওয়া ছিল না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কথাটি কী? সে বলল, আপনি বলেছেন, অনন্তকাল জান্নাতবাস কিংবা অনন্তকাল জাহান্নামবাস খওফকারীদের অন্তর বিদীর্ণ করে দিয়েছে। ইবনে সাম্মাক (র) বলেন, এরপর যুবক চলে গেল। পরবর্তী ওয়াযে আমি তাকে অনুপস্থিত দেখে লোকদের নিকট তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে জানা গেল, সে অসুস্থ। আমি তাকে দেখতে গেলাম এবং তার হালত জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, হে আবুল আব্বাস! আপনার সে কথার প্রতিক্রিয়াতেই এ অসুস্থতা। এরপর যুবক সেই রোগেই মারা গেল। আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তাআলা তোমার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? সে বলল, তিনি আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আপনার বাক্যের বদৌলতে জান্নাতে দাখিল করেছেন।

যা হোক, নবী, অলী, আলিম ও সৎব্যক্তিগণের ভয়ের অবস্থা এমন ছিল। সুতরাং আমাদের খওফ করা আরও বেশি জরুরি। এটা জরুরি নয় যে, গুনাহ অধিক হলেই কেবল খওফ করতে হবে। বরং অন্তর পরিষ্কার এবং মারেফাত পরিপূর্ণ হলেও খওফ করা উচিত। অধিক ইবাদত ও গুনাহের স্বল্পতা ভয়হীনতা দাবি করে না। বরং ভয়হীনতার কারণ হচ্ছে প্রবৃত্তির আনুগত্য, দুর্ভাগ্যের প্রাবল্য এবং অন্তর উদাসীন ও কঠোর হওয়ায় নিজের অবস্থা জানার ব্যাপারে অক্ষমতা। এমন ভয়হীন ব্যক্তি মৃত্যু ঘনিয়ে এলেও জাগ্রত হয় না, বেশি গুনাহ করেও কম্পিত হয় না এবং মন্দ পরিণামের আশঙ্কাও অনুভব করে না। এমতাবস্থায় যদি আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তার অবস্থা শুধরে দেন, তাহলেই তা সম্ভব। তাই এর জন্য দুআ ও আমল করা জরুরি। শুধু মৌখিক দুআ আল্লাহ তাআলা কবুল করেন না।

বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, আমরা যখন পৃথিবীতে সচ্ছলতা চাই তখন এর জন্য কত কাজকর্ম সম্পন্ন করি, জমিতে হাল চাষ করি, বীজ বপন করি, সেচ দেই এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য জলে ও স্থলে কত বিপদাপদের সম্মুখীন হই। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে কোনো উচ্চ ডিগ্রী নিতে চাইলে এর জন্য কত কঠোর সাধনা করি। পড়াশুনায় কত রাত নির্ঘুম কাটিয়ে দেই। জীবিকার তালাশে আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কত কষ্টই না স্বীকার করি। আল্লাহ তাআলা জীবিকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, একথা বিশ্বাস করে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকি না। বসে বসে আল্লাহর কাছে আরজ করি না যে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিকা দান করুন। কিন্তু যখন অনন্ত ও চিরস্থায়ী পারলৌকিক জীবনের সুখশান্তির কথা চিন্তা করি, তখন তার জন্যে শুধু মুখে এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হই যে, হে আল্লাহ! মাফ করুন! হে আল্লাহ! রহম করুন। এর জন্য যে কঠোর সাধনা ও আমলের দরকার সেদিকে মোটেই নজর দিই না। অথচ যে সত্তার নিকট আমরা আশাবাদী এবং যার নামে আমরা ধোঁকায় পড়ে আছি তিনি নিজে ইরশাদ করেন,

وَ اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى.

আর মানুষ তা-ই শুধু পায় যা সে চেষ্টা করে। (সূরা নাজম : ৩৯)

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ.

ধোঁকাবাজ যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা দিতে না পারে। (সূরা : লুকমান : ৩৩)

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ.

হে মানুষ! কীসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল? (সূরা ইনফিতার : ৬)

এসব উক্তির যে কোনো একটি আমাদেরকে আমাদের বিভ্রান্তি ও মিথ্যা আশা থেকে মুক্তি দিতে পারে। যদি আমরা খুব পরিশ্রম করি।

আমরা আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের তাওবা কবুল করেন এবং তাওবার আগ্রহ আমাদের মনের গভীরে গেঁথে দেন। আমরা যেন শুধু মৌখিক তাওবা করে ক্ষান্ত না হই। তা না হলে আমরা তাদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব, যারা কথা বলে, কাজ করে না, কানে শুনে,

মেনে চলে না এবং ওয়ায শুনে কান্নাকাটি করে, আমল করার জন্য সামান্য কষ্ট করতে চায় না।

সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদেরকে তাওফীক, সঠিক পথ প্রদর্শন ও অনুগ্রহ দান করেন।

ভয়কারীদের ঘটনা আমরা যা বর্ণনা করেছি এটাই যথেষ্ট। কারণ সচেতন অন্তর যা বলা হয় তা-ই গ্রহণ করে। আর গাফেল অন্তরকে উপদেশের সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেও সে অসচেতনই থেকে যায়।

ঈসা ইবনে মালিক খাওলানী (র) একবার বাইতুল মুকাদ্দাস -এর দরজায় একজন সাধককে বিমর্ষ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তার চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরে চলছিল। ঈসা (র) বলেন। তাকে দেখে আমার অন্তরে ভীতি সঞ্চারিত হলো। তখন আমি তাকে নসীহত করতে অনুরোধ করলাম। সে বললো, 'ভাই রে! তোমাকে আমি কী উপদেশ দিবো? তুমি সম্ভব হলে এমন লোকের মতো থেকো যে হিংস্র প্রাণির মতো যুগপৎ ভয়ে সতর্ক থাকে। একটু ভুল করলেই হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করবে। আবার ভুল করলে বিষাক্ত প্রাণির দংশনের শিকার হবে। এমন ব্যক্তি রাতে তটস্থ থাকে। আবার দিনে সতর্ক থাকে।' এই বলে সাধক প্রস্থান করতে উদ্যত হলেন। আমি তখন বললাম, আরও কিছু বললে আমি উপকৃত হবো। সে বললো 'তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির জন্য সামান্য পানিই অনেক। (আল উনসুল জালীল : ১ : ২৮৯)

সাধকের কথাই সঠিক। স্বচ্ছ অন্তর সামান্য ভয়েই বিগলিত হয়ে যায়। আর অচেতন অন্তর হাজারো উপদেশও উন্মুক্ত হয় না।

আর সাধক হিংস্র ও বিষাক্ত প্রাণির যে উদাহরণ দিয়েছেন তা স্রেফ কল্পনা নয়; বরং এটাই বাস্তব। আপনি অন্তর্চক্ষু দিয়ে তাকালে দেখতে পাবেন ক্রোধ, প্রবৃত্তি, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, লৌকিকতার মতো কত হিংস্র ও বিষাক্ত প্রাণী আপনার আশেপাশে বিচরণ করছে। যে কোনো মুহূর্তে আপনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সেগুলো সদা-সর্বদা প্রস্তুত। চোখের সামনে থেকে পর্দা সরে যাবে ও আপনাকে কবরে রাখা হবে তখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। কিন্তু সেগুলো প্রতিহত করার কোনো ক্ষমতা তখন থাকবে না। সুতরাং এখন সময় থাকতেই সেগুলো প্রতিহত করা উচিত। আল্লাহ তাআলার প্রতি আশা ও ভয় আমাদের মনে চির জাগরুক থাকুক। আল্লাহ তাআলা আমাদের তাওফীক দান করুন।

# নিয়ত, আন্তরিকতা ও সত্যবাদিতা

আধ্যাত্মিক লোকদের নিকট ঈমানের রশ্মি ও কুরআনের আলোকে একথা পরিষ্কার যে, ইলম ও আমল ছাড়া উভয় জাহানের সফলতা লাভ করা যায় না। কারণ, আলেমগণ ব্যতীত সমস্ত মানুষ ধ্বংসের পথে রয়েছে। আবার আলেমদের মধ্যেও আমলহীন সবাই ধ্বংসের পথে রয়েছে। আবার নিষ্ঠাবান আমলকারী ব্যতীত সকল আমলকারীও ধ্বংসের পথে। অন্যদিকে নিষ্ঠাবান লোকেরাও ভয়ংকর বিপদের সম্মুখীন।

মোটকথা, নিয়তবিহীন আমল শুধুই বৃথাপরিশ্রম। আন্তরিকতা ব্যতীত নিয়ত শুধুমাত্র লৌকিকতা, কপটতা, গুনাহ। আবার সত্যবাদিতা ব্যতীত নিষ্ঠাও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। সে হিসেবে গায়রুল্লাহর নিয়ত মিশ্রিত আমল সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ قَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا.

"আমি তাদের কৃতকর্মের প্রতি লক্ষ করব, অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব।" (সূরা ফুরকান : ২৩)

আমরা জানি না, যে ব্যক্তি নিয়তের স্বরূপ জানে না, সে কীভাবে তা পরিশুদ্ধ করবে? নিষ্ঠা সম্পর্কে যে অবগত নয়, সে কীভাবে নিষ্ঠা পালন করবে এবং যে সত্যবাদিতার অর্থই বুঝে না, সে কীভাবে সত্যবাদী হবে? সুতরাং

আল্লাহর ইবাদতের জন্য প্রথমে নিয়ত শিক্ষা করতে হবে, এরপর নিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার স্বরূপ জানতে হবে। তাই আমরা এই বিষয়বস্তুগুলো এপর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ!

## নিয়তের ফযিলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ.

তাদেরকে আপনি তাড়িয়ে দেবেন না, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের রবকে ডাকে। তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। (সূরা আনয়াম : ৫২)

এ আয়াতে 'ইরাদা' অর্থাৎ, কামনা করার অর্থ নিয়ত করা।

রাসূলে আকরাম (স) বলেন,

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ فَهِجْرَتُهٗ اِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهٗ اِلَى دُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَّنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهٗ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ.

নিয়তের ওপরই আমল নির্ভরশীল। সুতরাং, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও রাসূলের উদ্দেশ্যে হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়তে অথবা কোনো মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত সে হিসেবেই গণ্য হবে। (সহিহ বুখারী : ১ ও সহিহ মুসলিম : ১৯০৭)

অন্য এক হাদিসে বলা হয়েছে, আমার উম্মতের অধিকাংশ শহীদ বিছানায় মৃত্যুবরণ করবে এবং অনেকে দু'সারির মধ্যখানে নিহত হবে। আল্লাহ জানেন তার নিয়ত কী ছিল। (মুসনাদে আহমদ : ১ : ৩৯৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا.

"যদি উভয়পক্ষ সংশোধনের ইচ্ছা করে, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে তাওফীক দান করবেন।" (সূরা নিসা : ৩৫)

নিয়তকে এখানে তাওফীকপ্রাপ্তির কারণ বলা হয়েছে।

রাসূলে কারীম (স) বলেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

আল্লাহ তাআলা তোমাদের চেহারা ও ধনদৌলত দেখেন না; বরং তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন। (সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪)

অন্তরকে দেখার কারণ এই যে, অন্তর হলো নিয়তের কেন্দ্র। এক হাদিসে আছে, বান্দা সৎকাজ সম্পাদন করে। ফেরেশতারা সেগুলো মোহরকৃত থলের মধ্যে নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে চলে যায় এবং আল্লাহ তাআলার সামনে পেশ করে। ইরশাদ হয়, এই থলে দূরে নিক্ষেপ করো। কেননা, এতে যেসব আমল রয়েছে, সেগুলো আমার জন্য করা হয়নি। এরপর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদেরকে হুকুম করেন, এই লোকের জন্য এমন এমন আমল লিখো। ফেরেশতারা আরয করে, হে রব! এ লোক তো এসব আমল করেনি। আল্লাহ বলেন, সে এসব কাজের নিয়ত করেছিল। (দারাকুতনী : ১ : ৫১)

এক হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, মানুষ চার প্রকার। এক, যাকে আল্লাহ তাআলা ইলম ও ধনসম্পদ দিয়েছেন। সে ইলম অনুযায়ী নিজের ধনসম্পদ সৎপথে ব্যয় করে। তা দেখে দ্বিতীয় প্রকার ব্যক্তি বলে, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকেও এ ব্যক্তির মতো ইলম ও ধনসম্পদ দান করেন, তবে আমিও তাই করবো, যা সে করে। এই উভয় প্রকার মানুষ সমান সমান সওয়াব পাবে। তৃতীয় প্রকার সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা ধনসম্পদ দান করেছেন, কিন্তু ইলম দান করেননি। সে মূর্খতাবশত নিজের ধনসম্পদ বাজে কাজে উড়ায়। এটা দেখে চতুর্থ প্রকার ব্যক্তি বলে, আল্লাহ আমাকে ধনসম্পদ দিলে আমিও তাই করব, যা এ ব্যক্তি করে। এরা উভয়েই গুনাহে সমান অংশীদার হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪২২৮)

লক্ষণীয় যে, কেবল নিয়তের কারণেই সৎকর্ম ও অসৎকর্মে অংশীদার করা হয়েছে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর হাদিসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাবুক অভিযানে যাওয়ার সময় বললেন, মদীনায় কিছু লোক রয়েছে, যারা এখানে আমরা যা কিছু করছি অর্থাৎ, জনমানবহীন প্রান্তর অতিক্রম করা, জিহাদে কিছু ব্যায় করা, ক্ষুধায় কষ্ট করা ইত্যাদি সব কিছুতে আমাদের

আমলের সওয়াবের অংশীদার; অথচ তারা মদীনায়ই রয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, তা কীভাবে হয়? তারা তো আমাদের সাথে নেই। তিনি বললেন, অসুবিধার কারণে তারা আসতে পারেনি। তাই তারা ভালো নিয়তের কারণে সওয়াবের অংশীদার হয়ে গেছে। (সহিহ বুখারী : ৪৪২৩)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি কোনো উদ্দেশ্যে হিজরত করে, তাকে তা দেওয়া হয়। কোনো এক লোক হিজরত করে এক মহিলাকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে সে "মুহাজিরে উম্মে কায়স" নামে পরিচিত হয়ে যায়। (তাবারানি : ৯ : ১০৩)

হাদিসে এসেছে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলেও সে 'গাধার জন্য নিহত' বলেই প্রসিদ্ধ ছিল। কারণ সে গাধা কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই লড়াই করেছিল এবং এজন্যই নিহত হয়েছিল। তাই তার নিয়তের দিকে সম্বন্ধ করে তাকে এই নাম দেওয়া হয়। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ১০)

হযরত ওবাদা (রা)-এর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, সে তার নিয়ত মোতাবেকই প্রাপ্ত হবে। (সুনানে নাসায়ী : ৬ : ২৪)

হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) বলেন, একবার আমি আমার সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে এক ব্যক্তির সহযোগিতা চাইলাম। সে বললো, আমার জন্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলেই আমি যুদ্ধ করবো। আমি তা-ই করলাম। পরবর্তীকালে এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার নির্ধারিত পারিশ্রমিক ব্যতীত সে কিছুই পাবে না। (সুনানে আবি দাউদ : ২৫২৭)

বনী ইসরাঈলের আলোচনায় আছে, দুর্ভিক্ষের সময় এক লোক বালুর উপর দিয়ে যেতে যেতে মনে মনে বলে— এই বালু যদি শস্য হয়ে যেত, তাহলে আমি তা দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। আল্লাহ তাআলা তখনকার নবীর প্রতি ওহি পাঠালেন, এ লোককে বলে দিন, আল্লাহ তোমার দান মঞ্জুর করেছেন। ভালো নিয়তের কারণে তোমাকে এই সাওয়াব দিয়েছেন, যা এই পরিমাণ শস্য বণ্টন করলে দিতেন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ৮ : ১০)

বহু হাদিসে বলা হয়েছে,

مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا، كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً.

যে ব্যক্তি কোনো সৎকাজ করার নিয়ত করে কিন্তু সম্পন্ন করতে পারে না, তার জন্য সওয়াব লেখা হয়। (সহিহ বুখারী : ৫৪৯১; সহিহ মুসলিম : ১৩১)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে— যে ব্যক্তি দুনিয়ার নিয়ত করে, আল্লাহ তাআলা তার দৃষ্টির সম্মুখে দারিদ্র্য তুলে ধরেন এবং সে দুনিয়ার প্রতি প্রচুর আগ্রহ নিয়ে দুনিয়া বর্জন করে। পক্ষান্তরে যে পরকালের নিয়ত করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে প্রাচুর্য স্থাপন করে দেন এবং তার কাঙ্ক্ষিত সামগ্রী সরবরাহ করে দেন; কিন্তু সে দুনিয়াত্যাগী দরবেশ হয়ে মারা যায়। (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪১০৫)

হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর হাদিসে রয়েছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ (স) এক বাহিনীর কথা উল্লেখ করে বললেন, তারা মরুভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ধসে যাবে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যাদের জোর করে বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আনা হয়েছে। (তাদের কী অপরাধ?) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, নিয়তের ওপরই তাদের হাশর হবে। (সুনানে আবি দাউদ : ৪২৮৬)

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যোদ্ধারা নিয়তের ওপরই একে অপরকে হত্যা করে। (তারিখে দিমাশক : ১৭ : ৩৮৫)

অন্য এক হাদিসে আছে, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে দু'পক্ষ মুখোমুখি হয়, তখন ফেরেশতারা অবতরণ করে যোদ্ধাদেরকে স্তরে স্তরে সাজিয়ে লিখে। অর্থাৎ, অমুক লোক দুনিয়ার জন্য যুদ্ধ করে, অমুক আত্মগরিমার জন্য এবং অমুক হিংসার বশবর্তী হয়ে যুদ্ধ করে। সাবধান! কারও সম্পর্কে বলো না যে, সে আল্লাহর রাহে শহীদ হয়েছে। হ্যাঁ, যে লোক আল্লাহর কালাম সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। (সহিহ মুসলিম : ১৯০৪)

হযরত জাবের (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেন, কেয়ামত দিবসে বান্দা ওই অবস্থায়ই পুনরুত্থিত হবে যে অবস্থায় সে মারা যায়। (সহিহ মুসলিম : ২৮৭৮)

আবু বাকরা (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ.

যখন দুজন মুসলমান নিজ নিজ তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত লোক উভয়েই জাহান্নামে যাবে। সাহাবায়ে কেরাম (রা) জিজ্ঞেস করলেন, হত্যাকারী জাহান্নামী হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট, কিন্তু নিহত লোক জাহান্নামী হয় কেন? তিনি বললেন, এর কারণ হলো, সে, প্রতিপক্ষকে হত্যার ইচ্ছা করেছিল। (সহিহ বুখারী : ৩১ ও সহিহ মুসলিম : ২৮৮৮)

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি নির্ধারিত কোনো মহিলাকে কোনো মোহরানার ওপর বিয়ে করে এবং তা পরিশোধ করার নিয়ত না রাখে, সে ব্যভিচার করে। আর পরিশোধ না করার নিয়তে যে ধার নেয়, সে চোর। (মুসনাদে বাযযার : ৮৭২১)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে কেয়ামত দিবসে যখন উঠবে তখন তার সুগন্ধি মিশক আম্বর অপেক্ষাও উত্তম হবে। আর যে অন্যের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে কেয়ামত দিবসে তার দুর্গন্ধ মৃত ব্যক্তির দুর্গন্ধের চেয়েও অধিক হবে। (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক : ৪ : ৩১৯)

## নিয়তের ফযিলত সম্পর্কে সাহাবি ও বুযুর্গগণের বাণী

হযরত ওমর (রা) বলেন, সবচেয়ে উত্তম আমল হলো, যা আল্লাহ তাআলা ফরয করেছেন তা আদায় করা আর যা হারাম করেছেন, তা থেকে দূরে থাকা। যেসব বিষয় আল্লাহ তাআলার নিকট রয়েছে, সেগুলোতে নিয়ত সঠিক করতে হবে। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫৮)

সালেম ইবনে আবদুল্লাহ (র) হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে লিখেন, নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সাহায্য হয়ে থাকে। যার নিয়ত সঠিক হবে, তার জন্যে আল্লাহর সাহায্যও পূর্ণ হবে। যার নিয়তে ত্রুটি থাকবে, তার জন্যে সাহায্যও ত্রুটিযুক্ত হবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৫ : ২৮৫)

জনৈক বুযুর্গ বলেন, অনেক ছোটো কাজ নিয়তের কারণে বড় হয়ে যায় এবং অনেক বড় কাজ নিয়তের কারণে ছোট হয়ে যায়। (কূতুল কুলূব : ১ : ১৫৯)

দাউদ তাঈ (র) বলেন, যার নিয়ত শুদ্ধ হয়, তার দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দুনিয়ার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলেও তার নেক নিয়ত কোনো একদিন অবশ্যই তাকে সঠিক পথ দেখাবে। আর মূর্খের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। (কূতুল কুলূব)

হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, পূর্বেকার লোকেরা যত্নসহকারে নিয়ত শিখতেন, যেমন আজকাল তোমরা আমল শিখো। (কূতুল কুলূব)

জনৈক আলেম বলেন, কোনো কাজ করার পূর্বে তার জন্য নিয়ত অন্বেষণ করা উচিত। বান্দা যতক্ষণ নেক নিয়তের ওপর বহাল থাকে ততক্ষণ সে কল্যাণের মাঝে থাকে। (কূতুল কুলূব)

বর্ণিত আছে, জনৈক মুরিদ বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামের মজলিসে গিয়ে বলতো, আপনারা আমাকে এমন আমল শিক্ষা দিন, যা আমি সর্বদা আল্লাহ তাআলার জন্য করতে পারবো! আমি দিবস রজনির একটি মুহূর্তও আল্লাহর যিকিরশূন্য কাটাতে চাই না। তাকে বলা হতো, তুমি যথাসম্ভব ভালো কাজ করো। আর যখন তা সম্ভব হবে না তখন তার নিয়ত করো। কারণ নিয়তের কারণেও তুমি ভালো কাজের সাওয়াব পাবে। (কূতুল কুলূব)

জনৈক মনীষী বলেন, বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার নেয়ামতরাজি গণনাসীমার বাইরে। আর বান্দার অপরাধসমূহ এ পরিমাণ গোপন থাকে যা তারা নিজেরাও জানে না। এরপরও তারা সকাল সন্ধ্যা তওবা করলে তাদের যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা করা হয়। (কূতুল কুলূব)

হযরত ঈসা (আ) বলেন, সুসংবাদ ওই চক্ষুর জন্য যা অন্যায় কাজের সংকল্প না করে ভালো কাজের প্রতি ধাবিত হয়ে নিদ্রায় যায়। (শুআবুল ঈমান : ৬৯০২)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ.

আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যতক্ষণ না আমি জেনে নেই তোমাদের মধ্যে জিহাদকারী ও ধৈর্যশীলদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের বিষয়ে যাচাই করি। (সূরা মুহাম্মদ : ৩১)

হযরত ফুযাইল ইবনে আয়ায (র) এই আয়াতটি বারবার তেলাওয়াত করতেন এবং কেঁদে কেঁদে বলতেন, হে রব! আপনি যদি আমাদের পরীক্ষা নেন তাহলে তো আমরা লাঞ্ছিত হবো এবং আমাদের গোপনে করা অপরাধগুলো প্রকাশ পেয়ে যাবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৮ : ১১১)

হযরত হাসান (র) বলেন, নিয়তগুণে জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৬০)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তাওরাতে রয়েছে, (আল্লাহ তাআলা বলেন) আমার সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করা হয় তা সামান্য হলেও অনেক আর যে কাজ আমি ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে করা হয় তা অনেক হলেও সামান্য।

বেলাল ইবনে সাদ (র) বলেন, বান্দা ঈমানদারের মতো কথাবার্তা বলে; কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার আমল না দেখে তাকে এবং তার কথাবার্তাকে ছাড়পত্র দেন না। যদি সে আমল করে, তাহলে তার তাকওয়া দেখেন। যদি তাকওয়া থাকে, তবে নিয়ত দেখেন। নিয়ত সঠিক হলে তার যাবতীয় কাজ সঠিক হয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৩ : ৩৩০)

আমল ভালো হওয়ার জন্য নিয়ত ভালো হতে হবে। নিয়ত নিজেই উত্তম, যদিও কোনো বাধার কারণে আমল না হয়।

## নিয়তের প্রকৃতি

নিয়ত, ইরাদা বা ইচ্ছা— এগুলো আরবি ভাষার সমর্থক শব্দ। এটা ইলম ও আমলের মধ্যবর্তী একটি আন্তরিক গুণ। ইলম আগে এবং আমল পরে আসে। কারণ, আমল হচ্ছে এই গুণের ফল ও শাখা। কোনো আমল সম্পন্ন হওয়ার জন্য তিনটি বিষয় থাকতে হবে— ইলম, ইচ্ছা ও ক্ষমতা। কেননা, মানুষ যে কাজের ইলম রাখে না, তা করার ইচ্ছা করে না।

কাজেই কোনো কাজ করার জন্য সে সম্পর্কে ইলম থাকতে হবে। আবার মানুষ অনিচ্ছায় কোনো কাজ করে না, কাজেই ইচ্ছাও থাকতে হবে। ইচ্ছা থাকার অর্থ হলো, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে মনঃপূত কোনো কাজের প্রতি অন্তর উদ্বুদ্ধ হওয়া। মানুষকে এভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, কিছু জিনিস তার মনঃপূত হবে আর কিছু জিনিস প্রতিকূল হবে। কাজেই তার মনঃপূত বিষয়ের প্রতি ঝোঁকা এবং প্রতিকূল বিষয় থেকে বিরত থাকাই স্বাভাবিক। এজন্য কোনটি তার জন্য উপকারী আর কোনটি ক্ষতিকর তা জানতে হবে, যাতে সে উপকারী বিষয় গ্রহণ করতে এবং ক্ষতিকর বিষয় থেকে দূরে থাকতে পারে। যেমন, মানুষ খাদ্যবস্তুকে না দেখলে ও না জানলে তা খাওয়া তার জন্য সম্ভব নয়। তদ্রূপ কেউ আগুন না দেখলে তা থেকে দূরে

থাকাও সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তাআলা হেদায়াত ও মারেফাত সৃষ্টি করে সেগুলো অর্জনের জন্য কিছু মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর সেগুলো হলো, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়সমূহ।

খাদ্যবস্তুকে দেখা ও জানাও যথেষ্ট নয় যে পর্যন্ত তা খাওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি না হয়। উদাহরণত অসুস্থ ব্যক্তি খাবার দেখে এবং সে জানে যে, এই খাবার তার উপযোগী। এতদসত্ত্বেও আগ্রহ না থাকায় সে খায় না।

আবার আগ্রহও খাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, যে পর্যন্ত শক্তি না থাকে। যেমন, পঙ্গু ব্যক্তি খাদ্য চিনে এবং তা খাওয়ার ইচ্ছাও রাখে; কিন্তু পঙ্গুত্বের কারণে খাদ্য পর্যন্ত পৌঁছে খেতে পারে না। এ অসুবিধা দূরীকরণার্থে কর্মক্ষম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৃজিত হয়েছে। সুতরাং ক্ষমতা ব্যতীত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গতিশীল হয় না। ক্ষমতা ইচ্ছার অপেক্ষায় থাকে এবং ইচ্ছা ইলম অথবা 'যন' ও 'ইতেকাদ'-এর পরে জাগ্রত হয়।

'যন' ও ইতেকাদ' হলো, কারও অন্তরে এ ধারণা গেঁথে যাওয়া যে, জিনিসটি আমার জন্য উপকারী। যখন এ বিষয়টি অন্তরে দৃঢ়ভাবে বসে যাবে তখনই ইচ্ছা জাগ্রত হবে। আর যখন ইচ্ছা জাগ্রত হয় তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা তৈরি হয়। সুতরাং বোঝা গেল, ক্ষমতা ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল, আর ইচ্ছা ইলম ও মারেফাতের পরেই জাগ্রত হয়।

সুতরাং নিয়তের অর্থ দাঁড়ালো, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে উপকারী কোনো বস্তুর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে অন্তরে ইচ্ছা জাগ্রত হওয়া।

অতএব, কোনো কাজের জন্য উদ্দীপক থাকা প্রয়োজন। আর সেই উদ্দীপকটিই হলো পরিকল্পিত উদ্দেশ্য। অতঃপর সে কাজের জন্য ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এরপর সেই ইচ্ছার সহায়তায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের ক্ষমতা লাভ হয়। আর কাজের উদ্দীপক কখনো একটি হয়। আবার কখনো তা দুটি হয়ে একটি কর্মে একত্রিত হয়। দুটি উদ্দীপক একত্র হলে তা চার প্রকার। যথা—

**প্রথম প্রকার :** একটি মাত্র উদ্দীপক হবে, এর উদাহরণ হলো, যখন কারও ওপর কোনো হিংস্র প্রাণী আক্রমণ করে। তখন সে প্রাণীটিকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়ায়। হিংস্র প্রাণী থেকে পলায়ন ভিন্ন তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে না। কারণ সে প্রাণীটিকে দেখে এবং তাকে ক্ষতিকর বলে জানে।

ফলে তার মাঝে পলায়নের ইচ্ছা জাগ্রত হয়। আর এ ইচ্ছার সহায়তায় সে পলায়নের ক্ষমতা লাভ করে। এখানে প্রাণীটি থেকে পলায়নই তার নিয়ত। তার দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে অন্য কোনো নিয়ত নেই। এ ধরনের নিয়তকে খালেস বা খাঁটি নিয়ত আর এই নিয়ত মোতাবেক কাজ করাকে ইখলাস বলে।

**দ্বিতীয় প্রকার :** দুটি উদ্দীপক একত্রিত হবে, এবং প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে উদ্দীপক হওয়ার যোগ্য। এর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তির নিকট তার কোনো দরিদ্র আত্মীয় সাহায্য কামনা করলে সে তাকে সহযোগিতা করলো, এখানে উদ্দীপক মূলত দুটি, ১. দারিদ্র্য ও ২. আত্মীয়তা।

যদি কোনো অচেনা দরিদ্র ব্যক্তি তার নিকট সাহায্য চাইতো তাহলে সে তাকে সহযোগিতা করতো। আবার কোনো ধনী আত্মীয় তার নিকট সাহায্য চাইলেও সে সহযোগিতা করতো। এর আরেকটি উদাহরণ হলো, একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে চিকিৎসক খাবার পরিহার করতে বললো, অপরদিকে আরাফার দিন চলে এলো, তাই সে রোযা রাখলো, এখানে উদ্দীপক দুটি, ১. অসুস্থতা এবং ২. আরাফার দিন চলে আসা। অসুস্থ না হলেও সে আরাফার দিনের সম্মানে রোযা রাখতো। আবার আরাফার দিন না হলেও অসুস্থতার কারণে সে খাবার বর্জন করতো।

**তৃতীয় প্রকার :** দুটি উদ্দীপক একত্রিত হবে, কিন্তু কোনোটিই স্বতন্ত্রভাবে উদ্দীপক হওয়ার উপযুক্ত নয়। এর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তির নিকট তার কোনো ধনী আত্মীয় এসে এক দিরহাম চাইলে সে প্রদান করলো না। এরপর এক অচেনা দরিদ্র এসে চাইলো। এবারও সে প্রদান করলো না। অতঃপর তার কোনো দরিদ্র আত্মীয় এসে চাইলো আর সে এক দেরহাম প্রদান করলো। লক্ষণীয় যে, এখানে দুটি উদ্দীপক তথা দারিদ্র্য ও আত্মীয়তা একত্রিত হওয়ার পরই সে দেরহাম প্রদানে সম্মত হয়েছে। উদ্দীপক দুটি স্বতন্ত্রভাবে তার সামনে এলেও সে দেরহাম প্রদান করেনি।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তি সওয়াব ও লোকদের প্রশংসা উভয়টি অর্জনের লক্ষ্যে দানখয়রাত করলো। এখানে উদ্দীপক দুটি, ১. সওয়াব এবং ২. লোকদের প্রশংসা। দুটি উদ্দীপক একত্রিত হয়েছে বলেই সে সদকা প্রদান করেছে, স্বতন্ত্রভাবে কোনো একটি উদ্দীপকের কারণে সে সদকা প্রদান করতো না।

**চতুর্থ প্রকার :** দুটি উদ্দীপকের একটি স্বতন্ত্রভাবে উদ্দীপক হওয়ার উপযুক্ত কিন্তু অপরটি উপযুক্ত নয়। এর উদাহরণ হলো, এক ব্যক্তির নামায ও সদকার নির্ধারিত অযীফা রয়েছে। ঘটনাক্রমে নামায বা সদকার জন্য তার নির্ধারিত সময়ে কিছু লোক তার কাছে উপস্থিত হলো এবং সে তাদের সামনেই তার অযীফা আদায় করলো। ফলে তাদের দেখার কারণে তার অযিফা হালকা হয়ে গেল। অথচ সে বিশ্বাস করে যে, এসমস্ত লোকেরা না এলে সে অযীফা আদায়ে অবহেলা করতো না। সে এটাও জানে, তার আমলটি নির্দিষ্ট ওযিফা না হলে শুধুমাত্র তাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তা আদায় করতো না।

মোটকথা, এখানে উদ্দেশ্য হলো, নিয়তের প্রকার বর্ণনা করা। কারণ আমল নিয়তের অনুগামী হয়। এবং নিয়তের ভিত্তিতেই আমলের বিধান আরোপিত হয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ, কাজ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। (সহিহ বুখারী : ১)

## আমলের চেয়ে নিয়ত উৎকৃষ্ট

হাদিসে এসেছে,

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ

মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে উৎকৃষ্ট।

হাদিসে উল্লিখিত এ বাণীর মর্ম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেই অভিমত প্রকাশ করেন যে, নিয়তকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণ হলো, নিয়ত একটি গোপন বিষয়। আল্লাহ তাআলা ছাড়া কেউ তা জানে না। অপরদিকে আমল প্রকাশ্য বিষয়। তবে গোপন আমলের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এখানে তা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এতে জনকল্যাণমূলক কাজ নিয়ে চিন্তাভাবনার নিয়ত স্বয়ং চিন্তাভাবনার চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। কখনো ধারণা করা হয় যে, নিয়তের প্রাধান্যের কারণ হচ্ছে নিয়ত আমলের পরিণতি পর্যন্ত থাকে, আর আমল সর্বক্ষণ থাকে না। এ ধারণাও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এতে অধিক আমল কম আমলের চেয়ে উত্তম হওয়া জরুরি হয়ে পড়ে। এ ছাড়া নিয়ত সর্বক্ষণ থাকাও অপরিহার্য নয়। কেননা, নামাযের আমলের নিয়ত কখনো কয়েক মুহূর্ত পর্যন্ত থাকে কিন্তু আমল অনেকক্ষণ

থাকে। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ এই যে, শুধু নিয়ত এমন আমলের চেয়ে উত্তম, যাতে নিয়ত থাকে না। এ ধরনের আমল ইবাদত নয়; কিন্তু নিয়ত সর্বাবস্থায় ইবাদত— আমল হোক বা না হোক। উদ্দেশ্য হলো, যে ইবাদতে নিয়ত ও আমল উভয়টি থাকে, তাতে নিয়ত আমলের চেয়ে উৎকৃষ্ট। সুতরাং হাদিসের অর্থ হলো, মুমিনের নিয়ত, যা তার ইবাদতের একটি অংশ, সেই আমলের চেয়ে উত্তম, যা তার ইবাদতেরই অংশ।

বস্তুত আমলের ওপর নিয়তের প্রাধান্য পাওয়ার যথার্থ কারণ কেবল তাঁদের কাছেই স্পষ্ট হয়, যারা দীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম সম্পর্কে অবগত। উদাহরণত যে ব্যক্তি রুটিকে ফল-ফলাদির চেয়ে উত্তম বলে তার উদ্দেশ্য হলো, খোরাক ও আহার্য গ্রহণের বিবেচনায় রুটি উত্তম। আর এ সম্পর্কে কেবল সেই অবগত হয় যে জানে যে, সুস্থতা ও বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যেই আহার্য গ্রহণ করা হয়।

আনুগত্য হলো অন্তরের রসদ, যার উদ্দেশ্য অন্তরের সুস্থতা ও স্থায়ীত্ব, পরকালীন সৌভাগ্য এবং আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভে ধন্য হওয়া। আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভে ওই ব্যক্তিই ধন্য হয় যে আল্লাহকে ভালোবেসে মৃত্যুবরণ করে। আর আল্লাহকে সেই ভালোবাসে যে তাঁকে চেনে। আর আল্লাহ তাআলার পরিচিতি কেবল সেই লাভ করে, যে দীর্ঘ সময় তাঁর যিকিরে মগ্ন থাকে, এর জন্য দুনিয়ার যাবতীয় ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকা প্রয়োজন। আর এটা তখনই সম্ভব যখন দুনিয়ার প্রতি বিন্দুমাত্র লালসা থাকবে না। তাহলেই কেবল কল্যাণের দিকে ধাবিত হওয়া সম্ভব।

আল্লাহ তাআলার মারেফাত লাভের পর যখন তাঁর প্রতি আকর্ষণ তৈরি হয় তখন আমলের ওপর অটল থাকার মাধ্যমে তা আরও সুদৃঢ় হয়। কারণ অন্তরের চাহিদা ও ইচ্ছে অনুযায়ী আমল অন্তরের খাদ্য স্বরূপ। উদাহরণত, যে ব্যক্তি ইলম বা নেতৃত্ব কামনা করে, প্রাথমিক অবস্থায় তার এই কামনা দুর্বল থাকে, কিন্তু যখন সে ইলম বা নেতৃত্বের চাহিদা মোতাবেক কাজ করে তখন তার এ কামনা ও আগ্রহ মজবুত হয়। পক্ষান্তরে ইলম বা নেতৃত্বের চাহিদার বিপরীত কাজ করলে তার আগ্রহ আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। এমনকি এক পর্যায়ে সেই আগ্রহ নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনিভাবে সুন্দর চেহারার অধিকারী কাউকে দেখার পর তার প্রতি যে আকর্ষণ তৈরি হয় তা প্রাথমিক অবস্থায় দুর্বল থাকে। এরপর যখন তার সাথে ওঠাবসা

করা হয় তখন তা মজবুত হয়ে যায়। এমনকি এক পর্যায়ে তার এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু যদি সে শুরুতেই তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাথে ওঠাবসা না করে তাহলে এক সময়ে তার আকর্ষণ ফুরিয়ে যাবে।

বস্তুত আখেরাত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় নেককাজ ও আনুগত্য করা হয়। আর গর্হিত কাজকর্ম দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। অন্তর যখন নেককাজের প্রতি ধাবিত হয় এবং গর্হিত কাজ থেকে বিমুখ হয় তখনই বান্দা যিকিরের অবকাশ পায়। নেককাজের ওপর অবিচল থাকা এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা অশ্লীল কর্ম পরিহার করার মাধ্যমে তা দৃঢ়তা লাভ করে। কারণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও অন্তরের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যই কোনো অঙ্গে ব্যথ্য পেলে তা অন্তরে অনুভূত হয়। আর অন্তর কোনো কারণে ব্যথিত হলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভাবিত হয়, ফলে কখনো দেহের রং পরিবর্তন হয়ে যায়। কখনো দেহে কম্পন সৃষ্টি হয়। তবে অন্তর আমীর বা রাখালের মতো। আর বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রজাতুল্য। অন্তর যা নির্দেশ করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তা পালন করে। কাজেই বলা যায়, অন্তর হলো মূল লক্ষ্য আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেই লক্ষ্য পর্যন্ত পৌছার মাধ্যম। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلُحَتْ صَلَحَ لَهَا سَائِرُ الْجَسَدِ.

দেহে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, যখন সেটা ভালো থাকে তখন সমগ্র দেহ ভালো থাকে। (সহিহ বুখারী : ৫২; সহিহ মুসলিম : ১৫৯৯)

অন্য এক হাদিসে তিনি বলেন, اَللّٰهُمَّ أَصْلِحِ الرَاعِىَ وَالرَّعِيَةَ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আপনি রাজা ও প্রজাদের অবস্থা সংশোধন করুন। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ১০ : ১৭)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

"আল্লাহর নিকট পৌছায় না সেগুলোর গোশত এবং রক্ত; বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া।" (সূরা হজ : ৩৭)

তাকওয়া হচ্ছে অন্তরের আমল। অতএব, অন্তরের আমল সর্বাবস্থায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের চেয়ে উত্তম হবে। নিয়ত যেহেতু সৎকাজের প্রতি অন্তরের ইচ্ছাকে বলা হয়, সেজন্যই নিয়তের শ্রেষ্ঠত্বও অপরিহার্য। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আমলের উদ্দেশ্য হলো, অন্তরকে সৎকাজে অভ্যস্ত করা এবং সৎকর্মের ইচ্ছাকে মজবুত করা। কাজেই এই উদ্দেশ্যের দিক থেকে আমল উত্তম হবে। নিয়তে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। তাই নিয়তই শ্রেষ্ঠ হতে হবে। যেমন, পাকস্থলীতে ব্যথা হলে তার এক চিকিৎসা হচ্ছে, ওপরে ওষুধের প্রলেপ দেওয়া এবং অন্য চিকিৎসা হচ্ছে ওষুধ পান করানো, যা পেটে পৌঁছে যাবে। এখানে প্রলেপ দেওয়ার তুলনায় ওষুধ সেবন করা ভালো হবে। কেননা, ওষুধের ক্রিয়া পাকস্থলীতে পৌঁছানোই মুখ্য উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য ওষুধ সেবন করানোর মাধ্যমে হাসিল হয়। কারণ, এতে ওষুধ পাকস্থলীর সাথে মিলিত থাকে। কাজেই এটা খুবই উপকারী।

অনুরূপভাবে ইবাদতের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্তরের পরিবর্তন ও সদগুণাবলি অর্জন— অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কসরত নয়। যেমন, সিজদার উদ্দেশ্য মাটিতে কপাল ঠেকানো নয়; বরং অন্তরের গুণ নম্রতাকে মজবুত ও পাকাপোক্ত করা। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে নম্রতা অনুভব করে, সে যখন তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নম্রতা লাভে সহায়ক থাকার আকৃতি দেবে, তখন তার নম্রতা মজবুত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এতিমের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার অনুভব করে, এতিমের মাথায় হাত বুলাবে তখন তার অন্তরের গুণটি অধিক মজবুত হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় নিয়ত বিহীন আমল মোটেই উপকারী নয়। যেমন, কেউ এতিমের মাথায় হাত বুলায়; কিন্তু মন উদাসীন থাকে কিংবা মনে করে, সে কাপড়ের ওপর হাত বুলাচ্ছে। এরকম আমল দ্বারা অন্তরে এতটুকুও প্রভাব পড়বে না। অনুরূপভাবে যে লোক গাফেল অবস্থায় সিজদা করে এবং মন থাকে দুনিয়ার চিন্তায় ব্যস্ত, তার অন্তরেও সেজদার কোনো প্রভাব পড়বে না। আর নম্রতা মজবুত করতেও সহায়ক হবে না। উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ করলে এ ধরনের সিজদা করা না করা সমান। এরূপ সিজদাকে বাতিল ও বেকার বলা হয়। কিন্তু সিজদার উদ্দেশ্য যদি রিয়া হয় কিংবা কোনো ব্যক্তির প্রতি সম্মান দেখানো হয়, তবে তা করা না করা সমান হবে না; বরং

একটি গুনাহ বেড়ে যাবে। আমলের চেয়ে নিয়ত উত্তম হওয়ার এটাই মূল রহস্য। এ থেকে অন্য একটি হাদিসের অর্থও বোঝা যায়। বলা হয়েছে,

مَنْ هَمَّ حَسَنَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً.

যে ব্যক্তি সৎকাজের ইচ্ছা করে, এরপর তা করতে পারলো না, তার জন্যে নেকি লেখা হয়। (সহিহ বুখারী : ৬৪৯১ ও সহিহ মুসলিম : ১৩১)

কারণ, নিয়তের অর্থ হচ্ছে সৎকর্মের প্রতি অন্তরের টান, যা নিরেট সৎগুণ। আমল দ্বারা এই গুণ অধিক পাকাপোক্ত হয়ে যায়। যেমন, কুরবানীর জন্তু জবাই করার উদ্দেশ্য গোশত ও রক্ত নয়; বরং দুনিয়ার মহব্বত থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর রাহে জন্তুকে উৎসর্গ করা। এটা নিয়তও দৃঢ় ইচ্ছার সাথে সাথে হাসিল হয়ে যায়। যদিও কোনো সমস্যার কারণে জবাই নাও হয়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছিলেন, কিছু লোক মদীনায় থেকেও জিহাদে আমাদের সাথে অংশীদার। যেহেতু, তাদের নিয়তও তাদের মতো ছিল, যারা জিহাদে বের হয়েছিল। বিশেষ অসুবিধার কারণে তারা সশরীরে জিহাদে অংশ নিতে পারেনি।

## নিয়ত সম্পর্কিত আমলের বর্ণনা

আমল তিন প্রকার— পাপ, ইবাদত ও অনুমোদিত কাজ। নিয়তের কারণে এই তিন প্রকারের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে, তা এখানে বিস্তারিত তুলে ধরা হলো—

**প্রথম প্রকার :** পাপের ক্ষেত্রে নিয়তের ফলে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। সুতরাং إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ অর্থাৎ, নিয়তগুণেই কর্মের ফল, এ হাদিস শুনে যদি কোনো মূর্খ মনে করে, গুনাহ নিয়তের গুণে ইবাদত হয়ে যায়, এটা হবে নিরেট ভুল। যেমন, কেউ অন্য ব্যক্তির খাতিরে অন্যের গীবত করলে কিংবা অন্যের মাল ফকিরকে খাইয়ে দিলে কিংবা হারাম ধনসম্পদ দিয়ে মাদরাসা অথবা মসজিদ নির্মাণ করলে তা হবে অজ্ঞতার পরিচায়ক। নিয়তের গুণে এসব কাজের অন্যায় ও গুনাহ মাফ হবে না। বরং শরিয়তের ইচ্ছার বিপরীত এগুলোতে সৎকাজের নিয়ত করা স্বতন্ত্র গুনাহ। কেউ জেনেশুনে এরূপ করলে সে হবে শরিয়তের দুশমন। না জেনে করলে

অজ্ঞতার কারণে গুনাহগার হবে। কেননা, জ্ঞান হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। কোনটি সৎকর্ম, তা শরিয়তের মাধ্যমেই বোঝা যায়। সুতরাং যে কাজ অসৎ, তা কীভাবে সৎকর্ম হতে পারে?

বস্তুত মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকা কুপ্রবৃত্তিই তাকে এসব ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা, অন্তর যখন ক্ষমতালোভী হয়ে যায় এবং মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করার প্রতি ঝুঁকে পড়ে তখন শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়।

এ জন্যই হযরত সাহল তস্তরী (র) বলেন, মূর্খতাবশত আল্লাহর নাফরমানী অপেক্ষা বড় কোনো নাফরমানী নেই।

তাকে প্রশ্ন করা হলো, হে আবু মুহাম্মদ! মূর্খতার চেয়েও বড় কোনো অপরাধ রয়েছে কি? তিনি বললেন, নিজের মূর্খতা সম্পর্কে না জানা এর চেয়েও বড় অপরাধ। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫৩)

সাহল তস্তরী (র) যথার্থই বলেছেন, কারণ যে ব্যক্তি নিজের মূর্খতা সম্পর্কে না জেনে নিজেকে জ্ঞানী মনে করে সে কী শিখবে?

এমনিভাবে জেনেবুঝে আল্লাহর আনুগত্য করার চেয়ে বড় কোনো আনুগত্য নেই। আর প্রকৃত জ্ঞানী ওই ব্যক্তি যে জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা রাখে। কেননা, যে উপকারী ও ক্ষতিকর ইলমের মাঝে পার্থক্য করতে পারে না, সে সাধারণ মানুষের মতো অহেতুক জ্ঞান অর্জনে মগ্ন হয়ে পড়ে, যে জ্ঞান দ্বারা দুনিয়া লাভ করা গেলেও আখেরাতে তা কোনো কাজে আসবে না।

মোটকথা, যে ব্যক্তি অজ্ঞতার কারণে গুনাহ দ্বারা সৎকর্মের নিয়ত করবে, তার অজ্ঞতাজনিত আপত্তি গৃহীত হবে না। তবে এক অবস্থায় গৃহীত হতে পারে, যদি সে অল্প দিন পূর্বে ইসলাম কবুল করে থাকে এবং এরপর আর শিক্ষালাভের সুযোগ না পেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

তোমরা যদি না জানো তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো। (সূরা আম্বিয়া : ৭)

নবী কারীম (স) বলেন,

لَايُعْذَرُ الجَاهِلُ عَلَى الْجَهْلِ وَلَا يَحِلُّ لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ وَلَا لِلْعَالِمِ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ.

মূর্খ ব্যক্তি তার অজ্ঞতার কারণে ক্ষমার উপযোগী হবে না। মূর্খের জন্য মূর্খতার ওপর চুপ থাকা জায়েয নয়। অনুরূপ আলেমের জন্য নিজের ইলমের ব্যাপারে চুপ থাকা জায়েয নয়। (তাবারানি : ৫৩৬১)

যেমনিভাবে রাজা বাদশাহদের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অবৈধ সম্পদ দ্বারা মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণ করা হারাম, তেমনিভাবে ওলামায়ে কেরামের জন্য নির্বোধ ও দুষ্ট লোকদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হারাম, যারা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, মানুষকে শরিয়ত বিরোধী কাজে উৎসাহিত করে এবং রাজা বাদশাহ ও এতিম মিসকীনদের মাল জব্দ করে। কারণ, এসব লোকেরা ইলম শিখে আল্লাহর রাহে ডাকাতে পরিণত হয়। দাজ্জালের প্রতিনিধি হয়ে দেশে দেশে অন্যায় অবিচারের বিস্তার ঘটায়, প্রবৃত্তির অনুসারী হয় এবং তাকওয়া থেকে দূরে থাকে। মানুষ তাদের দেখে আল্লাহর নাফরমানি করার দুঃসাহস পায়। যারা তাদের থেকে জ্ঞান আহরণ করে তাদেরকে তারা অন্যায়ের বিস্তার ও প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যম বানায়। তারা পোশাক-আশাক, খাবার-দাবার ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ছাত্রদেরকে পাপকাজ শিক্ষা দেয়। ফলে পরবর্তীতে আগত সকলের গুনাহর দায়ভার তাদের ওপরই বর্তায়। এই আলেম মারা যায় কিন্তু তার পাপাচারের প্রভাব যুগ যুগ ধরে চলতে থাকে। সৌভাগ্যবান তো সেই ব্যক্তি যার মৃত্যুর সাথে সাথে তার গুনাহও মারা যায়।

বড়ই আশ্চর্যের কথা! এ ধরনের আলেমরা বলে, কাজ তো নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আমাদের নিয়ত সঠিক কারণ, আমরা মানুষকে জ্ঞান শিখিয়ে ইলমের বিস্তার ঘটাতে চেয়েছি। কেউ যদি আমাদের থেকে জ্ঞান লাভ করে তা অন্যায় কাজে ব্যবহার করে তাতে আমাদের কী অপরাধ? আমরা তো ভালো কাজেরই নিয়ত করেছি।

তাদের এ যুক্তি ধোপে টেকার মতো নয়, বাস্তব কথা হলো, ক্ষমতার লোভ, প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং অহংকার তাদেরকে এসব কথা বলতে প্ররোচিত করে। তারা এ প্রশ্নের কী উত্তর দিবে যে, যে ব্যক্তি কোনো ডাকাতকে তরবারি প্রদান করে, ঘোড়া এবং তার লক্ষ্য পূরণে সহায়ক প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করে দিয়ে বলে, আমি তো বদান্যতাস্বরূপ তাকে এগুলো দিয়েছি। বদান্যতা তো আল্লাহ তাআলারই একটি গুণ। আমি চেয়েছি, সে এই তরবারি ও ঘোড়াকে আল্লাহ রাস্তায় জিহাদে ব্যবহার করবে, তাছাড়া

যোদ্ধাদের জন্য ঘোড়া, লাগাম ইত্যাদি প্রস্তুত করে দেওয়া তো বড় সওয়াবের কাজ। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি যদি এগুলোকে ডাকাতির কাজে ব্যবহার করে তাহলে দাতার কী হুকুম?

ফুকাহায়ে কেরাম একমত যে, বদান্যতাকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পছন্দ করেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلَاثُ مِئَةِ خُلُقٍ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِوَاحِدٍ مِنْهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاَحَبُّهَا إِلَيْهِ السَّخَاءُ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার তিনশটি স্বভাব রয়েছে, যে ব্যক্তি সেগুলোর যেকোনো একটির কাছাকাছি চলে যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর তার সবচেয়ে প্রিয় স্বভাব হলো বদান্যতা। (কূতুল কুলূব : ২ : ৭৮)

এতদসত্ত্বেও অন্যায় করবে জেনে কাউকে দান করা হরাম।

ওই সকল আলেমদের কাছে প্রশ্ন, এই দান কেন হারাম? কেনই বা দাতাকে দানগ্রহীতার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে দান করতে বলা হয়েছে? অথএব, যদি জানা যায় যে, সে এই অস্ত্র অন্যায় কাজে ব্যবহার করবে তাহলে তাকে অস্ত্র দেওয়া তো দূরের কথা, বরং তার হাতে থাকা অস্ত্রও ছিনিয়ে নেওয়া ওয়াজিব।

ইলমও এক ধরনের অস্ত্র। এর মাধ্যমে শয়তান ও আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়। কখনো কখনো আলেম প্রবৃত্তির তাড়নায় পড়ে আল্লাহর দুশমনদের ইলম শিখিয়ে তাদের সাহায্য করে বসে।

এজন্য কাউকে ইলম শেখানোর পূর্বে যাচাই করে নেওয়া উচিত যে, সে এর উপযুক্ত কি না? সুতরাং যে ব্যক্তি দীনের ওপর দুনিয়াকে এবং আখেরাতের ওপর প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দেয় তাকে ইলম শিখিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণে সহায়তা করা কোনোভাবেই জায়েয হতে পারে না।

পূর্বেকার বুযুর্গগণের রীতি ছিল, তাঁরা তাঁদের মুরীদ, ছাত্র এবং মজলিসে আগত লোকদেরকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। কারও মাঝে কোনো একটি নফল আদায়ে ত্রুটি দেখতে পেলেও তার দায়িত্ব ছেড়ে দিতেন। আর কাউকে পাপাচারে লিপ্ত বা হারাম খেতে দেখলে মজলিস থেকে বের করে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতেন। ইলম শেখানো তো দূরের কথা,

তার সাথে কথাও বলতেন না। তাঁরা জানতেন, যে ব্যক্তি ইলম শিখে তদানুযায়ী আমল করে না, সে ইলমকে গর্হিত কাজের মাধ্যম বানাতে চায়। এজন্য সালফে সালেহীন পাপিষ্ট আলেম থেকে আল্লাহ তাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করতেন; পাপিষ্ঠ মূর্খ থেকে নয়।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি প্রতিনিয়ত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর খেদমতে উপস্থিত হতো। একদিনের ঘটনা, ওই ব্যক্তি তাঁর নিকট এলে তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, সে বারবার কারণ জানতে চাইলেও তিনি কোনো কথা বললেন না। অবশেষে বহু পীড়াপীড়ির পর তিনি বললেন, আমি জানতে পেরেছি, তুমি সড়ক থেকে মাটি নিয়ে তোমার ঘরের দেয়াল উঁচু করেছো, অথচ সড়কের মাটি মুসলমানদের সম্পদ। অতএব, তুমি এখন ইলম শেখার উপযুক্ত নও।

সালফে সালেহীন এভাবেই তাদের ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ করতেন। এ বিষয়গুলো নির্বোধ, ও শয়তানের অনুসারীদের বোধগম্য নয়। যদিও তারা লম্বালম্বা আলখেল্লা পরিধান করে এবং তুখোড় বাগ্মিতা ও দুনিয়াবী জ্ঞানের অধিকারী হয়।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, "নিয়তগুণে কর্ম" হাদিসটি বিশেষভাবে ইবাদত ও সমর্থনযোগ্য কর্মসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য— গুনাহের ক্ষেত্রে নয়। নিয়তের কারণে ইবাদত অপরাধ হয়ে যায় এবং নিয়তের কারণেই ইবাদত বহাল থাকে।

অনুমোদিত কর্মের প্রকৃতিও অনুরূপ অর্থাৎ, নিয়ত দ্বারা তা গুনাহ ও ইবাদত উভয়টিই হতে পারে। কিন্তু গুনাহ কোনোভাবেই ইবাদত হতে পারে না; বরং খারাপ নিয়তের কারণে তা মারাত্মক কবিরা গুনাহ হয়ে যেতে পারে।

**দ্বিতীয় প্রকার :** ইবাদত দুটি বিষয়ে নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত— বিশুদ্ধতা এবং অধিক সওয়াবপ্রাপ্তি। বিশুদ্ধ ইবাদত তখনই হবে, যখন আল্লাহর ইবাদতের নিয়ত করা হবে— অন্য কিছুর নয়। সুতরাং, রিয়া তথা লৌকিকতার নিয়ত করলে ইবাদত গুনাহে পরিণত হবে। ইবাদতের সওয়াব তখন হয়, যখন একই আমলে অনেক সৎকর্মের নিয়ত করা হয়। যত সৎকাজের নিয়ত করবে, প্রত্যেক নিয়তের জন্য পৃথক সওয়াব

মিলবে। কারণ, প্রত্যেক নিয়তই একটি নেকি। হাদিস অনুযায়ী প্রত্যেক নেকির পেছনে দশগুণ করে সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন, কোনো ব্যক্তি মসজিদে বসে অনেক সৎকর্মের নিয়ত করতে পারে।

**প্রথমত,** মসজিদে বসে আল্লাহর যিয়ারতের নিয়ত করবে। কারণ, মসজিদ আল্লাহর ঘর। যে এখানে আসে, আল্লাহর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। আল্লাহর রাসূল (স) বলেন,

مَنْ قَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَدْ زَارَ اللهَ تَعَالَى وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُوْرِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرَهُ.

অর্থাৎ, 'যে লোক মসজিদে বসে থাকে, সে মূলত আল্লাহর যিয়ারত করে। আর যার যিয়ারত করা হয়, তার কর্তব্য যিয়ারতকারীর ইজ্জত করা।' (সহিহ ইবনে হিব্বান : ২ : ৬২)

**দ্বিতীয়ত,** এক নামাযের পর অন্য নামাযের জন্য অপেক্ষা করার নিয়ত করবে, যাতে যতক্ষণ অপেক্ষা করা হয়, ততক্ষণই নামাযে থাকার সওয়াব পাওয়া যায়। কুরআন মাজীদে বর্ণিত رَابِطُوْا বাক্যে একথাই বোঝানো হয়েছে।

**তৃতীয়ত,** চোখ, কান, ও শরীরের অন্যান্য অঙ্গকে পাপ থেকে দূরে রেখে দুনিয়াত্যাগী হওয়ার নিয়ত করবে।

নবী কারিম (স) বলেন,

رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِيْ اَلْقُعُوْدُ فِي الْمَسَاجِدِ.

আমার উম্মতের সংসার বিরাগ হচ্ছে মসজিদে অবস্থান করা। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫৪)

**চতুর্থত,** সাহসিকতাকে আল্লাহ তাআলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা। আখেরাতের চিন্তার রহস্যকে তালাশ করা এবং যে সকল ব্যস্ততা তা থেকে বিরত রাখে সেগুলো দূর করা।

**পঞ্চমত,** আল্লাহর যিকিরের জন্য একাকী হওয়া। হাদিসে আছে—

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ لِيَذْكُرَ اللهَ تَعَالَى أَوْ يُذَكِّرَ بِهِ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ تَعَالَى.

অর্থাৎ, যে আল্লাহ তাআলার যিকির করার জন্য অথবা যিকিরের উপদেশ দেওয়ার জন্য মসজিদে যায়, সে আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫৪)

**ষষ্ঠত,** কোনো মুসলমান ভাইকে সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ করার নিয়ত করবে। কারণ, মসজিদে এমন লোকও অবস্থান করে, যারা ভালোভাবে নামায পড়তে পারে না কিংবা না জায়েয কাজকর্ম করে।

**সপ্তমত,** কোনো মুসলমান জ্ঞানী ভাইয়ের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নিয়ত করবে। কারণ, এটি একটি গনিমত ও আখেরাতের সম্পদ। কেননা, মসজিদে অনেক আল্লাহওয়ালা ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা অবস্থান করে থাকেন।

**অষ্টমত,** আল্লাহ তাআলার নিকট লজ্জিত হওয়ার ভয়ে গুনাহ বর্জনের নিয়ত করবে।

হযরত হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত মসজিদে যাতায়াত করে আল্লাহ তাআলা তাকে এই সাতটির যেকোনো একটি জিনিস দান করেন— ১. এমন ভাই যে তাকে দীনী বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিবে, ২. তার ওপর রহমত নাযিল হবে, ৩. তাকে অভিনব ইলম দান করা হবে, ৪. এমন কালেমা দান করা হবে যা তাকে হেদায়াতের পথ দেখাবে, ৫. এমন কালেমা যা তাকে অন্যায় অবিচার থেকে দূরে রাখবে, ৬. আল্লাহর ভয়ে অথবা ৭. অনুতপ্ত হয়ে গুনাহ বর্জন করবে। (আল-মুজামুল কাবীর : ৩ : ৮৮)

অনেক নিয়ত করার পদ্ধতি এটাই। সকল ইবাদতেই এরূপ মনে করা উচিত। কারণ, প্রত্যেক ইবাদতেই নানা ধরনের নিয়ত করার সম্ভাবনা থাকে।

বরং মুমিন বান্দা কল্যান কামনার ও সত্যের পথে চলার জন্য যত বেশি চেষ্টা করবে তার অন্তরে তত বেশি নিয়ত জাগ্রত হবে। এর মাধ্যমে তার আমল পরিশুদ্ধ হবে ও নেকি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

**তৃতীয় প্রকার :** সমর্থিত ও অনুমোদিত কর্মসমূহের মধ্যেও এরূপ একাধিক নিয়ত হতে পারে। ফলে, সমর্থিত কাজও শ্রেষ্ঠ ইবাদতে পরিণত হওয়া সম্ভব। তাদের জন্য বড় অনিষ্ট, যারা এ বিষয়ে উদাসীন। কিয়ামাতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে, কী নিয়তে এসব কাজকর্ম করা হয়েছিল? এটা সেই অনুমোদিত কাজের ক্ষেত্রে, যাতে কারাহাতের বা অসমর্থিত বিষয়ের মিশ্রণ নেই। তাই রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

حَلَالُهَا حِسَابٌ وَحَرَامُهَا عِقَابٌ.

অর্থাৎ, এর হালালে আছে হিসাব এবং হারামে আছে শাস্তি। (মুসনাদুল ফিরদাউস : ৮১৯২)

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা)-এর হাদিসে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى عَنْ كُحْلِ عَيْنَيْهِ، وَعَنْ فُتَاتِ الطِّيْنَةِ بِأُصْبَعِيْهِ وَعَنْ لَمْسِهِ ثَوْبَ أَخِيْهِ.

কিয়ামাতের দিন বান্দাকে প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, এমনকি নিজের চোখের সুরমা, আঙ্গুলের দ্বারা মাটি খোঁড়া এবং নিজের ভাইয়ের কাপড় স্পর্শ করা সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ৩১)

অন্য এক হাদিসে আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, সে কিয়ামাতের দিন যখন উঠবে তখন তার সুগন্ধি মিশক আম্বরের চেয়েও উত্তম হবে। আর যে অন্যের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করে, কিয়ামাতের দিন তার দুর্গন্ধ মৃত অপেক্ষা অধিক হবে। (মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ৪ : ৩১৯) সুগন্ধি ব্যবহার করা একটি অনুমোদিত কাজ। কিন্তু তাতে ভালো নিয়ত থাকতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে, সুগন্ধি ব্যবহার একটি চিত্ত বিনোদনের কাজ। তা কীরূপে আল্লাহর জন্য হতে পারে? এর জবাব হলো, যে ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করে, তার উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব আনন্দ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করা অথবা গর্ব কিংবা মানুষকে দেখানো হতে পারে এবং মানুষ তাকে সুগন্ধিপ্রিয় ও রুচিশীল বলে প্রশংসা করে। অথবা তার সুগন্ধি ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিজের প্রতি নারীদের আকৃষ্ট করা হতে পারে। এসব কারণে সুগন্ধি ব্যবহার করা গুনাহের কারণ। এ কারণেই কিয়ামাতে এর দুর্গন্ধ মৃত অপেক্ষা বেশি হবে। কিন্তু শুধু প্রথমোক্ত উদ্দেশ্য অর্থাৎ, পার্থিব আনন্দ দ্বারা তৃপ্তি লাভ করা গুনাহ নয়। তবে এ সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করা হবে। যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তার শাস্তি হবে।

আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো বৈধ জিনিস ভোগ করবে, তাকে পরকালে শাস্তি দেওয়া হবে না। তবে দুনিয়ায় যে পরিমাণ নিয়ামত সে ভোগ করবে

পরকালে তাকে সে পরিমাণ নিয়ামত কমিয়ে দেওয়া হবে। তার চেয়ে বড় হতভাগা আর কে হতে পারে, যে ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত ভোগ করতে গিয়ে চিরস্থায়ী নিয়ামত হাতছাড়া করে ফেলে!

যে সমস্ত নিয়তে সুগন্ধি ব্যবহার আল্লাহর জন্য হয়, সেগুলো এই— জুমআর দিন সুগন্ধি লাগিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করা, আল্লাহর ঘরের সম্মানের নিয়ত করা, নিজ দেহ থেকে দুর্গন্ধ দূর করার নিয়ত করা, যাতে পাশে উপবেশনকারীদের কষ্ট না হয়,

মানুষকে গীবত থেকে রক্ষা করার নিয়ত করা। কারণ মানুষ তার দেহ থেকে দুর্গন্ধ পেলে অন্যের কাছে তার গীবত করবে। আর যে ব্যক্তি মানুষকে গীবত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সেও ওই গুনাহে অংশীদার হয়। জনৈক কবি বলেন,

إِذَا تَرَحَّلْتَ عَنْ قَوْمٍ وَقَدْ قَدَرُوْا * أَلاَّ تُفَارِقَهُمْ فَالرَّاحِلُوْنَ هُمْ.

যখন তুমি কোনো সম্প্রদায় থেকে প্রস্থান করলে অথচ তারা তোমাকে বাধা দিতে পারতো। তাহলে যেন তারা নিজেরাই প্রস্থান করলো।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ط كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ج ثُمَّ إِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

(হে মুমিনগণ!) আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদের তোমরা গালমন্দ করো না। কেননা, তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে। এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি। পরিশেষে তাদের প্রতিপালকের কাছেই তাদের প্রত্যাবর্তন হবে। অনন্তর তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খ জানাবেন। (সূরা আনআম : ১০৮)

আয়াতে গুনাহের কারণ হওয়াকেও গুনাহ বলা হয়েছে।

মস্তিষ্কের চিকিৎসার নিয়ত করা, যাতে সুগন্ধি দ্বারা মেধা বাড়ে এবং দীনী বিষয়ে চিন্তা করা সহজ হয়। ইমাম শাফেয়ি (র) বলেন, যার সুগন্ধি ভালো হয়, তার বুদ্ধি বাড়ে।

মোটকথা, এ ধরনের আরও অনেক নিয়ত আছে। অন্তরে আখেরাতের সাফল্য ও সৎকর্মের অনুসন্ধিৎসা প্রবল হলে এরূপ নিয়ত করতে কেউ অপারগ হয় না। অপরদিকে অন্তরে দুনিয়াবী আনন্দের চিন্তা প্রবল হলে এসব নিয়ত মনে জাগ্রত হয় না।

মুবাহ তথা অনুমোদিত কর্ম যেমন গণনার বাইরে, তেমনি সেগুলোতে নিয়তেরও কোনো শেষ নেই। নিচে বর্ণিত একটি উদাহরণ দ্বারা বাকিগুলোকে অনুমান করে নেওয়া যেতে পারে। এক সাধক বলেন, আমি মুস্তাহাব মনে করি যে, প্রত্যেক কাজে একটি না একটি নিয়ত করে নিই; এমনকি পানাহার, নিদ্রা, মলত্যাগ এবং অন্যান্য সব কাজে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত হওয়া চাই। কেননা, যে কাজ শারীরিক সুস্থতা ও মানসিক অবসর লাভের কারণ হয়, তা ধর্মে-কর্মে সহায়ক হয়ে থাকে। উদাহরণত, যে ব্যক্তি পানাহারে ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়ত করে এবং স্ত্রী-সহবাসে পত্নীর মনোরঞ্জন ও সুসন্তান লাভের নিয়ত করে, সে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস দ্বারা ইবাদত পালনকারী গণ্য হবে। যার মনে আখেরাতের চিন্তা প্রবল, তার জন্যে এ দুটি প্রধান কাজে সৎকর্মের নিয়ত করা অসম্ভব নয়। এমনিভাবে যখন কারও ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন তাতেও সৎ নিয়ত করে তার ধনসম্পদকে "ফী সাবীলিল্লাহ" বলে দেওয়া উচিত। যখন শুনে যে, কেউ তার গীবত করে, তখন এ ভেবে খুশি হবে যে, এর বিনিময়ে গীবতকারী তার আমলনামা থেকে পাপ নিয়ে যাচ্ছে এবং গীবতকারীর আমলনামা থেকে নেকিসমূহ তার আমলনামায় চলে আসছে। কোনো প্রতিউত্তর না দিয়ে সম্পূর্ণ চুপ থেকে এ বিষয়ের নিয়ত করবে। হাদিস শরীফে আছে, হিসাব-নিকাশের পর বান্দার নিজস্ব আমল যখন বেকার হয়ে যাবে এবং সে দোযখের উপযুক্ত হয়ে যাবে, তখন তার জন্যে সৎকর্মের এমন আমলনামা খোলা হবে, যা দ্বারা সে জান্নাতের অধিকারী হয়ে যাবে। বান্দা এই আমলনামা দেখে বিস্মিত হয়ে বলবে— ইলাহী! এসব আমল তো আমি কখনো করিনি। তাকে বলা হবে, এসব আমল সে লোকদের, যারা তোমার গীবত করে তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল এবং তোমার প্রতি জুলুম করেছিল। (মুসনাদুল ফিরদাউস : ৭৪৪)

এক হাদিসে এসেছে, কেয়ামতের দিন বান্দা পাহাড়সম নেকি নিয়ে উপস্থিত হবে। নেকিগুলো কেবল তার জন্য হলে অবশ্যই সে জান্নাতে

প্রবেশ করতো। কিন্তু দুনিয়াতে সে কারও ওপর জুলুম করেছে, কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে আঘাত করেছে। তাই তাদের প্রত্যেককে তার নেকি থেকে প্রদান করা হবে। এক পর্যায়ে তার কোনো নেকিই অবশিষ্ট থাকবে না। ফেরেশতারা বলবে, তার নেকি তো শেষ, কিন্তু নেকির দাবিদার রয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তাদের সকলের গুনাহ তার ওপর চাপিয়ে দাও এবং তাকে জাহান্নামীদের তালিকাভুক্ত করে নাও। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১ : ১৭৮)

মোটকথা, কোনো গুনাহকেই ছোটো মনে করা উচিত নয়। হতে পারে, কেয়ামতের দিন বান্দা এই ছোটো গুনাহের কারণেই আটকে যাবে। আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতিটি কর্ম সম্পর্কেই অবগত। কোনো কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়।

জনৈক মনীষী বলেন, একবার আমি একটি চিঠি লিখে সেটাকে আমার প্রতিবেশীর ঘরের মাটি দ্বারা ঢেকে দিতে চাইলাম। কিন্তু আমার মন সায় দিচ্ছিলো না। পরে ভাবলাম, মাটি তো তুচ্ছ জিনিস। এই ভেবে আমি আমার চিঠিতে তা লেপ্টে দিলাম। সাথে সাথে এক গায়েবী আওয়াজ এলো, যে ব্যক্তি মাটিকে তুচ্ছ মনে করে সে কেয়ামতের দিন এর কারণে শাস্তি ভোগ করবে। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ১০ : ২২৭)

একবার এক ব্যক্তি হযরত সুফিয়ান সাওরি (র)-এর সঙ্গে নামায আদায় করছিল, সে দেখলো, সুফিয়ান সাওরী (র) উল্টো কাপড় পড়ে আছেন, লোকটি সুফিয়ান সাওরি (র)-কে অবহিত করলে তিনি কাপড় ঠিক করার জন্য হাত বাড়িয়ে আবার থেমে গেলেন। লোকটি এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, আমি আল্লাহর জন্য কাপড় পড়েছি। এখন গায়রুল্লাহর জন্য তা কেন ঠিক করবো? (কূতুল কুলূব : ২ : ১৬৩)

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন, কেয়ামত দিবসে এক ব্যক্তি অন্য একজনের আঁচল ধরে বলবে, আমার আর তোমার মাঝে আল্লাহ বিচার করবেন, সে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে চিনি না। লোকটি বলবে, অবশ্যই চেনো, তুমি আমার দেওয়াল থেকে একটি ইট আর আমার জামা থেকে একটি সুতা নিয়েছিলে। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫২)

এ ধরনের রেওয়ায়াতগুলো খোদাভীরুদের হৃদয় নাড়িয়ে দেয়, প্রত্যেক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোকের উচিত, নিজের নফসের হিসাব নেওয়া এবং

নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। প্রতিটি কাজের পূর্বে নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত, কেন এবং কোন উদ্দেশ্যে কাজটি করা হচ্ছে। কাজটি করলে দুনিয়ার কী ফায়দা আর আখেরাতের কী ক্ষতি রয়েছে? চিন্তাভাবনার পর যদি দেখা যায়, কাজটি শরিয়ত সমর্থিত তাহলে তা করবে, অন্যথায় সেখানেই থেমে যাবে। বাহ্যিক চাকচিক্য কিছুতেই যেন ধোঁকায় ফেলতে না পারে। বরং সর্বদা নফসকে যাচাই-বাছাই করা উচিত যেন শয়তান তার ওপর বিস্তার লাভ করতে পারে।

হযরত যাকারিয়া (আ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে, একবার কিছু লোক তাকে একটি মাটির দেওয়াল নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করলো। তাঁর নীতি ছিল, তিনি কাজ পরিমাণ খাবারই গ্রহণ করতেন, এরই ধারাবাহিকতায় তারা তাঁকে দুটি রুটি খেতে দিলো। এমন সময় কিছু লোক তাঁর কাছে আগমন করলো, কিন্তু তিনি তাদের খাওয়ার জন্য আহ্বান জানালেন না। এতে তারা অবাক হলো, কারণ তাঁর বদান্যতা ও যুহদ সম্পর্কে তারা জানতো। যাকারিয়া (আ) বললেন, আমি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাদের জন্য কাজ করি। তারা আমাকে দুটি রুটি দিয়েছে, যেন আমি শক্তি যোগাড় করে পূর্ণোদ্দমে তাদের কাজ করতে পারি। তোমরা যদি আমার সাথে খেতে তাহলে তা আমার এবং তোমাদের কারও জন্যই পর্যাপ্ত হতো না। আর আমি ভালোভাবে তাদের কাজও করতে পারতাম না। (নাওয়াদিরুল উসূল : ১৩০)

এ ঘটনায় লক্ষণীয় যে, যদি কাজ করতে গিয়ে দুর্বলতা দেখা দিতো তাহলে সেটা হতো ফরযের মধ্যে ত্রুটি। আর খাবারে বিনয় প্রকাশ না করায় নফলের মাঝে ত্রুটি হয়েছে। আর ফরযের বিপরীতে নফল ধর্তব্য নয়।

জনৈক ব্যক্তি বলেন, একবার আমি হযরত সুফিয়ান সাওরী (র)-এর কাছে গেলাম, তিনি খাবার খাচ্ছিলেন। খাবার শেষ করে আঙ্গুল না চাটা পর্যন্ত তিনি আমার সাথে কোনো কথা বললেন না, এরপর বললেন, যদি আমি ঋণ করে এই খাবার গ্রহণ না করতাম তাহলে তুমি আমার সাথে খাবারে শরীক হলেই আমার ভালো লাগতো। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫৬)

সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, যে ব্যক্তি কাউকে খাবারের দাওয়াত দেয় অথচ ওই ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ না করলেই সে খুশি হয়। এরপর সে যদি দাওয়াত

গ্রহণ করে তাহলে দাওয়াত প্রদানকারী দুটি গুনাহের হকদার হবে। আর যদি দাওয়াত গ্রহণ না করে তাহলে সে একটি গুনাহের হকদার হবে। দুটি গুনাহের একটি হলো, নেফাক আর অপরটি হলো, কাউকে এমন কাজের আহ্বান জানানো, যার হাকিকত সম্পর্কে জানলে সে কষ্ট পাবে।

মোটকথা, প্রতিটি কাজেই বান্দার নিয়ত থাকা উচিত, নিয়ত ছাড়া একটি পদক্ষেপও নেওয়া উচিত নয়। যদি তৎক্ষণাৎ কোনো নিয়ত না থাকে তাহলে কাজটি আদায়ে বিলম্ব করবে। কারণ নিয়ত ইচ্ছাধীন কোনো বিষয় নয়।

## নিয়ত কারও ইচ্ছাধীন নয়

অজ্ঞ ব্যক্তি যখন নিয়তের ফযিলতসমূহ শুনে, তখন সে তার সকল কাজের শুরুতে মনে মনে বলে— আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ব্যবসার নিয়ত করছি কিংবা আল্লাহর ওয়াস্তে খাওয়ার নিয়ত করছি। এতেই সে মনে করে, হয়তো নিয়ত হয়ে গেছে। অথচ এটা মনের কল্পনা মাত্র। নিয়তের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ, যে বিষয়ের সাথে মনের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ স্বার্থ জড়িত, তার প্রতি মনের আগ্রহ ও প্রবণতাকে নিয়ত বলা হয়। আগ্রহ না থাকলে কেবল ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে নিয়ত হাসিল করা সম্ভব নয়। যখন বিশ্বাস করে যে, অমুক কাজের সাথে তার উদ্দেশ্য ও স্বার্থ জড়িত, তখন সে সেই কাজের প্রতি মনোযোগী হয়। মনে এ ধরনের বিশ্বাস সৃষ্টি করা ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। যেমন, যার বিশ্বাসে সন্তান জন্মগ্রহণের কোনো দুনিয়াবী কিংবা আখেরাতের উদ্দেশ্য নেই, তার পক্ষে সহবাসের সময় সন্তানের নিয়ত করা অসম্ভব। তার সহবাসের উদ্দেশ্য হবে শুধু কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। কেননা, নিয়ত উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভরশীল। এখানে উদ্দেশ্য, কামবাসনা চরিতার্থ করা। তদ্রূপ যদি মনে এ বিশ্বাস প্রবল না থাকে যে, বিয়ে করলে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নত পালন করা হয়, তবে বিয়েশাদিতে সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে মুখে 'সুন্নত অনুসরণের নিয়ত করলাম' বলে দিলে নিয়ত হবে না। হাঁ, এই নিয়ত লাভ করার পদ্ধতি হলো— প্রথমে শরিয়তের প্রতি এবং উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা বাড়ানোর চেষ্টা করলে যে অশেষ সওয়াব পাওয়া যায়, সে বিষয়ের প্রতি ঈমান মজবুত করা। এরপর সন্তান লালনপালনের কষ্ট সম্পর্কিত যাবতীয় বিরুদ্ধ ভাব মন থেকে দূর করে দেওয়া। এরকম করলে সন্তান লাভের সত্যিকার নিয়ত করা হয়েছে বলা যাবে।

মূলত নিয়তের জন্য মনের আবেগ ও খালেস উদ্দেশ্য পূর্ব থেকে থাকা প্রয়োজন। এজন্যই সালফে সালেহীন কোনো কোনো সৎকাজ করতে দ্বিধা করেছেন। কেননা, তাদের মধ্যে সে সৎকাজের নিয়ত উপস্থিত ছিল না। বর্ণিত আছে, ইবনে সিরীন (র) হযরত হাসান বসরীর জানাযা নামায না পড়ে বলেন, আমার মনে নিয়ত উপস্থিত হয় না। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫২)

জনৈক বুযুর্গ চুল আঁচড়ানোর সময় তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, চিরুনি নিয়ে এসো। স্ত্রী চিরুনির সাথে আয়না আনার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, হ্যাঁ নিয়ে এসো, লোকেরা তার নীরবতার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, প্রথমে চিরুনির ক্ষেত্রে আমার নিয়ত ছিল, আয়নার ব্যাপারে প্রথমে নিয়ত ছিল না। তাই কিছুক্ষণ নীরব থেকেছি। যখন অন্তরে আয়নার ব্যাপারেও নিয়ত জাগ্রত হয়েছে তখন তা আনতে বলেছি। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৬৩)

কুফার আলেম হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমানের মৃত্যু হলে হযরত সুফিয়ান সাওরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি তাঁর জানাযাতে যাচ্ছেন না কেন? তিনি বললেন, আমার মধ্যে নিয়ত থাকলে অবশ্যই যেতাম। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫২) সালফে সালেহীন-এর নিকট কেউ কোনো সৎকর্মের অনুরোধ জানালে তারা জবাব দিতেন— যদি আল্লাহ নিয়ত দান করেন, তাহলে অবশ্যই করব। (কূতুল কুলূব)

হযরত তাউস (র) নিয়ত ব্যতীত হাদিস বর্ণনা করতেন না। কোনো ব্যক্তি হাদিস জিজ্ঞেস করলেও তিনি জবাব দিতেন না। আবার নিয়ত থাকলে জিজ্ঞাসা ছাড়াই নিজে নিজেই বয়ান শুরু করতেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কী? কোনো সময় আপনি প্রশ্নের উত্তরেও হাদিস বয়ান করেন না, আবার কোনো সময় নিজেই বয়ান করেন? তিনি বললেন, তোমরা কি চাও যে, নিয়তবিহীন আমি হাদিস বর্ণনা করি? যখন আমার মধ্যে নিয়ত উপস্থিত হয়, তখনই বর্ণনা করি।

বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ ইবনে মুহাব্বার (র) কিতাবুল আকল সংকলন করার পর একদিন হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল (র) তাঁর নিকট এসে কিতাবটি দেখতে চাইলেন। তিনি কিতাবের একটি পৃষ্ঠা দেখে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। দাউদ (র) জিজ্ঞেস করলেন, কী সমস্যা? আহমদ (র)

বললেন, এর সনদগুলো দুর্বল। দাউদ (র) বললেন, আমি তো এখানে সনদের ভিত্তিতে হাদিস উল্লেখ করিনি। আপনি সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখুন, আমি এর দ্বারা উপকৃত হয়েছি। আহমদ (র) দ্বিতীয়বার কিতাবটি চেয়ে নিলেন এবং বললেন, আমিও আপনার মতো করে দেখবো। এরপর দীর্ঘসময় তিনি নিজের কাছে কিতাবটি রেখে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় বললেন, আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি এর দ্বারা বহু উপকার লাভ করেছি। (কূতুল কুলূব)

হযরত তাউস (র)-কে কেউ বলল, আমার জন্যে দুআ করুন। তিনি বললেন, যখন নিজের মধ্যে নিয়ত পাব, তখন করব। (যুহদ : ৫৯)

কোনো এক বুযুর্গ বলেন, আমি একমাস যাবৎ এক রোগীকে দেখতে যাওয়ার নিয়ত তালাশ করছি। এখন পর্যন্ত সঠিক নিয়ত অর্জিত হয়নি।

হযরত ঈসা ইবনে কাসীর (র) বলেন, একবার আমি মায়মুন ইবনে মেহরানের সাথে হাঁটতে হাঁটতে তার বাড়ির দরজায় গিয়ে পৌঁছলাম। আমি সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইলে তার ছেলে তার পিতাকে বলল, আপনি তাকে রাতের খাবারের দাওয়াত দেবেন না? তিনি বললেন, আমার নিয়ত নেই।

পূর্বেকার বুযুর্গগণের রীতি ছিল যে, তারা নিয়ত ছাড়া কোনো কাজ করতেন না। তারা জানতেন, নিয়ত হচ্ছে আমলের প্রাণ। সত্যনিষ্ঠ নিয়ত ছাড়া আমল লৌকিকতার নামান্তর। এরূপ আমল খোদায়ী গযবের কারণ— নৈকট্যের নয়। তারা আরও জানতেন যে, মুখে 'নিয়ত করি" বলার নাম নিয়ত নয়; বরং এটা অন্তরের প্রেরণা, যা আল্লাহর পক্ষ থকে উন্মোচনের স্থলবর্তী। যা মাঝে মাঝে অর্জিত হয় এবং মাঝে মাঝে হয় না। যার মনে অধিকাংশ সময় ধর্মীয় জ্ঞান প্রবল থাকে, তার অধিকাংশ সময় নিয়ত অর্জিত হয়। আর যার মনে দুনিয়া প্রবল থাকে, তার এটা অর্জিত হয় না।

এজন্য উচিত হলো, বেশি বেশি জাহান্নামের কথা স্মরণ করা ও নফসকে তার ভয়াবহ শাস্তির ভয় দেখানো এবং বেশি বেশি জান্নাত ও তার নিয়ামতের কথা স্মরণ করা। হয়তো এর দ্বারা তার অন্তরে ভালো কাজের নিয়ত জাগ্রত হবে। তার আগ্রহ ও নিয়তের ভিত্তিতেই তাকে সওয়ার দেওয়া হবে।

দুনিয়ার মোহে আসক্ত কোনো ব্যক্তির পক্ষে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের নিয়তে ইবাদত করা সহজ নয়। এটা হলো নিয়তের সর্বোচ্চ স্তর। খুব কম মানুষই এই স্তর পর্যন্ত পৌছতে পারে। ইবাদতের ক্ষেত্রে মানুষের নিয়ত বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কেউ জাহান্নামের আগুনের ভয়ে ইবাদত করে, কেউ জান্নাতের নিয়ামত প্রাপ্তির আশায় ইবাদত করে। এ ধরনের নিয়ত প্রথম স্তরের নিয়তের চেয়ে নিম্নমানের। নিয়তের সর্বোচ্চ স্তর হলো, শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের কথা স্মরণে রেখে ইবাদতের নিয়ত করা। তথাপি জাহান্নামের ভয়ে অথবা জান্নাত প্রাপ্তির আশায় ইবাদতের নিয়ত করা সহিহ। কারণ এগুলো আখেরাত সংশ্লিষ্ট বিষয়। আর বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা শুধুমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ইবাদত করে। তারা সর্বদা আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও সৌন্দর্যের মাঝে ডুবে থাকে, তাদের আমলগুলো আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের ভালোবাসাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। যারা জান্নাতী হুর ও সুস্বাদু খাবারের প্রত্যাশায় ইবাদত করে তাদের চেয়ে এসকল ব্যক্তিদের মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তারা জান্নাতের আশায় নয়; বরং শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দিনরাত ইবাদতে রত থাকে। আর ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে, নিয়ত অনুযায়ীই প্রত্যেককে সওয়াব দেওয়া হবে। তাই নিঃসন্দেহে এসকল ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ তাআলার দর্শন লাভে ধন্য হবে এবং জান্নাতের নিয়ামত লাভেই সন্তুষ্ট লোকদের দেখে হাসবে। কারণ মহান রবের উপস্থিতিতে তাঁর দর্শন এবং জান্নাতী হুরদের দর্শনের মাঝে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সৌন্দর্য ও তাঁর বড়ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, সে ওই গুবরেপোকার মতো যে রমণীদের সৌন্দর্য উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে না। যদি এই ব্যক্তির সামান্য বিচার-বুদ্ধিও থাকতো তাহলে যারা আল্লাহকে ছেড়ে জান্নাতী হুর পাওয়ার আশায় ইবাদত করে তাদের দেখে হাসতো।

বর্ণিত আছে, একবার হযরত আহমদ ইবনে খাযরাউইয়্যাহ (র) আল্লাহ তাআলাকে স্বপ্নে দেখলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে বলছেন, সকলে জান্নাতের আশায় আমার ইবাদত করে। শুধুমাত্র আবু ইয়াযিদ আমাকে পাওয়ার জন্য ইবাদত করে।

একবার আবু ইয়াযিদ (র) আল্লাহকে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! আপনার কাছে কীভাবে পৌছবো? আল্লাহ তাআলা বললেন, নফসকে পরিত্যাগ করে আমার কাছে চলে এসো।

একবার জনৈক ব্যক্তি শিবলি (র)-কে স্বপ্নে দেখে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার কোনো কথায় দ্বিমত পোষণ করেননি। শুধুমাত্র একটি কথায় দ্বিমত পোষণ করেছেন। আমি একদিন বলেছিলাম, জান্নাত না পাওয়ার চেয়ে বড় পরিতাপের বিষয় আর নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন, বরং আমার দীদার না পাওয়ার চেয়ে বড় পরিতাপের বিষয় আর নেই।

মোটকথা, নিয়তের বহু স্তর রয়েছে। যার অন্তর কোনো একটির প্রতি ঝুঁকে পড়ে তার জন্য অন্যটির প্রতি ঝোঁকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এসব হাকিকত জানার পর এমন কিছু আমল পরিলক্ষিত হয় যেগুলোকে জাহেরি মতাদর্শের ফকিহগণ অস্বীকার করেন। আমাদের বক্তব্য হলো, যার অন্তরে মুস্তাহাব আমলের নিয়ত নয়; বরং মুবাহ আমলের নিয়ত থাকে তার জন্য মুবাহ কাজটি করাই উত্তম। একাজটিই তার জন্য মুস্তাহাবতুল্য। কারণ, কাজ তো নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। এবিষয়টি অনেকটা ক্ষমা করার মতো, প্রতিশোধ গ্রহণ করার চেয়ে ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম। কিন্তু যখন প্রতিশোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে নিয়ত জাগ্রত হয়, তখন সেটাই ক্ষমা করে দেওয়ার চেয়ে উত্তম।

এমনিভাবে যদি কারও বর্তমানে নামায রোযার নিয়ত না থাকে; বরং প্রশান্তি লাভ ও ভবিষ্যতে ইবাদতের জন্য শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে পানাহার ও নিদ্রার নিয়ত থাকে, তাহলে তার জন্য পানাহার করা এবং নিদ্রায় যাওয়াই উত্তম।

তদ্রুপ কেউ যদি ইবাদত করতে করতে উদ্যমতা ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে আর কিছুক্ষণ খেলাধুলা ও কথার্বাতা বললে পুনরায় ইবাদতের উদ্যমতা ফিরে আসবে বলে তার মনে হয়। তার জন্য নামাযের চেয়ে খেলাধুলা ও গল্পগুজব করাই উত্তম।

হযরত আবুদ দারদা (রা) বলেন, আমি মাঝেমধ্যে খেলাধুলার মাধ্যমে বিনোদন লাভ করি। কারণ তা আমার ইবাদতের জন্য সহায়ক হয়। (তারীখে দিমাশক : ৪৬ : ৫০১)

হযরত আলী (রা) বলেন, তোমরা তোমাদের অন্তরকে প্রশান্তি দাও। কারণ বেশি জোরাজুরি করলে একসময় তা অন্ধ হয়ে যাবে। (মাকারিমুল আখলাক : ৭১৯)

এসমস্ত সূক্ষ্ম বিষয় কেবল প্রাজ্ঞ ওলামায়ে কেরামেরই বোধগম্য হয়। সাধারণ মানুষ এসব বিষয় থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। অনেক সময় অভিজ্ঞ ডাক্তার জ্বরাক্রান্ত রোগীকে গরম গোশত খেতে বলেন। চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে এটাকে আশ্চর্যজনক মনে হয় যে, গরম গোশত দ্বারা কীভাবে জ্বর ভালো হবে? অথচ ডাক্তার রোগীর শক্তি ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই তাকে গরম গোশত খেতে বলেন। তদ্রূপ অনেক সময় অভিজ্ঞ দাবাড়ু জয়ের জন্য নৌকা ও ঘোড়াকে বিসর্জন দিয়ে দেয়। কিন্তু দাবা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা এতে অবাক হয়। এমনিভাবে অনেক সময় দক্ষ সিপাহি পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হামলার উদ্দেশ্যে যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে। অথচ সাধারণ লোকেরা এটাকে তার ভয় ও দুর্বলতা মনে করে হাসাহাসি করে।

আল্লাহর পথের পথিকগণও শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও অন্তরের চিকিৎসা করতে গিয়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। অতএব, মুরীদ ও ছাত্রের জন্য শায়েখ ও ওস্তাদের কোনো কাজে আপত্তি পেশ করা উচিত নয়। বরং তাদের কোনো বিষয়ে সন্দেহ হলে এর কারণ তাদের কাছেই জানতে চাইবে। যাতে তারাও একসময় তাদের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে।

## ইখলাসের ফযিলত

ইখলাস সম্পর্কে কুরআনে কারিমের আয়াতসমূহ নিম্নরূপ,

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

তারা তো শুধু বিশুদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে আদিষ্ট হয়েছিল। (সূরা বাইয়িনাহ : ৫)

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ.

জেনে রাখো! বিশুদ্ধ ইবাদত আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে। (সূরা যুমার : ৩)

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَاعْتَصَمُوْا بِاللّٰهِ وَاَخْلَصُوْا دِيْنَهُمْ لِلّٰهِ.

"কিন্তু যারা তাওবা করে, সংশোধিত হয়, মজবুতভাবে আল্লাহকে ধারণ করে এবং আপন দীনকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে স্থীর করে।" (সূরা নিসা : ১৪৬)

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا.

"সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং নিজ পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।" (সূরা কাহফ : ১১০)

এ আয়াতটি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যে আল্লাহ তাআলার জন্য আমল করে এবং তজ্জন্যে মানুষের প্রশংসা কামনা করে। (মুসতাদরাকে হাকেম : ২ : ১১১)

ইখলাস সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদিস নিম্নরূপ,

ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْوُلَاةِ وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ.

মুমিনের অন্তর তিনটি বিষয়ে খিয়ানাত করে না— আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমলকে বিশুদ্ধ করা, শাসক শ্রেণিকে উপদেশ দেওয়া এবং মুসলিম জামাআতের সাথে থাকা। (জামে তিরমিযী : ২৬৫৮)

হযরত মুসআব ইবনে সাদ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার পিতা নিজেকে রাসূলুল্লাহ (স)-এর দুর্বল সাহাবিদের থেকে শ্রেয় মনে করতেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,

اِنَّمَا نَصَرَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِضُعَفَائِهَا وَدَعْوَتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ.

আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দুআ, ইখলাস ও নামাযের কারণেই সাহায্য করেন। (সহিহ বুখারী : ২৮৯৬)

হযরত হাসান (র) থেকে বর্ণিত। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা বলেন, ইখলাস আমার ভেদ। আমি যাকে ইচ্ছা এই ভেদ জানিয়ে দেই। (তাহযিবুল আসরার : ২৭৯)

হযরত আলী (রা) বলেন, আমলের স্বল্পতার জন্য চিন্তিত হয়ো না; বরং কবুল হওয়ার ব্যাপারে চিন্তিত হও। কারণ, নবী কারীম (স) একদিন মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে বলেন,

أَخْلِصِ الْعَمَلَ يُجْزِكَ مِنْهُ الْقَلِيْلُ.

ইখলাসের সাথে আমল করো। তাহলে কম আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (মুসতাদরাকে হাকেম : ৪ : ৩০৬)

অন্য এক হাদিসে আছে—

مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِصُ لِلّٰهِ الْعَمَلَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا إِلَّاظَهَرَتْ يَنَابِيْعُ الْحِكَمِ مِنْ قَلْبِهٖ عَلٰى لِسَانِهٖ.

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি একাধারে চল্লিশ দিন ইখলাসের সাথে আমল করে, তার অন্তর ও জিহ্বা থেকে জ্ঞানের ঝরণা প্রবাহিত হতে থাকে। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৫)

আল্লাহর রাসূল (স) আরও বলেন, তিন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন প্রথমে জিজ্ঞেস করা হবে। (১) যাকে ইলম দেওয়া হয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তোমার ইলম দিয়ে কী করেছ? সে বলবে, হে প্রভু! রাতদিন আমি ইলমেরই খিদমত করেছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার ইচ্ছা ছিল যেন মানুষ তোমাকে আলেম বলে। ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যুক বলবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, মনে রেখো, তোমাকে পৃথিবীতে আলেম বলা হয়ে গেছে। (২) যাকে আল্লাহ তাআলা ধনসম্পদ দান করেছেন, তাকে প্রশ্ন করবেন, তুমি তোমার ধনসম্পদ কোথায় খরচ করেছ? সে বলবে, হে রব! দুনিয়াতে আমি রাতদিন দানখয়রাত করেছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যুক বলবে। আল্লাহ তাআলা আরও বলবেন, বরং তোমার ইচ্ছা ছিল যাতে মানুষ তোমাকে দানবীর বলে। প্রকৃতপক্ষে তা বলা হয়ে গেছে। (৩) যে আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি কী করেছ? সে বলবে, হে রব! আপনি জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেজন্য আমি যুদ্ধ করে আপনার রাহে শহীদ হয়েছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যুক। ফেরেশতারাও তাকে মিথ্যুক বলবে এবং আরও বলবেন, বরং তোমার উদ্দেশ্য ছিল, মানুষ তোমাকে যেন একজন বীর বলে। আর তা তো বলা হয়েছে।

এ হাদিসের রাবী হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ (স) আমার উরুতে একটি রেখা টেনে বললেন, হে আবু হুরাইরা! সর্বপ্রথম এই তিন ব্যক্তিকে দিয়েই জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত হবে। হযরত আবু হুরাইরা (রা) হযরত মুআবিয়া (রা)-এর নিকট গিয়ে এ হাদিস বর্ণনা

করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন, এরপর বললেন, আল্লাহ পাক যথার্থই বলেছেন—

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ.

যে পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের ফল পূর্ণরূপে দান করি এবং এক্ষেত্রে তাদেরকে কম দেওয়া হবে না। (সূরা হুদ : ১৫)

বনী ইসরাঈলের কাহিনীতে বর্ণিত আছে, এক ইবাদতগুজার ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবত আল্লাহ তাআলার ইবাদতে মশগুল ছিলেন। একদিন কিছু লোক তার নিকট এসে বলল, এখানে একটি সম্প্রদায় গাছের পূজা করে। আবেদ রাগান্বিত হয়ে তখনই কুঠার নিয়ে গাছটি কেটে ফেলতে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে শয়তান এক বুড়োর বেশে তার সম্মুখে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাচ্ছো? আবেদ বলল, আমি অমুক বৃক্ষটি কেটে ফেলতে চাই। বুড়ো বলল, তুমি নিজের ইবাদত ও কাজকর্ম ছেড়ে এ গাছের পেছনে লেগে পড়লে কেন? এতে তোমার কী লাভ? আবেদ বলল, এটাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। বৃদ্ধ শয়তান বলল, আমি তোমাকে এটা কেটে ফেলতে দেবো না।

কথা কাটাকাটি চরমে পৌঁছলে আবেদ বৃদ্ধকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের ওপর চড়ে বসল। বৃদ্ধ বলল, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি তোমাকে কিছু উপকারী কথা বলব। আবেদ দাঁড়িয়ে গেল। বৃদ্ধ বলল, আশ্চর্যের বিষয়! আল্লাহ তাআলা তোমার উপর এ গাছটি কাটা ফরয করেননি। তুমিও এর ইবাদত করো না। যদি অন্য কেউ ইবাদত করে, তাহলে তার পাপ তোমার ওপর পড়বে না। জমিনে আল্লাহর অনেক নবী রয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছা হলে গাছটির এলাকায় কোনো নবী প্রেরণ করে তাকে গাছ কাটতে নির্দেশ দেবেন। যে কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তার পেছনে পড়ার কি দরকার? আবেদ বলল, আমি অবশ্যই গাছটি কেটে ফেলব।

বৃদ্ধ পুনরায় কুস্তি লড়ার ভাব প্রকাশ করলে আবেদ তাকে পুনরায় ধরাশায়ী করে দিল এবং বুকের উপর চেপে বসল। বৃদ্ধবেশী শয়তান

অক্ষম হয়ে বলতে লাগল, আচ্ছা আমি তোমাকে আরও একটি কথা বলব, যা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আবেদ বলল, কী বলতে চাও বলো। বৃদ্ধবেশী শয়তান বলল, আগে আমাকে ছাড়। তারপর বলব। আবেদ তাকে ছেড়ে দিল। বৃদ্ধ বলল, তুমি তো একজন খুবই দরিদ্র মানুষ। পরের দেওয়া খাবার খাও। আমার মনে হয় অপরকে আহার করানো, প্রতিবেশীদের আপ্যায়ন করানো এবং অমুখাপেক্ষী হয়ে বেঁচে থাকার সাধ তোমার মনেও রয়েছে। আবেদ বলল, এ সাধ কার না আছে? বৃদ্ধ বলল, তাহলে এখন তুমি ফিরে যাও। আমি এখন থেকে প্রতি রাতে তোমার মাথার পাশে দুটি দীনার রেখে দেব। সকালে এগুলো তুলে নিও এবং নিজের ও পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণে সেগুলো ব্যয় করো। এটা তোমার জন্য এবং অন্য মুসলমানদের জন্য গাছ কাটার চেয়ে অধিক উপকারী হবে। এ গাছটি কেটে কোনো লাভ নেই। কারণ, এর জায়গায় অন্য গাছ রোপণ করা হবে এবং পূজা করা হবে। আবেদ কিছুক্ষণ চিন্তা করে মনে মনে বলল, বৃদ্ধ ঠিকই বলেছে। আমি তো নবী নই যে, বৃক্ষটি কেটে ফেলা আমার জন্য জরুরি হবে। আল্লাহ তাআলা আমাকে এটা কাটার হুকুমও করেননি, যা না কাটলে আমি নাফরমান বলে গণ্য হব। সে যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে ফায়দাও রয়েছে। এরপর উভয়ের মধ্যে দীনারের ব্যাপারে চুক্তি হয়ে গেল। অবশেষে আবেদ তার কামরায় ফিরে এসে রাতে ঘুমিয়ে পড়ল। ভোরে সে তার শিয়রে দুটি দীনার পেয়ে তুলে নিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও তাই হলো। এরপর কোনোদিন সে দীনারের দেখা পেলো না। সে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কাঁধে কুঠার নিয়ে সে গাছের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। পথিমধ্যে বৃদ্ধবেশী ইবলীসও তার সম্মুখে এসে বলল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা? আবেদ বলল, সেই গাছ কাটতে যাচ্ছি। ইবলীস বলল, এখন তুমি সে গাছ কাটতে পারবে না এবং সে পর্যন্ত যেতেও পারবে না। একথা শুনে আবেদ পূর্বের ন্যায় বৃদ্ধকে মাটিতে ফেলে দিতে চাইল। বৃদ্ধবেশী ইবলীস বলল— এখন সে দিন আর নেই। এরপর সে আবেদকে উপরে তুলে মাটিতে আছাড় মারল এবং লাগাতার লাথি মারতে লাগল। আবেদকে তার পায়ে বলের মতো মনে হচ্ছিল। এরপর ইবলীস তার বুকের ওপর চড়ে বসে বলল, হয় তুমি এ কাজ থেকে বিরত হবে, না হয় আমি তোমাকে হত্যা করে ফেলব। আবেদ নিজের ভেতরে শক্তি না

পেয়ে পরাজয় মেনে নিয়ে বলল, এখন আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলো, পূর্বে আমি কী করে বিজয়ী হয়েছিলাম এবং এখন তুমি কীভাবে বিজয়ী হলে? ইবলীস বলল, এর কারণ হচ্ছে, পূর্বে তুমি যা করেছিলে, তা আল্লাহর জন্য করেছিলে এবং তুমি তখন ইখলাসের বলে বলীয়ান ছিলে। কিন্তু এখন তুমি ক্রোধ ও দুনিয়ার তুচ্ছ স্বার্থের গোলাম হয়ে মাঠে নেমেছ। তাই আমি সহজেই তোমাকে পরাজিত করে ফেলেছি।

উপরিউক্ত ঘটনাতে নিম্নোক্ত আয়াতের সত্যায়ন ও সমর্থন পাওয়া যায়,

وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ.

"(শয়তান বলল,) আমি অবশ্যই সকল মানুষকে গোমরাহ করে ছাড়ব। কিন্তু যারা আপনার ইখলাসবিশিষ্ট বান্দা, তাদের কথা স্বতন্ত্র।" (সূরা হিজর : ৩৯-৪০)

যেহেতু, ইখলাস ব্যতীত বান্দা শয়তানের হাত থেকে নিস্তার পায় না। সেজন্য হযরত মারূফ কারখী (র) নিজেকে প্রহার করে বলতেন— হে নফস! ইখলাস অবলম্বন কর, যাতে তুমি মুক্তি পাও। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৫)

ইয়াকুব মাকফুফ (র) বলেন, ইখলাস হচ্ছে নেক আমলগুলোকে গোপনে করা, কুকর্মসমূহকে যেভাবে গোপনে করা হয়। (হিলয়াতুল আউলিয়া : ৯ : ৩৬৪)

আবু সুলাইমান (র) বলেন, যার একটি পদক্ষেপও যথার্থ হয় এবং তাতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিয়ত না থাকে, সেই সুখী। (ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ১০ : ৪৭)

হযরত ওমর (রা) হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) কে লিখে পাঠান যে, যার নিয়ত খালেস হয়, আল্লাহ তাআলা তার ও মানুষের মধ্যকার সব কিছুর জন্য যথেষ্ট। (আল মুজালাসা ওয়া জাওয়াহিরুল ইলম : ৫৯৬)

জনৈক বুযুর্গ একবার তার ভাইয়ের নিকট লিখে পাঠালেন, নিয়তকে পরিশুদ্ধ করো তাহলে অল্প আমলই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫৯)

হযরত আইউব সাখতিয়ানী (র) বলেন, আমলকারীদের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা। (কূতুল কুলূব : ২ : ২৫৯)

হযরত মুতাররিফ (র) বলতেন, যার নিয়ত বিশুদ্ধ হয় তার কর্মও বিশুদ্ধ হয় আর যার নিয়তে গড়মিল হয় তার কাজেও গড়মিল হয়। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা : ৩৬৭৪০)

একবার এক ব্যক্তি জনৈক বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখল, তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি আপনার আমলগুলোর কীরূপ প্রতিদান পেয়েছেন? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর জন্য যা কিছু করেছি তা পরিপূর্ণভাবে পেয়েছি। এমনকি রাস্তা থেকে আমি যে আনারের দানা কুড়িয়ে নিয়েছিলাম তারও প্রতিদান পেয়েছি। আমার মৃত বিড়ালটিকে আমি নেকির পাল্লায় দেখেছি। আর আমার টুপিতে যে রেশমের একটি সুতা ছিল সেটাকে গুনাহের পাল্লায় দেখেছি। আমার একশ দীনার মূল্যের গাধাটির জন্য আমি কোনো সওয়াব পাইনি। আমি প্রশ্ন করলাম, মৃত বিড়ালের জন্য সওয়াব আছে অথচ মৃত গাধার জন্য কোনো সওয়াব নেই কেন? আমাকে বলা হলো, তুমি তাকে যেখানে পাঠিয়েছো তা সেখানেই আছে। তোমাকে তার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হলে তুমি বলেছিলে, 'আল্লাহর অভিশাপে তার মৃত্যু হয়েছে।' তোমার একথাটিই তোমার সওয়াব বাতিল করে দিয়েছে। যদি তুমি 'আল্লাহর রাহে' বলতে তাহলে নেকি লাভ করতে। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫১)

বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গ বলেন, একবার আমি মানুষদের সামনে সদকা করলাম। তখন লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তা দেখে আমার ভালো লাগছিলো। ওই সদকার জন্য আমি সওয়াব ও শাস্তি কিছুই পাইনি। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, তার ভাগ্য ভালো যে, তাকে ওই সদকার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়নি। তার ওপর অনুগ্রহ করা হয়েছে। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫২)

হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয (র) বলেন, ইখলাস আমলকে যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে এভাবে বের করে আনে যেভাবে গোবর ও রক্তের মধ্য থেকে দুধ বেরিয়ে আসে। (তাহযিবুল আসরার : ২৭০)

কথিত আছে, এক ব্যক্তি মহিলাদের সাজে সজ্জিত হয়ে তাদের বিভিন্ন উৎসব অথবা শোক-সমাবেশে উপস্থিত হতো। একদিন সে এমনই এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলো। ঘটনাক্রমে সেখানকার একটি মূল্যবান পাথর

চুরি হয়ে গেল। ফলে দরজা বন্ধ করে তল্লাশির ঘোষণা এলো। এক এক করে তল্লাশি করা হলো, এক পর্যায়ে তার পার্শ্ববর্তী মহিলার পালা এলো। তখন সে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআ করলো, যদি আমি এই বিপদ থেকে রক্ষা পাই তাহলে এই গর্হিত কাজ আর করবো না। অতঃপর পার্শ্ববর্তী মহিলাটির কাছেই পাথরটি পাওয়া গেলো। ফলে দরজা খুলে দেওয়া হলো। (কূতুল কুলূব)

জনৈক সুফী বলেন, একবার আরাফার দিন আসরের পর আমি আবু ওবায়েদ বুস্তরির সাথে তার খেতে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তিনি তখন তার খেত চাষ করছিলেন। হঠাৎ জনৈক সুফী তার কাছে এসে চুপিসারে কী যেন বলল, আবু ওবায়েদ (র) উত্তরে বললেন, না। উত্তর শোনামাত্র বিজলির বেগে সে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল। আমি আবু ওবায়েদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সে আপনাকে কী বলেছে? তিনি বললেন, সে আমাকে তার সাথে হজে যাওয়ার অনুরোধ করেছে, কিন্তু আমি তার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছি। আমি বললাম, আপনি তার সাথে কেন যাবেন না? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আমার নিয়ত নেই, আমি তো আজ রাতে এই জমির হাল চাষ সম্পন্ন করার নিয়ত করেছি। এমতাবস্থায় তার সাথে হজে গেলে আল্লাহ তাআলার ক্রোধে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বরং আমি এখন যে কাজ করছি, আমার দৃষ্টিতে তা সত্তরটি হজ অপেক্ষা উত্তম। (কুতুল কুলূব : ২ : ১৫২)

জনৈক বুযুর্গ বলেন, আমার বহু সামুদ্রিক অভিযানে অংশগ্রহণ করার সুযোগ হয়েছে। এমনই এক যুদ্ধে এক ব্যক্তি তার থলে বিক্রি করতে চাইলো। আমি ভাবলাম, সমুদ্র পথে থলেটি কাজে লাগবে। আর শহরে গিয়ে ভালো দামে বিক্রি করতে পারবো। এই ভেবে থলেটি কিনে নিলাম, সেই রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আসমান থেকে দুজন ব্যক্তি অবতরণ করে একজন অপরজনকে বলছে, যোদ্ধাদের নাম লিপিবদ্ধ করে নাও। অমুক বিনোদনের জন্য, অমুক লোক দেখানোর জন্য, অমুক আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এরপর তারা আমার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, সে ব্যবসার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

আমি বললাম, দয়া করে এমনটি করবেন না। আল্লাহর শপথ! আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হইনি। আমার কাছে ব্যবসা করার মতো

কোনো পণ্যও নেই। আমি তো কেবল জিহাদের উদ্দেশ্যেই এসেছি। সে বললো, তুমি গতকাল ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি থলে কিনেছো। একথা শুনে আমি কেঁদে কেঁদে বললাম, দয়া করে ব্যবসায়ীদের তালিকায় আমার নাম লিখবেন না। সে তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী মতামত? সে বললো, এভাবে লেখো, সে যুদ্ধের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পথিমধ্যে ব্যবসার উদ্দেশ্যে একটি থলে ক্রয় করেছে। আল্লাহ তাআলা যা ভালো মনে করবেন তাই ফয়সালা করবেন। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫৫)

হযরত সিররী সাকাতি (র) বলেন, নিভৃতে একনিষ্ঠভাবে দুই রাকাত নামায উৎকৃষ্ট সনদে সত্তর অথবা সাতশটি হাদিস লিপিবদ্ধ করার চেয়ে উত্তম। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৬৪)

জনৈক মনীষী বলেন, সামান্য সময়ের ইখলাসও পরকালে নাজাতের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু ইখলাস বড়ই দুর্লভ জিনিস। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৩)

বলা হয়, ইলম হলো শস্যদানা স্বরূপ, আমল ক্ষেতস্বরূপ, আর ইখলাস হলো পানিস্বরূপ। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৬)

এক বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে অপছন্দ করেন তখন তাকে তিনটি জিনিস দান করেন আর তিনটি জিনিস থেকে বিরত রাখেন। তাকে সৎ লোকদের সান্নিধ্য দান করেন, কিন্তু তাদের থেকে উপকৃত হতে বাধা দেন। তাকে নেক আমল করার তাওফিক দেন, কিন্তু সেই আমলে ইখলাস থেকে বঞ্চিত রাখেন এবং তাকে প্রজ্ঞা দান করেন, কিন্তু সততা দান করেন না। (তাহযিবুল আসরার)

হযরত সূসী (র) বলেন, বান্দার আমলে ইখলাসই আল্লাহ তাআলার একমাত্র উদ্দেশ্য। (তাহযিবুল আসরার)

হযরত জুনায়েদ (র) বলেন, আল্লাহ তাআলার কিছু বিচক্ষণ বান্দা রয়েছেন যারা একনিষ্ঠভাবে আমল করে। আর তাদের ইখলাস তাদেরকে কল্যাণের দরজার প্রতি আহ্বান করে। (তাহযিবুল আসরার)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল মারুযি (র) বলেন, সমস্ত কাজে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। তোমার সাথে তার আচরণ এবং তার সাথে তোমার আচরণ, তার আচরণে তুমি সন্তুষ্ট থাকবে আর তোমার কাজে তুমি একনিষ্ঠ হবে। এই দুটি কাজ যথাযথভাবে আদায় করলে তুমি উভয় জগতে সফল হবে। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৭)

## ইখলাসের প্রকৃতি

প্রতিটি বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তুর মিশ্রণ থাকা সম্ভব। কোনো বস্তু অন্য বস্তুর মিশ্রণ থেকে মুক্ত ও পবিত্র হলে তাকে বলা হয় "খালিস" বা বিশুদ্ধ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشّٰرِبِيْنَ.

গোবর ও রক্তের মাঝখান থেকে নির্গত বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুপেয়। (সূরা নাহল : ৬৬)

অতএব দুধের মধ্যে গোবর ও রক্তের মিশ্রণ না থাকাই হচ্ছে দুধের বিশুদ্ধতা। ইখলাস অর্থ বিশুদ্ধ করা এবং এর বিপরীত হচ্ছে ইশরাক তথা, শরীক করা। এ থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি মুখলিস নয়, সে মুশরিক। তবে শিরকের অনেক স্তর রয়েছে। তাওহীদের ক্ষেত্রে ইখলাসের বিপরীত হচ্ছে প্রভুত্বে ইশরাক। শিরকের মতো ইখলাসও কিছু গোপন এবং কিছু প্রকাশ্য। শিরক ও ইখলাসের কেন্দ্র হচ্ছে মন। নিয়তের মাধ্যমে উভয়টি মনে উপস্থিত হয়। একটি মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে যে কাজ সম্পাদিত হয় এবং তাতে অন্য কোনো উদ্দেশ্যের মিশ্রণ না থাকে, সেটাই ইখলাস হওয়া উচিত। যেমন, কেউ শুধু রিয়া তথা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দানখয়রাত করল অথবা শুধু আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে দান করল, আভিধানিক দিক দিয়ে উভয়টিকেই ইখলাস বলা হবে। কারণ, এতে এক উদ্দেশ্যের সাথে অন্য কোনো উদ্দেশ্যের মিশ্রণ নেই। কিন্তু পরিভাষায় শুধু আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দান করাকেই ইখলাস বলা হয়। রিয়ার উদ্দেশ্যে কোনো সৎকর্ম করা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। এখানে সেটা আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তু নয়।

এখানে আমরা বর্ণনা করতে চাই যে, নৈকট্য লাভের নিয়তের সাথে রিয়া অথবা অন্য কোনো মানসিক আনন্দ লাভের উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকলে তার বিধান কী হবে? উদাহরণত কেউ নৈকট্য লাভের নিয়তে রোযা রাখে, কিন্তু সাথে সাথে চিকিৎসার খাতিরে পরহেযের উপকারও হয়ে যায়। অথবা কেউ হজ করে, যাতে দেশ ভ্রমণের আনন্দও অর্জিত হয়ে যায়। কিংবা শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা হাসিল হয়ে যায়।

অথবা স্ত্রী-সন্তান ও অন্যান্য ব্যস্ততায় অতিষ্ট হয়ে তা থেকে সাময়িক মুক্তি লাভ করা যায়। অথবা কেউ জিহাদ করে যাতে যুদ্ধের কলা-কৌশল ও শত্রুর ওপর অকস্মাৎ আক্রমণের পন্থা রপ্ত হয়ে যায়।

অথবা কেউ তাহাজ্জুদ পড়ে, যাতে রাত্রি জাগরণের মাধ্যমে চোর-ডাকাতের উপদ্রব থেকে হেফাযতও হয়ে যায়।

অথবা কেউ ইলম শিক্ষা করে, যাতে সম্পদ উপার্জন করা সহজ হয়, মানুষের মাঝে সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া যায় এবং তার ধনসম্পদ মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়।

অথবা ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করে যাতে বক্তব্য প্রদানের স্বাদ উপভোগ করা যায়। অথবা আলেম ওলামা ও সুফিয়ায়ে কেরামের খেদমত করে, যাতে তাদের অন্তরে নিজের অবস্থান তৈরি করা যায় এবং মানুষের সম্মান লাভ করা যায়। অথবা কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ করে যাতে ধারাবাহিকভাবে লেখার কারণে হাতের লেখা সুন্দর হয়ে যায়। অথবা পায়ে হেঁটে হজ করে যাতে বাহন ভাড়ার খরচ বেঁচে যায়। অথবা অযু করে যাতে হাত পায়ের ময়লা দূর হয়ে যায় এবং দেহ ঠান্ডা থাকে। অথবা গোসল করে যাতে শরীরের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়।

অথবা হাদিস রেওয়ায়াত করে যাতে শক্তিশালী সনদে তার নাম উচ্চারিত হয়। অথবা মসজিদে ইতেকাফ করে যাতে ঘরভাড়া বেঁচে যায়। অথবা রোযা রাখে যাতে রান্নার কষ্ট থেকে বাঁচা যায়। অথবা সদকা করে যাতে যাচনাকারীর যাঞ্চা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অথবা অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় যাতে সেও অসুস্থ হলে তাকে দেখতে আসে।

অথবা কারও জানাযায় অংশগ্রহণ করে যাতে মরহুমের আত্মীয়স্বজন তার পরিবারের লোকদের জানাযায় শরীক হয়। অথবা এ জাতীয় কোনো ভালো কাজ করে যাতে মানুষ তাকে ভালো কাজের জন্য স্মরণ করে ও তার প্রশংসা করে।

এসব ক্ষেত্রে নৈকট্য লাভের সাথে অন্যান্য উদ্দেশ্য সংমিশ্রিত থাকার কারণে আমলসমূহ ইখলাস বহির্ভূত হয়ে যাবে এবং এসব আমলকে নিরেট আল্লাহর জন্যে বলা যাবে না।

মহান আল্লাহ বলেন, আমি শিরক থেকে অমুখাপেক্ষী। (সহিহ মুসলিম : ২৯৭৫)

মোটকথা, মানুষের কোনো আমলের প্রতি যখন অন্তর আকৃষ্ট হয় তা পরিমাণে কম হোক বা বেশি তখন তা ইখলাসকে দূর করে দেয়।

কিন্তু মানুষের কোনো কাজ ও ইবাদত এ জাতীয় মানসিক আনন্দমুক্ত থাকে না। তাই বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি সারা জীবনে খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্যে একটি মুহূর্তও পাবে, সে মুক্তি পেয়ে যাবে। কেননা, ইখলাস অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। মনকে উপরিউক্ত মিশ্রণ থেকে মুক্ত রাখা প্রায় অসম্ভব।

বরং প্রকৃত খালেস আমল তো সেটাই যা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে করা হয়। যদি শুধুমাত্র উপরিউক্ত কারণসমূহই আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী হয় তাহলে এর মন্দ পরিণাম আমলকারীকেই ভোগ করতে হবে। আর যদি আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিলই আমলের উদ্দেশ্য হয় এবং পরবর্তীকালে তার সাথে উপরিউক্ত কারণসমূহের মিশ্রণ ঘটে। তাহলে আমল খালেস থাকে না। আর এই মিশ্রণ তিনভাবে হতে পারে। অনুগামীর স্তরে হবে অথবা শরীকের স্তরে হবে অথবা সহায়কের স্তরে হবে।

মোটকথা, অন্তরের চাহিদা হয়ত দীনী চাহিদার সমান হবে অথবা শক্তিশালী হবে অথবা দুর্বল হবে। এগুলোর প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন হুকুম রয়েছে। আর ইখলাস তো হলো, আমলকে সকল মিশ্রণ থেকে মুক্ত করা। তা কম হোক বা বেশি এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যেই আমল করা।

নিরেট নৈকট্য লাভের নিয়ত সেই ব্যক্তির জন্যে কল্পনা করা যায়, যে আল্লাহর পাগলপারা আশেক, আখেরাতের চিন্তায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত এবং এ ধরনের পার্থিব মহব্বতের জন্য যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণও অবকাশ নেই। এমনকি, খানাপিনার প্রতিও কোনো আকর্ষণ নেই। এগুলোর প্রয়োজন প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নয়। এরূপ ব্যক্তি আহার, পান, প্রস্রাব-পায়খানা ইত্যাদি সকল কাজের ক্ষেত্রে খাঁটি আমলকারী ও সঠিক নিয়ত বিশিষ্ট হবে। এমনকি, সে এই নিয়তে ঘুমাবে যাতে পরবর্তী ইবাদতের জন্যে শক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়। এমতাবস্থায় তার নিদ্রাও ইবাদতে পরিণত হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি এরূপ নয়, তার আমলে ইখলাসের উপস্থিতি খুবই বিরল হবে।

যার মাঝে আল্লাহ তাআলা ও আখেরাতের প্রতি ভালোবাসা প্রবল হয়, তার হাঁটাচলা ও চলাফেরাও এর প্রভাবে একপর্যায়ে ইখলাসে পরিণত হয়। আর যার মাঝে দুনিয়া ও গায়রুল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রবল হয় তার নামায, রোযা ইত্যাদি কোনো আমলেই ইখলাস থাকে না।

এ থেকে ইখলাস অর্জনের এই উপায় জানা যায় যে, জৈবিক বাসনা ভেঙ্গে চুরমার করতে হবে, দুনিয়ার লোভ-লালসা ছিন্ন করতে হবে এবং অন্তরে আখেরাতের চিন্তাই প্রবল রাখতে হবে।

এমন অনেক আমল রয়েছে, যেগুলোতে মানুষ কষ্ট স্বীকার করে এবং একান্তভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য হাসিলের ইচ্ছা পোষণ করে অথচ এটা মানুষের ভুল ধারণা। কারণ, এতে বিপদের কারণ তাদের জানা থাকে না। যেমন, জনৈক মনীষী বলেন, আমি ত্রিশ বছরের নামাযের কাযা আদায় করেছি। এগুলো আমি মসজিদের প্রথম সারিতে পড়েছিলাম। কাযার কারণ, একদিন অসুবিধার কারণে আমার মসজিদে যেতে দেরি হয়ে যায়। ফলে, আমি দ্বিতীয় সারিতে নামায পড়লাম এবং মনে মনে খুব অনুতপ্ত হলাম যে, মুসল্লীরা আমাকে দ্বিতীয় কাতারে দেখেছে। এই লজ্জা থেকে জানতে পারলাম, লোকেরা আমাকে যে প্রথম কাতারে দেখত, তাতে আমি পুলকিত হতাম। অথচ এর আগে বিষয়টি বুঝতে পারিনি।

বলাবাহুল্য, এটা এমন একটি ভেদ বা গোপন ব্যাপার, যা থেকে আমল খুব কমই নিরাপদ থাকে এবং এটা অনেকেই বুঝতেও পারে না। আল্লাহ তাআলা যাদেরকে ক্ষমতা দেন, তাদের ব্যাপার আলাদা। যারা এ ব্যাপারে অসচেতন, তারা পরকালে নিজের সৎ আমলসমূহকে পাপাচারে দেখতে পাবে। এ ধরনের লোকদের কথাই নিচের আয়াত সমূহে বোঝানো হয়েছে—

وَ بَدَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوْا يَحْتَسِبُوْنَ وَ بَدَا لَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا.

"তাদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে এমন বিষয় প্রকাশ হবে, যার কল্পনাও তারা করতো না এবং নিজের উপার্জিত কর্মের পাপ তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে।" (সূরা যুমার : ৪৭-৪৮)

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

আপনি বলুন, আমি তোমাদেরকে তাদের খবর দেব কি, যারা আমলের ব্যাপারে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত? তারা এমন লোক, পার্থিব জীবনে যাদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা বিফল হয়; অথচ তারা মনে করে তারা খুব ভাল কাজ করছে। (সূরা কাহফ : ১০৩-১০৪)

এই ফিতনায় আলেম সমাজও নিপতিত। তাদের অধিকাংশের ইলম চর্চায় যে উদ্দীপনাটি কাজ করে, তা হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের সুখ এবং প্রশংসা-প্রীতি। শয়তান তাদের সম্মুখে সত্যকে আড়াল করে দেয় এবং ধূম্রজাল সৃষ্টি করে যে, তোমার উদ্দেশ্য তো আল্লাহর দীনের প্রচার-প্রসার এবং মুহাম্মদ (স)-এর বিধান থেকে বিরোধীদেরকে বিরত রাখা। বক্তারা জনগণ এবং শাসকবর্গকে উপদেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে। সাধারণ জনগণ তাদের নসিহত মেনে নিলে এবং তাদের প্রতি আকৃষ্ট হলে তারা খুশিতে আটখানা হয়ে যায়। তারা বলে, আল্লাহ তাআলা ধর্মের সাহায্যের কাজে আমাদেরকে নিযুক্ত করেছেন, এজন্য আমরা খুবই খুশি। কিন্তু তাদের মতো অন্য কোনো কর্মী সৃষ্টি হলে, সে তাদের চেয়ে ভালো ওয়াজ করলে এবং মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হলে তারা তাকে মেনে নিতে পারে না; বরং মনে মনে কষ্ট পায়। এখন প্রশ্ন হলো, যদি ধর্মের খাতিরেই তারা ওয়াজ করতো, তাহলে তাদের অবস্থা এমন হয় কেন? এক্ষেত্রে তো তাদের আরও খুশি হওয়ার কথা ছিল এবং আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিল যে, ধর্মের একাজে তিনি অন্যকে নিয়োজিত করেছেন। কিন্তু এরপরও শয়তান তাদেরকে ছাড়ে না; বরং বলে, তোমাদের দুঃখ এজন্য নয় যে, মানুষ তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যের ওয়াজ শুনছে; বরং দুঃখ এজন্য যে, তোমরা সওয়াব অর্জনে বঞ্চিত হয়েছো। কিন্তু তারা জানে না যে, সত্যের আনুগত্য এবং উত্তম ব্যক্তির ওপর কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলে পরকালের সওয়াব বেশি হয়; নিজে একা করার তুলনায়। যদি এরূপ দুঃখ করা প্রশংসাযোগ্য হতো, তাহলে তো হযরত আবু বকর (রা) যখন খলিফা নিযুক্ত হয়েছিলেন, তখন হযরত উমর (রা)-ও দুঃখ করতেন। কারণ, জনগণের কল্যাণ সাধনের দায়িত্ব পালন করা অপরিসীম সওয়াবের কাজ। কিন্তু হযরত উমর (রা) হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফত প্রাপ্তিতে আনন্দিতই হয়েছিলেন। কেননা, তিনি জানতেন, হযরত আবু বকর (রা) তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আজকাল আলেমগণ এ জাতীয় বিষয়সমূহে আনন্দিত হয় না, কেন জানি না? অনেক আলেম শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মনে মনে বলে, যদি আমার চেয়ে উত্তম কারও আত্মপ্রকাশ ঘটে তাহলে আমি খুশি হবো। এটা তার দাবি মাত্র। যখন বাস্তবেই এমনটি ঘটে তখন সে তার ওই ওয়াদার কথা বেমালুম ভুলে যায়, তার রূপ পরিবর্তন হয়ে যায় এবং ওয়াদা পূরণে ব্যর্থ হয়। যারা নফসের চক্রান্ত সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত, তারাই শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে জানে ও বুঝে।

মোটকথা, ইখলাসের স্বরূপ জানা ও সে অনুযায়ী আমল করা একটি অথৈ সমুদ্র। এতে উত্তীর্ণ হওয়ার মতো লোক খুবই বিরল। কুরআনে আছে–

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ.

অর্থাৎ, "(শয়তান বলেছিল,) আপনার মুখলিস বান্দারা ব্যতীত আমি সবাইকে গোমরাহ করে ফেলবো।" (সূরা হিজর : ৪০)

জ্ঞাতব্য, এখানে উপরিউক্ত বিরল লোকদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। অতএব বান্দার উচিত এসব সূক্ষ্ম বিষয়াদি হৃদয়ঙ্গম করার কাজে সদা তৎপর থাকা। অন্যথা সে অজান্তেই শয়তানের দলভুক্ত হয়ে যাবে।

## ইখলাস সম্পর্কে মনীষীদের বাণী

হযরত সূসী (র) বলেন, ইখলাস হলো ইখলাসের দিকে লক্ষ না থাকা। কেননা, যে ব্যক্তি ইখলাসের প্রতি খেয়াল রাখবে, ইখলাসের জন্য তার ইখলাসের দরকার থাকবে। (তাহযিবুল আসরার : ২৮০)

এতে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, আমলকে গর্ব থেকে পরিষ্কার রাখা উচিত। ইখলাসের দিকে দৃষ্টি রাখা অহংকার তুল্য, যা আমলের অন্যতম আপদ। মূলত ইখলাস বলা হয়, যা সকল প্রকার বিপদ থেকে নিরাপদ হবে। যে ইখলাসে দাম্ভিকতা থাকে তাতে একটি বিপদ থেকে যায়।

হযরত সাহল তস্তরী (র) বলেন, ইখলাস হলো বান্দার স্থিরতা ও তার সকল নড়াচড়া একমাত্র আল্লাহর জন্য হওয়া। (তাহযিবুল আসরার)

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (র) বলেন, ইখলাস হচ্ছে আল্লাহ তাআলার সাথে নিয়ত সাচ্চা করা। (তাহযিবুল আসরার)

হযরত সহলকে প্রশ্ন করা হলো, নফসের জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ কী? তিনি বললেন, ইখলাস। কারণ, এতে নফসের কোনো ভূমিকা থাকে না। (তাহযিবুল আসরার)

রুয়াইম (র) বলেন, আমলের ইখলাস হচ্ছে উভয় জাহানে ইখলাসের জন্য কোনো বিনিময় কামনা না করা। (তাহযিবুল আসরার : ২৮১)

এতে ইঙ্গিত রয়েছে, জৈবিক বাসনা পার্থিব হোক অথবা পারলৌকিক সবই আপদ। বস্তুত আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছু কামনা করা উচিত নয়। এতে সিদ্দীকগণের ইখলাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি জান্নাতের আশায় অথবা দোযখের ভয়ে আমল করে, সে পার্থিব ভোগ-বিলাসের দিক দিয়ে মুখলিস; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জৈবিক বাসনার অন্বেষণকারী। সত্যপন্থীদের কাছে সত্যিকার চাওয়ার বিষয় হচ্ছে কেবল আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি।

জনৈক বুযুর্গ বলেন, মানুষ কোনো না কোনো আনন্দ উপভোগের জন্যই কাজ করে। যাবতীয় স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ থেকে মুক্ত হওয়া তো আল্লাহ তাআলার গুণ। যে ব্যক্তি এর দাবি করবে সে কাফের। (ইতাহাফুস সাদাতিল মুত্তাকিন : ১০ : ৫৫)

বর্ণিত আছে, কাজী আবু বকর বাকিল্লানী (র) এরূপ দাবি উত্থাপনকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কাফের হওয়ার ফয়সালা করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এটা শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার গুণ।

তার বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক। আর যারা স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করতে নিষেধ করেছেন তার দ্বারা সেগুলো উদ্দেশ্য, যেগুলোকে মানুষ উপভোগ বলে মনে করে। আর আল্লাহ তাআলার মারেফাত ও তাঁর দর্শন লাভের স্বাদকে মানুষ উপভোগ বলে মনে করে না। বরং এর দ্বারা অভিভূত হয়। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, মারেফাত ও তাঁর দর্শন লাভের স্বাদ এতটাই মধুর যে, যদি এর বিনিময়ে জান্নাতের যাবতীয় নিয়ামত দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এই নিয়ামতরাজিকে তুচ্ছ মনে হবে।

আবু ওসমান (র) বলেন, ইখলাস হচ্ছে স্রষ্টার প্রতি সার্বক্ষণিক খেয়াল রেখে সৃষ্টির প্রতি নজর দেওয়া ভুলে যাওয়া। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৯)

এতে শুধু লৌকিকতার বিপদ থেকে নিরাপদ থাকার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এজন্যই জনৈক মনীষী বলেন, আমলের মাঝে এমন ইখলাস হওয়া উচিত,

যেন শয়তানও না জানতে পারে। অন্যথা সে ইখলাসকে নষ্ট করার পাঁয়তারা করবে। আর ফেরেশতারাও যেন না জানতে পারে। তাহলে তারা লিখে ফেলবে।

এই বক্তব্যে গোপনে আমল করার প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়, ইখলাস হলো তা-ই যা মাখলুক থেকে লুক্কায়িত এবং যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে মুক্ত থাকে। এই সংজ্ঞাটি ইখলাসের উদ্দেশ্যসমূহকে একত্রকারী। (তাহযিবুল আসরার)

হযরত মুহাসিবি (র) বলেন, ইখলাস হলো, বান্দা এবং প্রভুর মাঝে মাখলুকের অনুপ্রবেশের দরজা বন্ধ করে দেওয়া। (তাহযিবুল আসরার)

এই সংজ্ঞায় লৌকিকতাকে পূর্ণরূপে নাকচ করা হয়েছে।

হযরত খাওয়াছ (র) বলেন, যে ব্যক্তি ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের পেয়ালা থেকে পান করে তার ইবাদতে ইখলাস নষ্ট হয়ে যায়। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৩)

একবার হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, খালেছ আমল কোনটি? তিনি বললেন, যে আমল কেবলমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য করা হয় এবং তাতে মানুষের প্রশংসা কাম্য হয় না। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৪)

এখানেও লৌকিকতা বর্জনের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর লৌকিকতাকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো, ইখলাস বিনষ্টকারী বিষয়গুলোর মাঝে এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী।

হযরত জুনায়েদ (র) বলেন, ইখলাস হলো, আমলকে যাবতীয় পঙ্কিলতা থেকে পরিচ্ছন্ন রাখা। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৫)

হযরত ফুযাইল (র) বলেন, মানুষের কারণে আমল বর্জন করা রিয়া। আর মানুষের জন্য আমল করা শিরক। আর ইখলাস হলো, রিয়া এবং শিরক উভয়টি থেকে মুক্ত থাকা। (তাহযিবুল আসরার)

বলা হয়ে থাকে, ইখলাস হলো নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও যাবতীয় আনন্দ উপভোগকে ভুলে যাওয়ার নাম। (তাহযিবুল আসরার)

রাসূলুল্লাহ (স)-কে ইখলাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন,

أَنْ تَقُوْلَ رَبِّيَ اللهُ ثُمَّ تَسْتَقِيْمَ كَمَا أُمِرْتَ.

অর্থাৎ, ইখলাস হলো একথা বলা যে, আমার রব হচ্ছেন আল্লাহ। এরপর তাঁর নির্দেশ মুতাবিক সরল পথে অটল থাকা। (জামে তিরমিযী : ২৪১০)

উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের ইচ্ছার কিংবা রাব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কারও দাসত্ব না করা। এরপর নির্দেশ মতো আল্লাহর পথে সোজা ও সরল থাকা। অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছু থেকে চোখ ফিরিয়ে নেওয়া। এটাই প্রকৃত ইখলাস।

## যেসব বিষয় ইখলাসকে কলুষিত করে

যেসব বিষয় ইখলাসকে কলুষিত ও দূষিত করে, সেগুলোর মধ্যে কতক সুস্পষ্ট বিষয়সমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে রিয়া তথা লৌকিকতা। উদাহরণত যখন কেউ নামাযে ইখলাস অবলম্বন করে, তখন যদি কিছু লোক তাকে দেখে অথবা কাছে আসে, তখন শয়তান তাকে বলে, নামায উত্তমরূপে পড়ো, যাতে দর্শকরা তোমাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এবং সাধু মনে করে। নামাযী একথা মেনে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিনয় প্রকাশ করে এবং রুকু-সেজদা উত্তমরূপে আদায় করে। প্রথম স্তরে এই রিয়া প্রাথমিক পর্যায়ের নামাযীদের কাছে গোপন থাকে না।

এটা হলো রিয়ার প্রথম স্তর। রিয়ার দ্বিতীয় স্তর এই যে, নামাযী এই আপদটি আঁচ করে নেয় এবং এ থেকে আত্মরক্ষা করে। অর্থাৎ, শয়তানের আনুগত্য করে না এবং সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না; বরং পূর্বে যেভাবে নামায পড়ছিলো, সেভাবেই পড়তে থাকে। তখন শয়তান তার কাছে কল্যাণের বাহানা নিয়ে এসে বলে, তুমি তো নেতা, অনুসৃত ও নামযাদা ব্যক্তি। তুমি যা করবে, তাতে অন্যরা তোমার অনুসরণ করবে। ফলে তাদের আমলের সওয়াব তুমিও পাবে, যদি তুমি ভালোরূপে আমল করো। পক্ষান্তরে তুমি খারাপ আমল করলে অন্যদের খারাপ আমলের কুফল তোমার ওপরও বর্তাবে। যারা প্রথম স্তরের ধোঁকার জালে আবদ্ধ হয় না, তারা অনেক সময় এই দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম জালে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু এটাও রিয়া এবং এর কারণেও ইখলাস বরবাদ হয়ে যায়। কেননা, যদি বাস্তবিকই নামাযে খুশু তার কাছে উত্তম হয় যে, অন্যের কারণে তা ত্যাগ করে না, তবে একাকী নামায পড়ার সময় নিজেকে খুশুতে অভ্যস্ত করে না কেন? সত্যিকার সাধু সে ব্যক্তি, যার অন্তর উজ্জ্বল

এবং তার ঔজ্জ্বল্য অন্যের ওপর প্রতিফলিত হয়। একথা ঠিক যে, কেউ তার অনুসরণ করলে অনুসরণকারী সওয়াবের অধিকারী হবে। কিন্তু যে গুণ তার মধ্যে ছিল না তা প্রকাশ করার কারণে এই অনুসৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

তৃতীয় স্তর দ্বিতীয় স্তরের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম। তা এই যে, বান্দা নিজের নফসের পরীক্ষা নেবে এবং শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে অবগত হয়ে জেনে নেবে যে, নির্জনে এক অবস্থা হওয়া এবং জনসমক্ষে অন্য অবস্থা হওয়া নিছক রিয়া। এখানে ইখলাস হলো, নামায একাকীত্বেও তেমনি হওয়া, যেমন জনসমক্ষে হয়। কেউ যদি মানুষের দেখা অবস্থায় অভ্যাস অনুযায়ী নামাযে অধিক খুশু করে এবং একদিকে দৃষ্টি রেখে একাকীত্বেও নিজ নফসের প্রতি মনোনিবেশ করে অধিক খুশু অবলম্বন করে, তবে তাও সূক্ষ্ম ও গোপন রিয়া। কেননা, সে নির্জনে এই নিয়তে উত্তমরূপে নামায পড়ে যে, জনসমক্ষেও যেন উত্তমরূপে নামায আদায় হয়। অতএব, নির্জনে ও জনসমক্ষে উভয় জায়গায় তার লক্ষ রইলো মানুষের প্রতি। এখানে ইখলাস এভাবে হতো যে, চতুষ্পদ জন্তুর দেখা ও মানুষের দেখা উভয়টি নামাযীর দৃষ্টিতে সমান হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে নামাযী ধারণা করে নির্জনে ও জনসমক্ষে একই রূপে নামায পড়লে সে রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তা ঠিক নয়। রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার উপায় হলো মানুষের প্রতি দৃষ্টি তেমনি থাকা, যেমন জড় পদার্থের প্রতি দৃষ্টি হয়— নির্জনে হোক অথবা জনসমক্ষে।

চতুর্থ স্তর, যা চূড়ান্ত পর্যায়ের গোপন ও সূক্ষ তা হলো এই যে, এক ব্যক্তি শয়তানের ধোঁকা জেনে ফেলেছে। ফলে তার নামায পড়া মানুষে দেখলেও শয়তান একথা বলতে পারে না যে, তুমি দর্শকদের খাতিরে খুশু কর। ফলে শয়তান তার কাছে এসে বলে, আল্লাহ তাআলার মাহাত্ম্য ও প্রতাপ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করো, যার সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আছো। আল্লাহ তোমার অন্তরকে তাঁর দিক থেকে গাফেল দেখুক— এ বিষয়ে লজ্জাবোধ করো। নামাযীর মনে এ ধারণা আসার সাথে সাথে তার অন্তর পুনরুজ্জীবিত হয় এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুশু করতে শুরু করে। নামাযী মনে করে, এটাই ইখলাস। অথচ এটা হুবহু ধোঁকা ও প্রতারণা। কেননা, যদি আল্লাহর প্রতাপের প্রতি লক্ষ করার কারণে এই খুশু হতো, তবে

একাকীত্বেও তাই হতো। কেবল অন্য কারও আগমনের কারণেই এই অবস্থা সৃষ্টি হতো না। এই আপদ থেকে বাঁচার আলামত হলো, উপরিউক্ত চিন্তাভাবনা একাকীত্বেও অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যেমন জনসমক্ষে থাকে। মোটকথা, যে পর্যন্ত মানুষের দেখা ও চতুষ্পদ জন্তুর দেখার মধ্যে নিজের আমলে পার্থক্য হতে থাকবে, সে পর্যন্ত নামাযী ইখলাস বহির্ভূত এবং গোপন শিরকে লিপ্ত বলে গণ্য হবে। এটাই সেই শিরক,যা মানুষের অন্তরে কালো পিঁপড়ার গতির চেয়েও অধিক গোপন, যে পিঁপড়া অন্ধকার রাত্রে কঠিন পাথরের উপর দিয়ে চলে। হাদিসে তা-ই বর্ণিত হয়েছে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ও আল্লাহ তাআলার হেদায়াত ও তাওফীকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই কেবল শয়তানের ফাঁদ থেকে বেঁচে থাকতে পারে। অন্যথা শয়তান তো আল্লাহ তাআলার ইবাদতে বদ্ধপরিকর লোকদের পেছনে সর্বদাই লেগে থাকে। এক মুহূর্তের জন্যও সে তাদেরকে রিয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা থেকে পিছপা হয় না।

এমনকি চোখে সুরমা লাগানো, মোচ কাটা, জুমার দিন সুগন্ধি ব্যবহার করা বা পোশাক পরিবর্তনের মাঝেও সে তাদেরকে ধোঁকা দেয়। এসবই হলো নির্ধারিত সময়ের সুন্নত। আর এসব সুন্নত আদায়ে মানুষ তৃপ্তি লাভ করে। কারণ এগুলোর দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়। ফলে শয়তান এ কাজগুলোর প্রতি আহ্বান করে বলে, এগুলো সুন্নত আমল। কখনোই এগুলো বর্জন করা উচিত নয়। অথচ অন্তর এসব কাজের প্রতি লুকিয়ে থাকা প্রবৃত্তির কারণেই আগ্রহী হয়। ফলে আমল ইখলাসের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়।

আর যে আমল এসকল বিপদাপদ থেকে মুক্ত থাকে না, তা খালেস আমল নয়। শয়তান অনেক সময় এমন মসজিদে ইতেকাফ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে যা অনুপম গাঁথুনিসমৃদ্ধ ও পরিচ্ছন্ন বসতিপূর্ণ এলাকায় নির্মিত। এমতাবস্থায় ওই মসজিদে ইতেকাফ করলে তা হবে ওই মসজিদের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। ফলে তাকে ওই মসজিদের চেয়ে তুলনামূলক কম সুন্দর কোনো মসজিদে ইতেকাফ করতে বলা হলে সে সম্মত হবে না।

এসকল কারণে আমলের সাথে অন্তরের কদর্য ও পঙ্কিলতার মিশ্রণ ঘটে। যা প্রকৃত ইখলাসকে বাতিল করে দেয়। খাঁটি সোনার সাথে যে খাঁদ যুক্ত হয় তার কয়েকটি স্তর রয়েছে। কখনো এর পরিমাণ এতো বেশি হয় যে, মূল সোনার কোনো হদিসই থাকে না। কখনো তার পরিমাণ এর চেয়ে কম হয়। আবার কখনো এতো কম হয় যে, দক্ষ ও অভিজ্ঞ স্বর্ণকার ব্যতীত অন্য কেউ তা পৃথক করতে পারে না। অন্তর ও শয়তানের ধোঁকা এর চেয়েও বেশি জটিল ও সূক্ষ্ম। এজন্যই বলা হয়, আলেমের দুই রাকাত নামায মূর্খের এক বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।

এখানে আলেম বলতে আমলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিপদাপদ সম্পর্কে অবগত এবং এসব বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভে সক্ষম ব্যক্তি উদ্দেশ্য। কারণ মূর্খ ব্যক্তির দৃষ্টি সর্বদা ইবাদতের বাহ্যিক রূপের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে সে ধোঁকা খায়।

এমনিভাবে ইবাদতের মাঝেও এধরনের স্তরবিন্যাস রয়েছে। বরং ইবাদতের বিষয়টি আরও জটিল।

## সংমিশ্রিত আমলের সওয়াবের বর্ণনা

আমল যখন আল্লাহ তাআলার জন্য একনিষ্ঠ হয় না বরং তাতে লৌকিকতা ইত্যাদি আপদের মিশ্রণ থাকে, তখন সে আমল নিয়ে কথা রয়েছে। সুতরাং সংমিশ্রিত আমলে সওয়াব পাওয়া যাবে, না শাস্তি, না কোনো কিছুই হবে না? এ ব্যাপারে বিভিন্নজন বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। শুধুমাত্র লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে যে আমল করা হয় নিঃসন্দেহে তা বাতিল এবং আল্লাহ তাআলার শাস্তিকে আবশ্যককারী। আর যে আমল আল্লাহ তাআলর জন্য একনিষ্ঠ হয় তা সওয়াব আবশ্যককারী। মতভেদ শুধু মিশ্র আমল নিয়ে। হাদিস দ্বারা জানা যায় যে, এতে সওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে এ ব্যাপারে বিভিন্নরূপ উদ্ধৃতি রয়েছে। আমাদের মতে উদ্দেশ্যের শক্তির প্রেক্ষিতে বিচার হওয়া উচিত। যদি ধর্মীয় উদ্দেশ্য ও জৈবিক উদ্দেশ্য এক সমান হয়, তাহলে এরূপ আমল সওয়াব ও আযাব এতদুভয়ের মধ্যে কোনোটিরই কারণ হবে না। আর রিয়ার উদ্দেশ্য প্রবল হলে তা শাস্তিরই কারণ হবে। কিন্তু এই আযাব শুধু রিয়ার উদ্দেশ্যে কৃত আমলের শাস্তি থেকে হালকা হবে।

আর যদি নৈকট্যের নিয়ত প্রবল হয়, তবে যে পরিমাণ প্রবল হবে, সে পরিমাণ সওয়াব হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَ مَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ.

"সুতরাং কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে, এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে সে তাও দেখবে।" (সূরা যিলযাল : ৭-৮)

আরও বলা হয়েছে হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضٰعِفْهَا.

"আল্লাহ (কারও প্রতি) অণু পরিমাণও জুলুম করেন না। আর কোনো পুণ্য কাজ হলে, আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করেন।"(সূরা নিসা : ৪০)

উপরিউক্ত আয়াতে কারীমা থেকে বোঝা যায়, সৎকাজের ইচ্ছা বিনষ্ট হবে না। যদি সৎকাজের ইচ্ছা রিয়ার ইচ্ছার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে রিয়ার ইচ্ছা পরিমাণ তা নষ্ট হবে এবং অতিরিক্তটুকু বাকি থাকবে। আর যদি সৎকাজের ইচ্ছা কম এবং রিয়ার ইচ্ছা অধিক হয়, তাহলে কেবল রিয়ার ইচ্ছার জন্য যতটুকু শাস্তি হতো, তা থেকে সৎকাজের ইচ্ছা পরিমাণ শাস্তি কমে যাবে। এই বিষয়টির বিশ্লেষণ হলো, অন্তরে আমলের প্রভাব এভাবে হয় যে, যে গুণের কারণে কাজটি সংঘটিত হয়, ওই কাজটি করার দ্বারা ওই গুণের মাঝে দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়। সুতরাং রিয়া একটি ধ্বংসাত্মক গুণ। আর এই গুণটি তদানুযায়ী আমল করার দ্বারা শক্তিলাভ করে। আর ভালো কাজের ইচ্ছার গুণ মুক্তি দান করে। আর তদানুযায়ী আমলের দ্বারাই এই গুণটি শক্তিলাভ করে। অতএব, যখন অন্তরে বিপরীতমুখী এই দুটি গুণ একত্র হয় তখন রিয়ার দাবি অনুযায়ী আমল করলে রিয়ার গুণটি দৃঢ় হয় আর আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের দাবি অনুযায়ী আমল করলে এই গুণটি দৃঢ়তা লাভ করে। প্রথমটি ধ্বংসের পথে নিয়ে যায় আর দ্বিতীয়টি মুক্তি দেয়। যদি উভয় গুণের শক্তি বরাবর হয় তাহলে গুণ দুটিও বরাবর হবে। যেমন কারও যদি গরম খাবার গ্রহণে কষ্ট হয়। এরপরও সে গরম খাবার খায়, অতপর ওই পরিমাণ ঠাণ্ডা খাবার খায় তাহলে ধরা হবে, যেন সে কিছুই খায়নি। কিন্তু যদি কোনো একটির পরিমাণ বেশি হয়। তাহলে সেটির প্রভাব বাকি থাকবে। সুতরাং যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলার রীতি

অনুযায়ী খাবারের একটি কণা বা একফোঁটা পানিও শরীরে প্রভাব বিস্তার করে তেমনিভাবে ভালো এবং মন্দের ক্ষুদ্র পরিমাণও অন্তরকে আলোকিত বা কলুষিত করার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং যদি কেউ এমন সৎকাজ করে, যার মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ এক ফুট নৈকট্য হাসিল হয় এবং তাঁর সাথে এমন অসৎকাজ করে, যার ফলে দৃষ্টান্তস্বরূপ একফুট দূরত্ব সৃষ্টি হয়, তবে এই ব্যক্তি পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, তাতেই থেকে যাবে। না সওয়াব হবে, না আযাব। আর যদি কাজটি এমন হয় যার মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ দুই ফুট নৈকট্য হাসিল হয়। আর অন্য কাজটি দ্বারা একফুট দূরত্ব হাসিল হয় তাহলে সে ওই একফুট পরিমাণ সওয়াব পাবে। হাদিস শরীফে আছে—

أَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا.

অসৎকাজের সাথে সাথে সৎকাজ করো। এই সৎকাজ অসৎকাজকে মিটিয়ে দেবে। (জামে তিরমিযী : ১৯৮৭)

সুতরাং নিরেট রিয়াকে নিরেট ইখলাস মুছে দেয়। কারও মধ্যে যদি দুটোই একত্রিত হয়, তাহলে একটি অপরটির বিপরীত কাজ করবে। এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা তথা ঐকমত্য রয়েছে যে, যে ব্যক্তি হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে এবং তার সাথে ব্যবসায়ীক মাল সামানাও থাকে, তার হজ জায়েয হবে এবং সে হজের পুরস্কার পাবে।

একথা বলা যেতে পারে যে, ওই ব্যক্তি হজের সওয়াব তখনই লাভ করে যখন সে মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে হজের রোকনসমূহ পালন করে। আর ব্যবসার সম্পর্ক তার সফরের সাথে থাকে।

কাজেই তার হজ একনিষ্ঠ হয়েছে। তবে তার হজের সফর যৌথ হয়েছে। আর সফরের জন্য সওয়াব পাওয়া যায় না। তবে সঠিক কথা হলো, যদি এই সফরে হজই মুখ্য উদ্দেশ্য হয় আর ব্যবসার উদ্দেশ্য তার অনুগামী হয় তাহলে এই সফরেও সওয়াব পাওয়া যাবে। যে ব্যক্তি গনিমত প্রাপ্তির আশায় আল্লাহর রাস্তায় কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে সে নিশ্চয়ই ওই ব্যক্তির সমান নয় যে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জিহাদ করে। এর মানে এই নয় যে, যে ব্যক্তি গনিমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে সে একেবারেই সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। বরং ইনসাফপূর্ণ কথা হলো, যদি

আল্লাহ তাআলার কালিমাকে সমুন্নত করা তার মুখ্য উদ্দেশ্য হয় আর গনিমত প্রাপ্তির উদ্দেশ্য তার অনুগামী হয় তাহলে সে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না। তবে তার সওয়াব ওই ব্যক্তির চেয়ে কম হবে যে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই জিহাদ করে এবং গনিমতের প্রতি তার অন্তর আকৃষ্ট হয় না।

অবশ্য আয়াত ও হাদিস থেকে জানা যায় রিয়ার সংমিশ্রণ সওয়াবকে বরবাদ করে দেয়। হজের সফরে ব্যবসায়ীর ইচ্ছা করাও অনুরূপ একটি সংমিশ্রণ। তাউস (র) এবং আরও কয়েকজন তাবেয়ী রেওয়ায়েত করেন যে, একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করল, এক লোক দানখয়রাত করে এবং মানুষ তার প্রশংসা করুক এটা সে পছন্দ করে এবং সে চায় যে, সওয়াবও হোক। নবী কারীম (স) এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হলো,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا.

অর্থাৎ, "সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে।" (সূরা কাহফ : ১১০)

হযরত মুআয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, اَدْنَى الرِّيَاءِ شِرْكٌ অর্থাৎ, রিয়া নিম্নতম শিরক। (তাবারানি : ২০ : ৩৬)

হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার আমলে শিরক করবে, তাকে বলা হবে, যার উদ্দেশ্যে তুমি আমল করেছিলে তুমি তোমার সওয়াব তার নিকট থেকে গ্রহণ করো। (জামে তিরমিযী : ৩১৫৪)

হযরত উবাদা ইবনুস সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি শরীক থেকে অমুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি আমার উদ্দেশ্যে কোনো আমল করে এবং আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে। আমি আমার অংশ আমার শরীকের জন্য ছেড়ে দেই।

হযরত আবু মূসা (রা) বর্ণনা করেন, এক অনারব রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক লোক আত্মমর্যাদার জন্য যুদ্ধ

করে, অন্যজন বীরত্বের জন্য যুদ্ধে নামে এবং তৃতীয়জন আল্লাহর নিকট নিজের মর্তবা জানার জন্যে লড়াই করে। তাদের মধ্যে কে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করলো? জবাবে তিনি বললেন, যে লোক আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। (সহিহ বুখারী : ৭৪৫৮; সহিহ মুসলিম : ১৫০)

হযরত ওমর (রা) বলেন, তোমরা বলো, অমুক ব্যক্তি শহীদ। কে জানে, হয়তো সে তার বাহনের থলি দুটি ঋণ বা রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা পূর্ণ করে ফেলেছে। (বায়হাকী : ৬ : ৩৩২)

হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন,

مَنْ هَاجَرَ يَبْتَغِيْ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا فَهُوَ لَهُ.

যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো কিছু পাওয়ার জন্য হিজরত করে সে তা-ই পাবে। (মুজামুল কাবীর : ৯ : ১০৩)

আমরা বলি, উপরিউক্ত আয়াত ও হাদিসমূহ আমাদের উল্লিখিত বক্তব্যের পরিপন্থি নয়। কেননা, এগুলোতে সে ব্যক্তিকেই বোঝানো হয়েছে, যে দুনিয়ার জন্যই আমল করে এবং দুনিয়ার অন্বেষণই তার নিয়তে প্রবল থাকে। দীনী আমলের বিনিময়ে দুনিয়া তলব করা হারাম। কেননা, এতে ইবাদত স্বস্থান থেকে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

মিশ্র আমল বলতে আমাদের উদ্দেশ্য এমন আমল, যাতে উভয় নিয়ত সমান সমান থাকে। এরূপ আমলে সওয়াব ও আযাব কিছুই হয় না। সুতরাং এরূপ আমল দ্বারা সওয়াবের আশা করা উচিত নয়।

তাছাড়া আমলে সৎ ও অসৎ-এর মিশ্রণ থাকা একটি বড় বিপদ। কারণ, এ দুয়ের কোনটি ইচ্ছার ক্ষেত্রে প্রবল, তা জানা যায় না। ফলে তা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এজন্যই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاۤءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا.

সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করে, সে যেন সৎকাজ করে এবং আপন প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরিক না করে। (সূরা কাহফ : ১১০)

একথা বলা যেতে পারে যে, জিহাদে ইখলাসের নিয়ত ব্যতীত শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা যায় না। আর একথা বলা অসম্ভব যে, যে ব্যক্তি শুধুমাত্র দীনী উদ্দেশ্যে গনিমত প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকলেও জিহাদে অংশগ্রহণ করে এবং ধনী ও গরীব সব ধরনের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়। অতঃপর আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করা এবং গনিমত প্রাপ্তি উভয়টির উদ্দেশ্যে ধনীদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশগ্রহণ করে তাহলে সে এই জিহাদের সওয়াব পাবে না।

বিষয়টি এমন হলে দীনের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের মাঝে হতাশা ছেয়ে যাবে। কারণ নিয়তের এধরনের মিশ্রণ থেকে খুব কম লোকই নিরাপদ থাকতে পারে। কাজেই এই নিয়তের কারণে আমলের সওয়াবের মাঝে ঘাটতি হবে কিন্তু সওয়াব একেবারেই রহিত হয়ে যাবে না। তবে এক আমলে দুই ইচ্ছা পোষণকারী ব্যক্তি ভয়াবহ ঝুঁকিতে থাকে। কারণ অনেক সময় সে মনে করে, আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনই তার মুখ্য উদ্দেশ্য। অথচ তার অন্তরে দুনিয়া অর্জনের বাসনা লুক্কায়িত থাকে। অতএব, একমাত্র ইখলাসই এর থেকে মুক্তি দিতে পারে। আর বান্দা তার আমলে ইখলাস আছে কি না তা নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না। এজন্যই বান্দার উচিত, কোনো কাজ করার পর তা কবুল হবে কি না এ ব্যাপারে সন্দিহান থাকা, কারণ হতে পারে। তার আমলে এমন কোনো আপদ এসে যাবে, যার অশুভ পরিণাম তার সওয়াবের চেয়ে বেশি হবে। বিচক্ষণ ও খোদাভীরু ব্যক্তিদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। এজন্যই হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন, আমি যেসব আমল করি সেগুলোকে গ্রহণযোগ্য মনে করি না। (কূতুল কুলূব : ২ : ১৫৭)

হযরত আবদুল আযিয ইবনে আবী রওয়াদ (র) বলেন, আমি ষাট বছর কাবাঘরের পাশে বসবাস করেছি এবং ষাটবার হজ করেছি। এরপরও আল্লাহর জন্য কোনো আমল করার পর যখনই আমি নিজের অন্তরের পরীক্ষা নিয়েছি তখন আল্লাহর চেয়ে শয়তানের ভাগই বেশি পেয়েছি। আমার আমলগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব কোনোটি না হলেই আমার জন্য উত্তম হতো। (আল কামেল : ৫ : ২৯১)

ইখলাসে বিপদ অনেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপদের কারণে আমল বর্জন করা যাবে না। আমাদের উপরিউক্ত বর্ণনার উদ্দেশ্য মূলত ইখলাসকে বর্জন

না করা। আমলই যদি না করা হয়, তাহলে তো আমল ও ইখলাস দুটোই নষ্ট হয়ে যাবে। বর্ণিত আছে, এক ফকির হযরত আবু সাঈদ খাররাযের সেবা করতো এবং কাজকর্মে তাকে সাহায্য করতো। একদিন তিনি ফকিরকে কাজকর্মে ইখলাস অবলম্বন করতে বললেন। ফকির প্রতিটি কাজের সময় অন্তরের অবস্থা দেখতে লাগল। ইখলাস অর্জনে অক্ষম হয়ে পরে সে কাজকর্মই বন্ধ করে দিল। এতে হযরত আবু সাঈদ (র) কষ্টে পড়ে গেলেন। কেননা, তার কাজকর্মে সাহায্যকারী কেউ ছিল না। তিনি ফকিরকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এখন কাজ করছো না কেন? ফকির বলল, আপনার কথামতো ইখলাস অবলম্বনে ব্যর্থ হয়ে কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, এরূপ করো না। ইখলাস আমলকে পৃথক করে না। আমল করে যাও এবং ইখলাস হাসিলের চেষ্টা করতে থাকো। আমি তোমাকে আমল ত্যাগ করতে বলিনি। বরং আমলকে নিষ্কলুষ করতে বলেছি। (কূতুল কুলূব : ১৬৩)

হযরত ফুযাইল (র) বলেন, মানুষের কারণে আমল বর্জন করা রিয়া আর মানুষের কারণে কোনো আমল করা শিরক। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৫)

## সত্যবাদিতার ফযিলত

সত্যবাদিতা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ.

তারা এমন মানুষ, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার সত্যে রূপান্তরিত করেছে। (সূরা আহযাব : ২৩)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন,

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى البِرِّ، وَالْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَاللّٰهِ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ إِلَى الفُجُورِ، وَالْفُجُوْرُ يَهْدِىْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّابًا.

সত্যবাদিতা কল্যাণের রাস্তা দেখায় আর কল্যাণ জান্নাতে পৌঁছায়। মানুষ সত্য বলতে থাকে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট সিদ্দীক হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। মিথ্যা পাপের রাস্তা দেখায়। পাপাচার দোযখের পথ দেখায়। মানুষ

মিথ্যা বলতে থাকে, অবশেষে সে আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। (সহিহ বুখারী : ৬০৯৪ ও সহিহ মুসলিম : ২৬০৭)

সত্যবাদিতার ফযিলতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, 'সিদ্দীক' শব্দটি এ থেকেই নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলগণের প্রশংসায় তাদেরকে সিদ্দীক আখ্যায়িত করেছেন। যেমন—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا.

"কিতাবে ইবরাহীমের ঘটনা আলোচনা করুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ নবী।" (সূরা মারইয়াম : ৪১)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا.

স্মরণ করুন, এ কিতাবে ইসমাঈলের কথা। নিশ্চয় সে ছিল প্রতিশ্রুতিপালনে সত্যাশ্রয়ী এবং সে ছিল রাসূল, নবী। (সূরা মারইয়াম : ৫৪)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيْسَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيْقًا نَّبِيًّا.

"কিতাবে ইদ্রিসের ঘটনা আলোচনা করুন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ নবী।" (সূরা মারইয়াম : ৫৬)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, চারটি বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলোর ফায়দা সেই লোকই পায়, যার মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাওয়া যায়— সত্যবাদিতা, লজ্জা, সচ্চরিত্রতা ও শোকর। (তাহযিবুল আসরার : ২৯০)

বিশর ইবনে হারিস (র) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে খালিসভাবে আচরণ করে, সে মানুষকে অবজ্ঞা করে। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৭)

হযরত আবু আবদুল্লাহ রামালী (র) বলেন, একবার আমি হযরত মানসুর দিনূরী (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাকে আশাতীত মর্যাদা দান করেছেন। আমি বললাম, বান্দা যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহ অভিমুখী হয় তন্মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কোনটি? তিনি বললেন, সত্যবাদিতা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো মিথ্যা। (তাহযিবুল আসরার : ২৮৭)

হযরত আবু সুলায়মান (র) বলেন, সত্যবাদিতাকে নিজের বাহন, সত্যকে তরবারি আর আল্লাহ তাআলাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য বানিয়ে নাও।

কোনো এক লোক জনৈক দার্শনিককে বলল, আমি কোনো খাঁটি মানুষ দেখিনি। দার্শনিক বলল, তুমি যদি খাঁটি হতে, তবে খাঁটিদেরকে চিনতে পারতে।

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী (র) বলেন, আমরা আল্লাহ তাআলার দীনকে তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত পেয়েছি। সততা, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতা। সততা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে, ন্যায়পরায়ণতা অন্তরের মাধ্যমে আর সত্যবাদিতা বিবেকবুদ্ধির মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ.

যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, কিয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কালো দেখবেন। উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? (সূরা যুমার : ৬০)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত নূরী (র) বলেন, তারা হলো ওই সকল লোক যারা আল্লাহকে ভালোবাসে বলে দাবি করে কিন্তু তাদের এই কথায় তারা সত্যবাদী নয়।

আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ)-এর কাছে ওহি নাযিল করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্তর দিয়ে আমাকে বিশ্বাস করে আমি কেয়ামত দিবসে সকলের সামনে তার সত্যায়ন করবো। (তাহযিবুল আসরার : ২৯১)

এক ব্যক্তি হযরত শিবলী (র)-এর বৈঠকে চিৎকার দিয়ে উঠল। এরপর সে দজলা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। হযরত শিবলী (র) বললেন, যদি সে খাঁটি হয়, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে বাঁচিয়ে দেবেন, যেমন হযরত মূসা (আ)-কে বাঁচিয়েছিলেন। আর যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তাকে ডুবিয়ে দেবেন, যেমন ফেরাউনকে ডুবিয়ে মেরেছেন। (তাহযিবুল আসরার : ২৯১)

আলেম ও ফকিহগণ এ বিষয়ে একমত যে, তিনটি বিষয় ঠিক হয়ে গেলে মানুষ নাজাত পাবে। (১) বিদআত ও প্রবৃত্তিমুক্ত ইসলাম, (২) আমলে আল্লাহ তাআলার নিষ্ঠা এবং (৩) হালাল খাদ্য।

ওয়াহব ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আমি তাওরাতে বাইশটি বাণী দেখেছি যা বনী ইসরাঈলের সৎলোকেরা একত্রিত হয়ে তিলাওয়াত করতো। বাক্যগুলো হচ্ছে, ১. কোনো সম্পদের ভাণ্ডার জ্ঞানের চেয়ে বেশি কল্যাণকামী নয়। ২. কোনো সম্পদ সবরের চেয়ে বেশি ফলদায়ক নয়। ৩. আদবের চেয়ে উত্তম কোনো হিসাব নেই। ৪. কোনো স্বভাব ক্রোধের চেয়ে অধিক নীচু নয়। ৫. কোনো সাথী আমলের চেয়ে বেশি শোভাদায়ক নয়। ৬. কোনো সঙ্গী মূর্খতার চেয়ে বেশি দোষী নয়। ৭. কোনো গৌরব আল্লাহভীতির চেয়ে বেশি প্রিয় নয়। ৮. কোনো বীরত্ব অভিলাষ ত্যাগের চেয়ে অধিক পূর্ণাঙ্গ নয়। ৯. কোনো আমল চিন্তা-ভাবনার চেয়ে অধিক শ্রেষ্ঠ নয়। ১০. কোনো নেক কাজ ধৈর্য অপেক্ষা উচ্চ নয়। ১১. কোনো দোষ অহংকার অপেক্ষা অধিক অপমানজনক নয়। ১২. কোনো ওষুধ নম্রতার চেয়ে অধিক নম্র নয়। ১৩. কোনো ব্যাধি বোকামির চেয়ে অধিক কষ্টদায়ক নয়। ১৪. কোনো রাসূল সত্যবিমুখ নয়। ১৫. সত্যবাদিতার চেয়ে বেশি কোনো মঙ্গলকামী নেই। ১৬. কোনো ফকির-লোভীর চেয়ে বেশি লাঞ্ছিত নয়। ১৭. কোনো ধনসম্পদ ধরে রাখার চেয়ে বেশি হতভাগা নয়। ১৮. কোনো জীবন সুস্থতা অপেক্ষা ভালো নয়। ১৯. বিনম্রতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো ইবাদত নেই। ২০. সামান্যতেই খুশির চেয়ে ভালো বৈরাগ্য নেই। ২১. চুপ থাকার থেকে ভালো কোনো হেফাজতকারী নেই। ২২. কোনো অদৃশ্য বস্তু মৃত্যু অপেক্ষা অধিক নিকটবর্তী নয়। (তাহযিবুল আসরাব : ২৯৪)

মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ মারুযী (র) বলেন, যখন তুমি আল্লাহ তাআলাকে একনিষ্ঠভাবে তালাশ করবে, তখন তিনি তোমার হাতে একটি আয়না দিবেন, যার মধ্যে তুমি ইহকাল ও পরকালের বিস্ময়কর বিষয়সমূহ দেখতে পাবে। (তাহযিবুল আসরাব : ২৯৬)

হযরত আবু বকর আল ওয়াররাক (র) বলেন, তুমি আল্লাহ ও নিজের মাঝে সত্যবাদিতা রক্ষা করো, আর বান্দাদের সাথে নম্রতা অবলম্বন করো। (তাহযিবুল আসরার : ২৯৭)

হযরত যুন নূন মিসরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, বান্দার সব বিষয় শুদ্ধ করার কোনো পন্থা আছে কি? উত্তরে তিনি এই পঙক্তিদ্বয় আবৃত্তি করলেন,

قَدْ بَقِيْنَا مُذَبْذَبِيْنَ حَيَارَىٰ * نَطْلُبُ الصِّدْقَ مَا اِلَيْهِ سَبِيْلُ

فَدَعَاوَى الْهَوَىٰ تَخِفُّ عَلَيْنَا * وَخِلَافُ الْهَوَىٰ عَلَيْنَا ثَقِيْلُ

গুনাহের কারণে দ্বিধান্বিত ও পেরেশান হয়ে বেঁচে আছি।
আমরা সত্যবাদিতার অন্বেষণ করি কিন্তু তার পথ খুঁজে পাই না।
প্রবৃত্তির অনুসরণ আমাদের কাছে অতি সহজ,
অথচ প্রবৃত্তির বিরোধিতা আমাদের কাছে খুবই কঠিন।

হযরত সাহ্‌ল তস্তরী (র)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আমাদের এই বিষয়ে ভিত্তি কোনটি? তিনি বললেন, সত্যবাদিতা, বদান্যতা, ও সাহসিকতা। তাকে বলা হলো, আরও কিছু বলুন। তিনি বললেন, তাকওয়া, লজ্জা ও হালাল রিযিক।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একবার রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট দীনের পূর্ণতা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন, সত্য কথা বলা এবং সত্যবাদিতা অনুযায়ী আমল করা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا.

সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য। তিনি কাফেরদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি। (সূরা আহযাব : ৮)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত জুনায়েদ (র) বলেন, যারা নিজেদেরকে সত্যবাদী মনে করে। কেয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার সামনে তাদের সত্যবাদিতার প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হয়ে যাবে।

## সিদকের চিত্র

"সিদক" তথা সত্যবাদিতা ছয়টি অর্থে ব্যবহৃত হয় (১) কথায় সত্যবাদিতা, (২) নিয়তে সত্যবাদিতা, (৩) সংকল্পে সত্যবাদিতা, (৪) সংকল্প বাস্তবায়নে নিষ্ঠা, (৫) আমলে নিষ্ঠা এবং (৬) ধর্মীয় মাকামসমূহে নিষ্ঠা। যে ব্যক্তি এই ছয়টি সত্যবাদিতার গুণে গুণান্বিত হয়, তাকে বলা হয় সিদ্দীক। কারণ, সে সিদকের চরম সীমায় পৌঁছে যায়।

নিচে উপরিউক্ত বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো।

১. কথায় সত্যবাদিতা ওই সব সংবাদ ও উক্তিতে হয়ে থাকে, যেগুলো অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করাও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রত্যেক বান্দার উচিত, নিজের কথাবার্তার দিকে লক্ষ রাখা এবং সত্য ব্যতীত কোনোরকম রূপক কথাবার্তা না বলা। সিদকের সকল প্রকারের মধ্যে এপ্রকারটি সর্বাধিক স্পষ্ট। যে ব্যক্তি নিজের জিহ্বার হেফাজত করে এবং বাস্তবতার বিপরীত কিছু না বলে, তাকে বলা হয় সাদিক তথা সত্যবাদী। কিন্তু এই সিদকের পূর্ণতার দুটি স্তর রয়েছে। এক. রূপক ভাষা থেকে বেঁচে থাকা, কেননা বলা হয়ে থাকে, মিথ্যা থেকে বাঁচার জন্য রূপক ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়। আসলে এটাও মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। মাঝে মধ্যে সময়কাল ও পাত্র ভেদের জন্যে এর আশ্রয় নিতে হয়। যেমন— বালক-বালিকা ও মহিলাদের শাসন করার ক্ষেত্রে, জালিমদের ছোবল থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে এবং দুশমনের মুকাবিলা করার সময়।

এসব ক্ষেত্রে কারও যদি মিথ্যা বলতে হয় এবং মিথ্যা বলা ছাড়া আর কোনো উপায়ও না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে সত্য পথ হচ্ছে আল্লাহর জন্য ওই কথা বলবে, সত্য যেদিকে পথনির্দেশ করে এবং দীন যেদিকে আহবান করে। যখন সে এভাবে বলবে, সে সত্যবাদী হবে।

যদিও তার কথা থেকে এমন কথা বা কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যা ঘটেনি। বাস্তবে সত্যবাদিতা সত্তাগতভাবে উদ্দেশ্য নয়, বরং সত্যের উপর প্রমাণ বহন করা ও তার দিকে আহবান করাই উদ্দেশ্য। কাজেই বাহ্যিক আকৃতির দিকে তাকানো যাবে না।

এসব ক্ষেত্রে যথাসম্ভব কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার করা যায়, যাতে সুস্পষ্ট মিথ্যা না হয়। রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন সফরে বের হতেন, তখন অন্যদের নিকট তা গোপন রাখতেন, যাতে দুশমনরা টের না পায়। এটা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। এক হাদিসে বলা হয়েছে—

لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ نَمَى خَيْرًا.

অর্থাৎ, সে মিথ্যুক নয়, যে দু'ব্যক্তির মধ্যে শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে উত্তম কথা বলে অথবা উত্তম কথা বৃদ্ধি করে। (সহিহ বুখারী : ২৬৯২ ও সহিহ মুসলিম : ২৬০৫)

রাসূলুল্লাহ (স) তিন স্থানে মিথ্যা কথা সময়োপযোগী বলেছেন। এক. দু'ব্যক্তির মধ্যে যে শান্তি স্থাপন করে। দুই. স্ত্রীর কাছে এবং তিন. যে যুদ্ধে নেমেছে। এসব স্থানে সিদকের অর্থ নিয়তের নিষ্ঠা। ফলে সৎ নিয়ত ও সদিচ্ছার প্রতি লক্ষ রাখা হয়, ভাষার দিকে নয়।

সুতরাং যার ইচ্ছা সৎ হবে এবং শুধু কল্যাণই কাম্য হবে, সে সত্যবাদী ও সিদ্দীক হিসেবে গণ্য হবে। এতদসত্ত্বেও এসব জায়গায় ইশারা-ইঙ্গিতে বর্ণনা করা উত্তম। যেমন, বর্ণিত আছে, জনৈক বুযুর্গকে যখন কোনো জালেম ব্যক্তি তালাশ করতো এবং তিনি ঘরেই থাকতেন, তখন নিজের স্ত্রীকে বলতেন, অঙ্গুলি দ্বারা মাটিতে একটি বৃত্ত আঁকো এবং.তার ভিতরে আঙ্গুল রেখে বলে দাও, তিনি এখানে নেই। এ বাহানায় তিনি মিথ্যা বলা থেকে এবং জালেম থেকে আত্মরক্ষা করতেন। পত্নীর কথা সত্য হতো; কিন্তু জালেম বুঝত যে, তিনি ঘরে নেই।

পূর্ণতার দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে, মুখে উচ্চারিত ভাষার অর্থের দিকেও লক্ষ রাখা। অন্যথা মুখে সত্য কথা বললে এবং নিজের অবস্থা সে অর্থের সাথে না মিললে মিথ্যা বক্তব্য হয়ে যাবে। যেমন— কেউ আল্লাহর নিকট মুনাজাত ও দুআ করতে গিয়ে বলে—

إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ.

আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছি, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা আনআম : ৭৯)

অথচ তার অন্তর আল্লাহ থেকে বিমুখ এবং জাগতিক কামনা-বাসনায় ব্যস্ত। এমতাবস্থায় সে হবে মিথ্যুক। অথবা কেউ মুখে বলে إِيَّاكَ نَعْبُدُ অর্থাৎ, আমি শুধুমাত্র আপনারই দাসত্ব করি, (সূরা ফাতেহা : ৪) অথচ তার মধ্যে দাসত্বের স্বরূপ নেই, এবং তার উদ্দেশ্য আল্লাহ ভিন্ন অন্যকিছু। তবে তার কথা নিষ্ঠাপূর্ণ হবে না।

যদি পরকালে আমি 'আল্লাহর বান্দা' একথার সত্যায়ন চাওয়া হয়, তাহলে কেউ তা সত্যায়ন করে দেখাতে পারবে না। কেননা যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তি, দুনিয়া ইত্যাদির অনুসারী হবে সে ওই কথায় কীভাবে সত্যবাদী

হবে? যে ব্যক্তি যার ইবাদত করে সে তার বান্দা হয়ে যায়। ঈসা (আ) তার সম্প্রদায়ের অবাধ্যদের এ শব্দে সম্বোধন করেছেন 'হে দুনিয়ার বান্দা। আর রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ تَعِسَ عَبْدُالدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْحِلَّةِ وَالْخَمِيْصَةِ

দীনার দিরহামের পূজারিরা ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক পোশাক ও খাবারের লোভীরা। (সহিহ বুখারী : ৬৪৩৫)

এই হাদিসে প্রত্যেককে যার বান্দা তার দিকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হচ্ছেন যিনি গায়রুল্লাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন। এই মুক্তি লাভের পর অন্তর খালি হয়ে যাবে এবং আল্লাহর দাসত্ব অন্তরে স্থান করে নিবে। এ বিশ্বাস তাকে আল্লাহর ভালোবাসায় নিমগ্ন করে দিবে এবং তার জাহের ও বাতেন গায়রুল্লাহর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর আনুগত্যে ডুবে থাকবে। আল্লাহ ছাড়া তার আর কোনো লক্ষ্য থাকবে না। এ স্তরের পর বান্দা আরও উচু স্তরে পৌছে যায়। যাকে স্বাধীনতা বলা হয়। অর্থাৎ, সে এই বিষয় থেকে আযাদ হয়ে যায় যে, সে নিজে আল্লাহর জন্য কোনো ইচ্ছা করবে। বরং আল্লাহ তাআলা যা কিছু তার জন্য নির্ধারণ করেন তার উপর সে রাজি হয়ে যায়। তার কামনা বাসনা আল্লাহর ইচ্ছার সামনে নিঃশেষ হয়ে যায়। এমন ব্যক্তি দুইবার আযাদ হয়। প্রথমত যখন সে গায়রুল্লাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করে; দ্বিতীয়ত যখন সে নিজের প্রবৃত্তি থেকে মুক্তি পায়।

এখন সে নিজের দিক থেকে নিশ্চিহ্ন আর আল্লাহর দিক থেকে বিদ্যমান। যদি তিনি নড়াচড়া করান সে নড়াচড়া করে আর যদি স্থির রাখেন তো স্থির থাকেন। তিনি যদি কোনো বিপদে ফেলে দেন তাহলে তার উপর সে রাজি থাকে। এক্ষেত্রে তার কোনো আবেদন, আশা ইত্যাদির কোনো অবকাশ থাকে না। বরং আল্লাহর সামনে সে গোসল দান-কারীর হাতে মৃত ব্যক্তির মতো হয়ে যায়।

এটা হচ্ছে দাসত্বের শেষ স্তর। আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হচ্ছে, যার অস্তিত্ব শুধু আল্লাহর জন্য; শুধু নিজের জন্য নয়। এটা সিদ্দীকদের স্তর। গায়রুল্লাহ থেকে মুক্ত থাকা সিদ্দীকদের পরিচয়। এরপর আল্লাহর দাসত্ব অর্জিত হয়। এ স্তরের পূর্বে কাউকে সিদ্দীক বা সাদিক কোনো কিছুই বলা যায় না।

২. নিয়তে ও ইচ্ছায় নিষ্ঠা হচ্ছে ইখলাস। অর্থাৎ, সাধকের যাবতীয় কাজকর্মের প্রেরণাদাতা আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কিছু না হওয়া। কাজেই যদি কোনো জৈবিক কামনা-বাসনা এর সাথে মিশে যায়, তাহলে নিয়তের নিষ্ঠা নষ্ট হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় সাধককে মিথ্যুক বলা হবে। ইখলাসের ফযিলত সম্পর্কে ইতঃপূর্বে এক হাদিসে তিন ব্যক্তির জিজ্ঞাসা ও জবাব গত হয়েছে।

তাতে বলা হয়েছে যে, আলিমকে প্রশ্ন করা হবে, তুমি ইলম শিখে কী আমল করেছ? সে উত্তর দেবে, আমি অমুক কাজ করেছি। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যাবাদী; বরং তোমার ইচ্ছা ছিল যে, মানুষ তোমাকে আলেম বলুক। এখানে লক্ষণীয় যে, তাকে একথা বলা হয়নি যে, তুমি আমল করোনি; বরং কেবল নিয়তের ব্যাপারে তাকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে। নিম্নোক্ত আয়াতে এমনিভাবে মুনাফিকদেরকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে—

وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ.

আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (সূরা মুনাফিক : ১)

অথচ মুনাফিকরা আল্লাহর রাসূল (স)-কে বলেছিল— اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ অর্থাৎ, অবশ্যই আপনি আল্লাহর রাসূল। তাদের এ কথাটি একদম সত্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের এ কথাটিকে মিথ্যা বলেননি। বরং একথা বলার পেছনে তাদের হৃদয়ের গহীনে যে সুপ্ত নিয়ত ছিল, সেটাকে মিথ্যা বলেছেন।

কেননা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয় সংবাদকে আর কাফেরদের এ কথার মাঝে অবস্থার প্রমাণ বিদ্যমান। কারণ বক্তা কথা বলার দ্বারা অন্তরের বিশ্বাসের সংবাদ দিচ্ছে এবং বলছে, যা কিছু আমরা মুখে বলছি তা আমাদের অন্তরে রয়েছে। তো তাদের এই দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, তোমরা অবস্থার প্রমাণ দ্বারা নিজেদের বিশ্বাসের উপর দলিল দিচ্ছ এটা মিথ্যা। তাদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে; শব্দের ক্ষেত্রে নয়। সিদকের এক অর্থ হচ্ছে নিয়ত বিশুদ্ধ হতে হবে। আর এটাই ইখলাস। প্রত্যেক সত্যবাদীর মুখলিস হওয়া জরুরি।

৩. নিয়তে নিষ্ঠার অর্থ হলো, মানুষ অনেক আমল করার পূর্বে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বলে, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে ধনসম্পদ দান করেন, তাহলে সবই সদকা করে দেব অথবা অর্ধেক সদকা করব। এই প্রতিজ্ঞা কখনো মানুষের মনে মজবুত ও সত্যিকারভাবে প্রগাঢ় হয় এবং কখনো এতে এক প্রকার সন্দেহ ও দুর্বলতা থাকে। এই সন্দেহ ও দুর্বলতা সিদ্‌কের খেলাফ। এখানে সত্য-এর অর্থ হচ্ছে পূর্ণতা ও শক্তি অর্থাৎ, সে তার সংকল্পে দৃঢ়। যেমন বলা হয় তার কামনা পরিপূর্ণ। কখনো কোনো অসুস্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়, তার প্রবৃত্তি মিথ্যা আর এটা ওই সময় বলা হয়, যখন তার বাসনা কোনো শক্তিশালী বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয় বা দুর্বল। সুতরাং আমরা যখন ওই অর্থ সমূহ থেকে কোনো একটা অর্থে সিদক বা সত্য শব্দটি বলে থাকি তখন এই অর্থ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। এই অর্থ অনুযায়ী সাদিক ও সিদ্দীক এমন ব্যক্তিকে বলা হবে, যার সদকা করার মানসিকতা পূর্ণাঙ্গ ও মজবুত থাকে। না তার মাঝে দুর্বলতা আছে না সংশয়। বরং সর্বদা কল্যাণকর কাজে অন্তর লেগে থাকে যেমন ওমর ইবনুল খাত্তাব-এর এই উক্তি যে, আমার গর্দান যদি কেটে দেওয়া হয় তারপরও এটা উত্তম যে, আবু বকর (রা)-এর মতো মানুষ যে সম্প্রদায়ে রয়েছে তাদের আমির হওয়ার চেয়ে।

তার অন্তর এই অঙ্গীকার করেছিল যে, আবু বকর (রা)-এর জীবদ্দশায় তিনি আমিরের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না। এই অঙ্গীকারকে নিজেকে হত্যা করার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রবল ইচ্ছার দিক দিয়ে সত্যবাদীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। কখনো ইচ্ছা হয় কিন্তু নিজের প্রাণ চলে যাওয়ার উপর প্রাধান্য পায় না। তবে স্বেচ্ছায় পিছে হটা পছন্দ করে না। আবার কখনো ইচ্ছা করে কিন্তু এত প্রবল হয় না যে, প্রাণ চলে যাওয়ারও ভ্রূক্ষেপ করে না। এমন ব্যক্তির সামনে হত্যার আলোচনা করা হলে সেই ইচ্ছা আর বাকি থাকে না। সত্যবাদী ও মুমিনদের মধ্যে এমন এক দল রয়েছে। যদি তাকে ও আবু বকর (রা)-কে হত্যার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাহলে তার জীবন আবু বকরের জীবনের চেয়ে বেশি প্রিয় হবে।

৪. নিয়ত বাস্তবায়নেও নিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ, মানুষ অনেক সময় নিয়ত করে ফেলে। কারণ, এতে কোনো টাকাপয়সা খরচ করতে হয় না। কিন্তু যখন সংকল্পটি পরিপূর্ণ করার সময় আসে, তখন কামনা-

বাসনা প্রবল হওয়ার ফলে সংকল্প নিস্তেজ হয়ে যায়। এটা সংকল্প বাস্তবায়নে সিদকের খেলাফ। আল্লাহ তাআলা এরূপ সিদক সম্পর্কে বলেন,

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ.

মুমিনগণের মধ্যে অনেক লোক আছে, যারা আল্লাহর সাথে তাদের (জীবনবাজির) কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। (সূরা আহযাব : ২৩)

উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, বদর যুদ্ধে বিশেষ কারণবশত রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে আনাস ইবনে নযর (রা) শরীক ছিলেন না। বিষয়টি তার জন্য ছিল যন্ত্রণাদায়ক। তিনি বললেন, এটা ছিল শাহাদাত লাভের প্রথম সুযোগ। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) যুদ্ধে যোগদান করেছেন, অথচ আমি এক হতভাগা অনুপস্থিত রইলাম। আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (স)-এর সঙ্গে থেকে শহীদ হওয়ার এরকম সুযোগ আবার এলে আল্লাহ তাআলা দেখবেন আমি কি করি। রাবী বলেন, এই আনাস ইবনে নযর পরবর্তী বছর উহুদ যুদ্ধে হাজির হন। যুদ্ধক্ষেত্রে সাদ ইবনে মুআয (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আমর! কোথায় যেতে চাচ্ছো? তিনি বললেন, আমি উহুদের দিক থেকে বেহেশতের চমৎকার হাওয়া অনুভব করছি। এরপর তিনি বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে শহীদ হন। তাঁর শরীরে আশিটির অধিক তির, তরবারি ও বর্শার ক্ষত চিহ্ন ছিল। তাঁর বোন বলেন, আঘাতের কারণে আমি আমার ভাইকে চিনতে পারিনি। এরপর আঙ্গুলের মাথা দেখে চিনতে পেরেছি। তখন উপরিউক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। (জামে তিরমিযী : ৩২০০)

মুসআব বিন ওমাইর যিনি রাসূল (স)-এর বাহিনীর পতাকা বহনকারী ছিলেন। তিনি শহিদ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) তার পাশে দাঁড়ালেন এবং এই আয়াত পাঠ করলেন।

وَ اَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَ قَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا.

কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেদের সাহায্য করেছিল, তাদেরকে আল্লাহ তাদের দুর্গ থেকে অবতরণে বাধ্য করালেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাদের কতককে হত্যা করেছিলে এবং কতককে করেছিলে বন্দি। (সূরা আহযাব : ২৬)

ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম (স) বলেন, চার ব্যক্তি শহীদ—

১. যে ঈমানদার দুশমনকে দেখে, এরপর আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়। কিয়ামতের দিন মানুষ এই ব্যক্তির প্রতি মাথা তুলে দেখবে। এরপর তিনি এমনভাবে মাথা উঠালেন যাতে তাঁর মাথার টুপি পড়ে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, আমার জানা নেই, তা ওমর (রা)-এর টুপি ছিল, না রাসূলুল্লাহ (স)-এর।

২. যে ঈমানদার দুশমনের মুখোমুখি হওয়ার পর নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। এরপর একটি ঘাতক তির এসে তার শরীরে বিদ্ধ হয় এবং সে শহীদ হয়ে যায়।

৩. যে ঈমানদার কিছু ভালো ও কিছু খারাপ আমল করে। এরপর দুশমনের মুখোমুখি হয়ে আল্লাহকে সত্য বলে ঈমান এনে শহীদ হয়ে যায়।

৪. যে ঈমানদার নিজের ওপর জুলুম করে। এরপর শত্রুর সম্মুখে এসে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করে শহীদ হয়ে যায়। (জামে তিরমিযী : ১৬৪৪)

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, দু'জন মানুষ লোকদের সম্মুখে এসে বলল, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ধনসম্পদ দান করলে আমরা সদকা করব। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধনদৌলত দিলেন। কিন্তু তারা কৃপণতা অবলম্বন করল। তখন নিচের আয়াত অবতীর্ণ হলো,

وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتٰنَا مِنْ فَضْلِهٖ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُوْنَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ- فَلَمَّا اٰتٰىهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ بَخِلُوْا بِهٖ وَتَوَلَّوْا وَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ - فَاَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَوْنَهٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْهُ وَبِمَا كَانُوْا يَكْذِبُوْنَ.

তাদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, যারা আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকার করেছিল, 'যদি আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে আমাদের (সম্পদ) দান করেন, তা হলে আমরা অবশ্যই সদকা দিব এবং অবশ্যই সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হব।' অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় তাদের দান করলেন, তখন তারা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং মুখ ফিরিয়ে চলে গেল। তাই শাস্তি হিসেবে তিনি তাদের অন্তরে কপটতা স্থিত করে দিলেন, আল্লাহর সাথে তাদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত। কারণ, তারা আল্লাহর সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং তারা মিথ্যা বলত। (সূরা তাওবা : ৭৫-৭৭)

এ আয়াতে সংকল্পকে অঙ্গীকার বলা হয়েছে এবং এর খেলাফ করাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই সিদক তৃতীয় প্রকার সিদকের তুলনায় কঠিনতর। কেননা, মানুষ কখনো সংকল্প করতে প্রস্তুত হয়ে যায়; কিন্তু বাস্তবায়নের সময় এলে নানাবিধ বাসনার মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত হয়ে পিছু হটে যায়।

এজন্যই ওমর (রা) বলেছেন, আমার গর্দান যদি কেটে ফেলা হয় সেটাই আমার কাছে উত্তম ওই সম্প্রদায়ের আমির হওয়া থেকে যাদের মাঝে আবু বকর (রা)-এর মতো মানুষ রয়েছেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, শর্ত হচ্ছে আল্লাহ তাআলা ওই সময় আমার অন্তরে এমন কোনো বিষয় সৃষ্টি করবেন না, যা এ সময় আমার অন্তরে নেই। কেননা আমি আমার প্রবৃত্তি থেকে নিরাপদ নই। হতে পারে যখন আমাকে হত্যা করা হবে তখন আমার ইচ্ছা পরিবর্তনও হয়ে যেতে পারে। মোটকথা, ওমর (রা)-এর কথার দ্বারা অঙ্গীকার পূর্ণ করার গুরুত্ব বোঝা যায়।

আবু সাঈদ (র) বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম দুইজন ফেরেশতা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়ে আমাকে বললেন, সত্যবাদীতা কী? আমি বললাম অঙ্গীকার যাথাযথভাবে পূর্ণ করা। তারা বললেন, সত্য বলেছেন। অতঃপর তারা আকাশে চলে গেল।

**৫.** আমলে সিদক হচ্ছে এমন চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা, যাতে বাহ্যিক আমলে কোনো ধরনের বক্রতা প্রকাশ না পায়। কিন্তু এ বক্রতা প্রকাশ না পাওয়া যেন আমল ত্যাগ করার কারণ না হয়। এই সিদকের উদ্দেশ্য লৌকিকতা ত্যাগ নয়। কারণ, অধিকাংশ নামাযী তাদের নামাযে খুশু-খুযুর আকার ধারণ করে থাকে। কিন্তু কাউকে দেখানো তাদের উদ্দেশ্য থাকে না; তবে তাদের অন্তর নামায হতে অমনোযোগী থাকে। এ ধরনের ব্যক্তি আমলে মিথ্যাবাদী এবং সে সিদক সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে— লৌকিকতা সম্পর্কে নয়।

কখনো দেখা যায়, লোকটি ধীরস্থীর ও গাম্ভীর্যতা নিয়ে হাঁটছে, কিন্তু তার ভিতর এ গুণে গুনান্বিত নয়। এ ব্যক্তি তার কাজে সত্যবাদী নয়। যদিও সে না কোনো মাখলুকের দিকে তাকায় আর না তার মাঝে রিয়া বিদ্যমান। আমলের মিথ্যা থেকে ওই ব্যক্তি রক্ষা পায় যার জাহের ও বাতেন এক বা যার বাতেন জাহের থেকেও ভালো হবে। এই ভয়েই অনেকে বাহ্যত নিম্ন

মানের পোশাক পরিধান করেন যাতে করে জাহের দেখে বাতেনের উপর প্রমাণ পেশ না করা হয়। এ ধরনের ব্যক্তি বাতেনের উপর জাহেরের প্রকাশ ভঙ্গির ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী।

সারকথা, বাহ্যিক অবস্থা অন্তরের অবস্থার বিপরীত হওয়া ইচ্ছাকৃত হলে তা লৌকিকতা। এর ফলে ইখলাস নষ্ট হয়ে যায়। আর যদি অনিচ্ছাবশত হয়, তাহলে সেটা মিথ্যা এবং এতে সিদক নষ্ট হয়। এ কারণেই রাসূলে আকরাম (স) এরূপ দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ سَرِيْرَتِيْ خَيْرًا مِّنْ عَلَانِيَّتِيْ وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِيْ صَالِحَةً.

হে আল্লাহ! আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে ভালো করে দিন এবং আমার বাহ্যিক অবস্থাকে পরিশুদ্ধ করে দিন। (জামে তিরমিযী : ৩৫৮৬)

যুবায়েদ ইবনে হারিছ (র) বলেন, মানুষের বাইরের অবস্থা ও ভেতরের অবস্থা যখন এক হয়ে যায়, তখন সে নেককার লোক হয়ে যায়। যদি বাইরের চেয়ে ভেতরের অবস্থা ভালো হয়, তাহলে তাকে বলা হয় "ফয্ল"। আর বাইরের অবস্থা ভেতরের চেয়ে ভাল হলে এর নাম হয় "জুর" তথা অন্যায়।

কবিতা—

إِذَا السِّرُّ وَالْإِعْلَانُ فِي الْمُؤْمِنِ اسْتَوَى + فَقَدْ عَزَّ فِي الدَّارَيْنِ وَاسْتَوْجَبَ الثَّنَا.

فَإِنْ خَالَفَ الْإِعْلَانُ سِرًّا فَمَا لَهُ + عَلَى سَعْيِهِ فَضْلٌ سِوَى الْكَذِبِ وَالْعَنَا.

فَمَا خَالِصُ الدِيْنَارِ فِي السَّوْقِ نَافِقٍ + وَمَغْشُوْشَهُ الْمَرْدُوْدُ لَا يَقْتَضِي الْمُنَا.

যদি মুমিনের জাহের ও বাতেন এক হয় তো এটা তার দুনিয়া আখেরাতের সম্মানের কারণ হবে। এতে তার প্রশংসা করা হবে। যদি জাহের বাতেনের বিপরীত হয় তাহলে তার সব আমল বেকার। বাজারে আসল নোট চলে কিন্তু নকল নোট চলে না।

ওকবা ইবনে আবদুল গাফির (র) বলেন, ঈমানদারের বাহ্যিক অবস্থার চেয়ে ভিতরের অবস্থা ভালো হলে আল্লাহ তাআলা তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের সম্মুখে গর্ব করে বলেন, সে হচ্ছে আমার প্রকৃত বান্দা।

মুআবিয়া বিন কুররা (র) বলেন, কে আমাকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিবে, যে রাতে ক্রন্দন করে আর দিনে হাসে।

আবদুল ওয়াহেদ বিন যায়েদ বলেন, হাসান বসরি যখন কাউকে কোনো কথা বলতেন নিজে তার উপর বেশি আমল করতেন। আর কাউকে যখন কোনো কাজ থেকে নিষেধ করতেন তিনি নিজে প্রথমে বেঁচে থাকতেন। তার মতো আর কোনো ব্যক্তি দেখিনি যার জাহের ও বাতেনের মাঝে এত মিল রয়েছে।

আবু আবদুর রহমান বলতেন, হে আল্লাহ তুমি আমার এবং লোকদের মধ্যে আমানতের আচরণ করেছো। আর আমি তোমার ও আমার মাঝে খেয়ানতের আচরণ করেছি। তিনি একথা বলে ক্রন্দন করতেন।

আবু ইয়াকুব নেহরজুরি (র) বলতেন, সত্যতা হচ্ছে জাহের ও বাতেন একটা আরেকটার মতো হবে।

সুতরাং বোঝা গেল, ভেতর ও বাহির একই বরাবর হওয়া এক ধরনের সিদক।

৬. দীনী মাকামসমূহে ইখলাস হচ্ছে, ভয় আশা, রিজা, যুহদ, যথার্থ তাওয়াক্কুল, মহব্বাত ইত্যাদি তরীকতের বিষয়সমূহের উপযোগী হওয়া। কারণ, এসব বিষয়ের এক অংশ হচ্ছে শুরু; এরপর আসে এগুলোর চূড়ান্ত সীমা তথা হাকীকত। যে ব্যক্তি এগুলোর হাকীকত পর্যন্ত উন্নীত হয়, সে-ই সঠিক মুহাক্কিক। কোনো গুণ কারও মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে গেলে তাকে সে গুণে সঠিক বলা হয়। যেমন আমরা বলি, অমুক ব্যক্তি একজন পুরুষ, অমুক ব্যক্তি প্রকৃত মুত্তাকী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ.

মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। অতঃপর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজুরাত : ১৫)

আরও ইরশাদ হয়েছে,

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَ الْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَ النَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ ابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ

وَ فِي الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِي الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا.

পুণ্যকর্ম শুধু এই নয়, তোমরা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের চেহারা ফেরাবে; বরং পুণ্যকর্ম হচ্ছে, কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, আসমানি কিতাব এবং নবী-রাসূলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করল এবং আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবী, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থীদের এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করল, নামাজ কায়েম ও যাকাত প্রদান করল এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা পূর্ণ করল, অর্থ-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করল। এরাই ওই সকল লোক যারা সত্যপরায়ণ এবং এরাই মুত্তাকী। (সূরা বাকারা : ১৭৭)

হযরত আবু যর (রা)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। তাকে বলা হলো, আমরা তো আপনাকে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, আপনি এই আয়াত কেন পড়লেন? তিনি বললেন, আমিও রাসূলুল্লাহ (স)-কে ঈমান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি এই আয়াত পাঠ করেন।

এ পর্যায়ে আমরা খওফ তথা ভয়ের একটি উপমা পেশ করছি। যে বান্দা আল্লাহ তাআলা ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাস রাখে, সে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করে। কিন্তু এ ভয় এমন যে, একে শুধু শাব্দিক ক্ষেত্রেই ভয় বলা যায়। সত্যিকার ভয়ের যে স্তর তা সেই পর্যন্ত পৌঁছে না। দেখো, মানুষ যখন কোনো বাদশাহকে ভয় করে অথবা রাস্তায় চোর ডাকাতের ভয় করে, তখন তার শরীরের রং পরিবর্তন হয়ে যায়, হাত-পা কাঁপতে থাকে, আহার-নিদ্রা কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু দোযখের আগুনকে ভয় করার পর মানুষ যখন কোনো পাপের কাজে লিপ্ত হয়, তখন এসব কিছুই হয় না। তার শরীরের রং স্বাভাবিকই থাকে এবং হাত-পা কাঁপে না। এর কারণ কী? নবী কারীম (স) বলেন,

لَمْ اَرَ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا.

জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী যেভাবে নিদ্রা যায়, তেমনি নিদ্রা যেতে আমি কাউকে দেখিনি এবং জান্নাত তালাশকারীর মতো আমি কাউকে নিদ্রা যেতে দেখিনি। (জামে তিরমিযী : ২৬০১)

সুতরাং খওফের হাকীকত পর্যন্ত পৌঁছা খুবই দুরূহ ব্যাপার। এসব মাকামের হাকিকত ও সত্যবাদিতার কোনো সীমাপরিসীমা নেই। নিজের অবস্থা অনুযায়ী সকলেই এগুলোর অংশ পেয়ে থাকে। যে বেশি অংশ পায়, তাকেই প্রকৃত বান্দা বলা হয়। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত জিবরাঈলকে বললেন— আমি আপনাকে আপনার আসল রূপে দেখতে চাই। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি আমাকে আসল রূপে দেখলে ঠিক থাকতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, না, আমি দেখতে চাই। জিবরাঈল (আ) অঙ্গীকার করলেন, চাঁদনি রাতে 'বাকী' নামক স্থানে দেখবেন। এক জোছনা রাতে রাসূলুল্লাহ (স) সেখানে গিয়ে জিবরাঈলকে দেখলেন, তিনি আকাশের দিগন্ত জুড়ে বিরাজমান। দেখার সাথে সাথেই তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে আসার পর যখন তিনি চোখ খুললেন, তখন জিবরাঈলকে পূর্বের সুরতে দেখে বললেন, আমার মনে হয় আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির মধ্যে এ ধরনের কেউ নেই। জিবরাঈল (আ) বললেন, আপনি ইসরাফীলকে দেখলে ভালই হতো। আরশ তার স্কন্ধে এবং পা জমিনের সর্বনিম্নে নামানো। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর আজমতের সম্মুখে যখন তিনি সংকুচিত হন, তখন তিনি ক্ষুদ্র পাখির মতো হয়ে যান। (আয্ যুহদ : ২২১)

এখানে দেখা উচিত যে, হযরত ইসরাফীল (আ) খওফের বা ভয়ের কত বড় অংশ প্রাপ্ত হয়েছেন। সকল ফেরেশতা এরূপ নন। কেননা, তারা খওফের ক্ষেত্রে সমান নন।

হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন— আমি মেরাজ রজনিতে ঊর্ধ্বাকাশে হযরত জিবরাঈলকে আল্লাহ তাআলার ভয়ে উটের পিঠে পুরানো চাদরের মতো পড়ে থাকতে দেখেছি। এমনিভাবে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যেও খওফ তথা ভয় ছিল। কিন্তু তাদের খওফ রাসূলে আকরাম (স)-এর খওফের সমান ছিল না।

এজন্য ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দীনের ব্যাপারে মানুষকে আহম্মক না ভাববে সে ঈমানের হাকিকত অর্জন করতে পারবে না।

মুতাররিফ (র) বলেন, কোনো ব্যক্তি এমন নেই যে, নিজে ও আল্লাহর মধ্যে আহম্মক না হয়। তবে কিছু লোক অপর কিছু লোকের তুলনায়

আহমক কম হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, মানুষ যে পর্যন্ত অন্য মানুষকে আল্লাহ ও তার দীনের দিক থেকে উটের ন্যায় মনে না করবে সে ঈমানের হাকিকত অর্জন করতে পারবে না। এরপর নিজের দিকে তাকাবে এবং নিজেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মনে করবে।

উল্লিখিত বর্ণনা থেকে জানা গেল, খওফ, মহব্বত ইত্যাদি স্তরগুলোতে যারা নিষ্ঠাবান, তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। মাঝে মধ্যে বান্দা কোনো কোনো স্তরে সাদিক তথা নিষ্ঠাবান আর কোনো কোনো স্তরে এর বিপরীত হয়। যদি সব স্তরে সাদিক হয়, তাহলে যথার্থই সিদ্দীক। সাআদ বিন মুআয (রা) বলেন, আমি তিনটি বিষয়ে শক্তিশালী এবং এছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দুর্বল, ১. ইসলাম গ্রহণ করার পর আমি কখনো এমন নামায পড়িনি যে অন্তরে এ খেয়াল উদয় হয়েছে যে, আমি নামায থেকে কবে ফারেগ হবো। ২. যখনই কোনো জানাযার সাথে গিয়েছি। অন্তরে এই খেয়াল ছিল যে, এই মৃত ব্যক্তিকে কবরে এই প্রশ্নগুলো করা হবে। আর সে এই উত্তর দিবে। দাফন থেকে ফারেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই খেয়ালই থাকত। ৩. যখনই আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছ থেকে কোনো হাদিস শুনেছি তা এই বিশ্বাসের সাথে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (স) যা বলেছেন, তাই সত্য।

ইবনুল মুসয়াব (রা) একথা শুনে বললেন, আমার মতে নবী ব্যতীত অন্য কারও মাঝে একসাথে এই তিনটি গুণ পাওয়া সম্ভব নয়। এই উল্লিখিত বিষয়সমূহে সাআদ বিন মুআয (রা)-এর সত্যতা ছিল। কত সাহাবি রয়েছেন যারা নামাযও পড়েছেন এবং জানাযার সাথেও গিয়েছেন কিন্তু তারপরও তারা ওই স্তরে পৌঁছতে পারেনি। এটা হচ্ছে সত্যের স্তরসমূহ ও তার অর্থসমূহ এবং সিদকের ব্যাপারে মাশায়েখদের উক্তিসমূহ।

আবু বকর ওয়াররাক (র) বলেন, সিদক তথা নিষ্ঠা তিন ধরনের— তাওহীদে সিদক, ইবাদতে সিদক এবং মারেফতে সিদক। তাওহীদে সিদক সাধারণ মুসলিমদেরও হাসিল হয়। যেমন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ.

"যারা আল্লাহ ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনে, তারা সাদেক (সত্যবাদী)।" (সূরা হাদিদ : ১৯)

ইবাদতে সিদক আলেম ও নেককারদের হাসিল হয়। আর মারেফাতে সিদক অলীগণ হাসিল করেন।

জাফর সাদেক (র) বলেন, সত্যবাদিতা হচ্ছে মুজাহাদা এবং গায়রুল্লাহকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ না করা। যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে বাদ দিয়ে অন্যকে গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাআলা বলেন, هُوَ اجْتَبَاكُمْ তিনি তোমাদের নির্বাচিত করেছেন। (সূরা হজ : ৭১)

বলা হয়, আল্লাহ তাআলা মূসা (আ)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, আমি যদি কোনো বান্দাকে ভালোবাসি তাকে এমন বিপদের দ্বারা পরীক্ষা করি যার সামনে পাহাড়ও টিকে থাকতে পারে না। এর কারণ হচ্ছে আমি দেখতে চাই তার সত্যতা কতটুকু? যদি তাকে ধৈর্যশীল পাই তখন তাকে অলী ও বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে থাকি। আর যদি ধৈর্যহারা ও অস্থির পাই তাহলে তাকে লাঞ্ছিত করি। এক্ষেত্রে কারও পরোয়া করি না। সুতরাং সত্যবাদিতার আলামত হচ্ছে ইবাদত ও বিপদাপদ উভয়টাই গোপন করা এবং মাখলুকের এ ব্যাপারে জেনে ফেলাকে খারাপ মনে করা।

◖] চতুর্দশ খণ্ড সমাপ্ত [◗

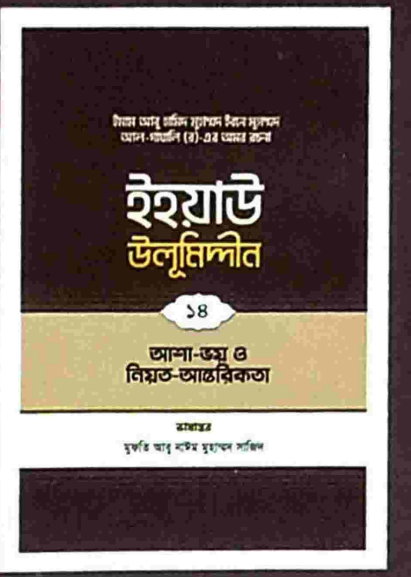

ISBN : 978-984-558-029-8

দারুত তাকবীর
কর্পোরেট অফিস : ৩০/এ, সাত্তারা সেন্টার (১৪ তলা) ভি আই পি রোড
নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০, ফোন : ০৯৬১০৬৬৬০০৬, ০১৯৯১-১৮১২০৪
বিক্রয় : বিশাল বুক কমপ্লেক্স, ৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সার্বিক যোগাযোগ : ০১৯৩৮-৮৫৫৯১২, ০১৯৩৮-৮৫৫৯৭৯, ০১৯৩৯-৯১৯৩২১
ই-মেইল : info@daruttakbeer.com

10114012920140209-7738

পরিবেশক : বাংলাপ্রকাশ
৩৮/২ খ, তাজমহল মার্কেট (নিচ তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনলাইনে পরিবেশক : BOIBAZAR.com

BOOKS

রকমারি